M.Phil.

B
954.0258
SII
c-1

M.Phil.

382732

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

'ইরফান হাবিবের দি এগ্রেরিয়ান সিসটেম অব মুঘল ইন্ডিয়া' একটি পুনর্মূল্যায়ন

মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ্

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
382732

382732

GIFT

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

'ইরফান হাবিবের দি এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব মুঘল ইন্ডিয়া' একটি পুনর্মূল্যায়ন

মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ্
রেজিঃ ৯৮/৯২-৯৩

382732

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

'ইরফান হাবিবের দি এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব মুঘল ইন্ডিয়া' একটি পুনর্মূল্যায়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
মোহাম্মদ মুসা আনসারী
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382732

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত ইরফান হাবিবের- 'দি এগ্রেরিয়ান সিসটেম অব মুঘল ইন্ডিয়া' একটি পুনর্মূল্যায়ন শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। লেখক এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেননি।

মোহাম্মদ মুসা আনসারী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
ডিসেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

প্রফেসর ইরফান হাবিব মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একজন স্বীকৃত পন্ডিত। তাঁর গবেষণাকর্মটি মধ্যযুগীয় ভারতের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ। আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু হিসাবে এ গ্রন্থটি আমার সম্মুখে ইতিহাস পঠন ও পাঠনের এক অকর্ষিত দুয়ার খোলে দেয়, ফলে মধ্যযুগীয় ভারতের আর্থ-সামাজিক ইতিকহাসের গভীরে পৌছার লক্ষ্যে আমি গ্রন্থটির উপর গবেষণা কাজ করতে ভীষন আগ্রহ বোধ করি। এক্ষেত্রে লেখকের ইতিহাস চিন্তার সাথে লেখকের মতামতের দুর্বলতাগুলো তুলে ধরার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই দুরুহ গবেষণাকর্মে হাত দেই। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ মুসা আনসারীর সঠিক দিক নির্দেশনা ও সঠিক সহায়তার ফলে উপরোক্ত গ্রন্থটি পুনর্মূল্যায়নের জটিল কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মে সামাজিক ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তিগুলোর গভীরে প্রবেশ করার ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ইরফান হাবিব তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর গতি-প্রকৃতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্বেষন করেছেন। পুস্তকটির পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্নে তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে মুঘল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শক্তিগুলোর গতি-প্রকৃতি ও স্বরূপ বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতায় নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুঘল ভারতীয় শ্রেণীবদ্ধ সমাজে শ্রেণীচেতনা, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদক শ্রেণী ও ভোক্তাশ্রেণীর মধ্যকার পারস্পরিক টানাপোড়নে সামাজিক গতিশীলতা অন্বেষন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইরফান হাবিবের মতামতের সঙ্গে অন্যান্য পন্ডিত ও গবেষকদের মতামতের ভিন্নতা ও ঐক্য তুলে ধরে গুরুত্বানুযায়ী পুস্তকটির আদ্যোন্ত কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে দিক নির্দেশনা, সকল প্রকার পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ মুসা আনসারী। তাঁর অকৃপণ সাহায্য সহযোগিতা আমাকে এই দুরুহ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সাহায্য করেছে। এ জন্য আমি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ঋণী হয়ে রইলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর হাবিবা খাতুন, ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবুল কাশেম ফজলুল হক বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও উপাত্তের সন্ধান দিয়ে, সাহস দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া ও জনাব আতাউর রহমান বিশ্বাস সকল সময় সকল পরিবেশে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার অনুজ প্রতিম ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান গবেষণাকর্মের শুরু থেকে নানাভাবে সহায়তা করেছেনএবং গ্রন্থকার বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব সাইফুল ইসলাম কমপিউটারের কাজে সর্বোতভাবে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রন প্রমাদ থেকে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ঢাকা
ডিসেম্বর ১৯৯৮

মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত সংকেতসূচী

CSSSC-Center for Studies in Social Sciences, Calcutta.

IESHR-Indian Economic and Social History Review.

JASB-Journal of Asiatic Society of Bengal.

PIHC-Proceedings,Indian History Congress.

PIHRC-Proceedings, Indian Historical Records Commission.

JPHS-Journal of Pakistan Historical Society.

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় সূচী

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	I-V
প্রথম অধ্যায়	
কৃষি উৎপাদন ঃ কৃষি পণ্যের বাণিজ্য ও কৃষক জীবন	১- ১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
গ্রাম সমাজ ঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা	১৭-৪২
তৃতীয় অধ্যায়	
জমিনদার ও মুঘল সমাজ	৪৩-৬২
চতুর্থ অধ্যায়	
ভূমি রাজস্ব ঃ জায়গীর ও মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	৬৩-৯১
পঞ্চম অধ্যায়	
মুঘল সাম্রাজ্যে কৃষি সংকট ও কৃষক বিদ্রোহ	৯২-১০৭
উপসংহার	১০৮-১০৯
গ্রন্থপঞ্জী	১১০-১২০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভারতীয় উপমাদেশের ইতিহাস চর্চার নবদিগন্ত উন্মোচনে ইরফান হাবিব অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে নয়া রচনাশৈলী সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করে নয়া School of Historiography এর বলিষ্ট রূপকার হিসাবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি.এইচ. ডি.ডিগ্রীর জন্য তার পেশকৃত থিসিস The Agrarian System of Mughal India (1556-1707) ১৯৬৩ সালে পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হলে ঐতিহাসিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তখন থেকে মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাস চর্চার জগতে পুস্তকখানি একটি আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পুস্তকখানির কালসীমা নির্দেশ করা হয়েছে আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬) হতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর বছর পর্যন্ত (১৭০৭) নির্বাচিত সময়টি নানা দিক হতে মুঘল ভারতের স্বর্ণযুগও বটে। বিষয়বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে উল্লেখিত সময়সীমার বাইরে আলোচনার পরিধি বিস্তৃত করতে হয়েছে। এপ্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন"বলা বাহুল্য এই সীমা দুটোকে আক্ষরিকভাবে নেয়াটা ঠিক হবে না, ১৬ শতক ও ১৮ শতকের গোড়ার দিকের সাক্ষ্য প্রমাণও আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি।"

পুস্তকখানির আলোচনার বিরাট অংশ জুড়ে আছে মুঘল ভূমি রাজস্বনীতি ও ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা। এই কারণেই স্বভাবতইঃ পুস্তকটি তৎকালীন ভারতের কৃষি অর্থনীতির ইতিহাস বললে এর সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কেননা, লেখক স্বয়ং বলেছেন যে,"তার আলোচ্য সময়ের সাধারণ ইতিহাস এবং বিশেষভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের যথার্থ উপলব্ধির জন্য তৎকালীন কৃষি ইতিহাসের সমস্যাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন।"বস্তুতঃ এতে আছে জমির স্বত্ব ও জমিদারী প্রথার স্বরূপ, কৃষকের জীবন, কৃষি সংকট, ও কৃষক অভ্যুত্থানের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ । এক কথায় বলা যায় পুস্তকখানি তৎকালীন ভারতের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের একটি বস্তনিষ্ঠ দলিল। এতে আছে সে যুগের ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তির সন্ধান

ইতিপূর্বে অন্য কোন গবেষকের প্রকাশনায় মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারায় সামাজিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর এত গভীরভাবে অথচ বস্তনিষ্ঠ আলোচনা হয়নি। এক্ষেত্রে লেখক তৎকালীন সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদান ও শক্তি কাঠামোর গতি ও প্রকৃতি আবিস্কার করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রচলিত পথ ধরে অগ্রসর হতে পারেননি, নতুন পথের সন্ধান ও পরিক্রমা করেন। পরিণতিতে মধ্য যুগের ইতিহাস পঠন-পাঠনে নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আজকাল বিভিন্ন লেখক, গবেষক মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর উপরোক্ত সামাজিক শক্তি সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর আলোকপাত করছেন। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের সমগ্রতা সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন হচ্ছেন। তাই তাঁদের গবেষণা আরো গভীরে প্রবেশ করে তা ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিক; ভূমি ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও মুদ্রা অর্থনীতি এবং সমাজ বিকাশে এর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করায় ইতিহাস রচনাশৈলী এক নতুন রূপ ধারণ করেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশের পর লেখকের হাতে বেশ কিছু মূল্যবান সাক্ষ্য প্রমাণ আসে; তদুপরি সতীশ চন্দ্র, এস.পি.গুপ্ত ও দিলবাগ সিং প্রমুখ অনেকেই এই সময়ের অনেক মূল্যবান গবেষণা কর্ম প্রকাশ করেন। এ কারণে এই সময়ের ইতিহাসবিদদের মধ্যে অনেক বির্তক চলে, অনেক পুরানো মত পরিত্যক্ত হয় এবং অনেক নতুন প্রশ্ন উঠে। এ কারণে লেখক মনে করেন যদি তিনি তাঁর পুস্তকের পুর্নলিখনের কাজে হাত দিতেন তাহলে পুস্তকখানির মূল প্রতিপাদ্যে কোন আমূল পরিবর্তন না ঘটালেও কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধিত হত। পুনশ্চঃ এটাও সত্য যে,পরবর্তীকালে তাঁর মতামতের দু একটি ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তকের মূল অবস্থান হতে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। এমতাবস্থায় নতুন চিন্তা ভাবনার আলোকে গ্রন্থটির পুনর্মূল্যায়ন বাঞ্চনীয়।

উল্লেখ্য গবেষকের প্রতিপাদ্যের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে এবং বিষয়ের পরিণতি বিশ্লেষণে এবং বিশেষ করে আলোচনার বস্তুনিষ্ঠতার প্রয়োজনেই নির্ধারিত সীমার বাইরে তাঁর বিচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে মুঘল প্রশাসন ও সমাজ বিকাশের ধারাটিকে যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপলব্ধি করার জন্য তৎকালীন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কতগুলো তাত্ত্বিক ধারণা স্পষ্ট করা দরকার। কেননা, প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে চলে পরিবর্তনের লীলা খেলা। ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর গঠন, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে উৎপাদন শক্তিগুলো পরিবর্তিত হয়। ঐ সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যটি দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যমান থেকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্ব সৃষ্টি করে। প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বে সমাজ বিকাশের ধারা নিরূপন করতে গবেষকগণ উৎপাদনের শ্রম নিয়োগ পদ্ধতি, উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণ ও সম্পদ বন্টনে-এক কথায় উৎপাদন শক্তি সমূহ ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

প্রতিটি সমাজ বিকাশে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক, অবকাঠামো, উপরি কাঠামোর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজের মূল চালিকা শক্তি শ্রম শক্তি নিয়োগ ও ব্যবহার, উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ ও বন্টনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল, পক্ষান্তরে সমাজের উপরি কাঠামোতে তার উচ্চতর সংস্কৃতি, মুল্যবোধ ও বিশ্বাস ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। সুতরাং, সমাজের অবকাঠামোর ধরনের উপর উপরি কাঠামোর বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে। কাজেই কোন সমাজ ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণে অন্য একটি সমাজ থেকে পৃথকীকরণে ঐ সমাজের মূল চালিকা শক্তিগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে। ইরফান হাবিব তাঁর গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়কে সর্বমোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায় বিভাজনের পশ্চাতেও ইরফান হাবিবের একটি নিজস্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে কাজ করেছে। তিনি ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের মূল ধারাটি আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। স্বাভাবিক কারণে মুঘল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি যে ভূমিরাজস্ব, তার সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদকশ্রেণী, বিশাল নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীর সত্যিকার ঐতিহাসিক অবস্থাটি অন্বেষণ করেছেন। উপরন্ত মুঘল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশক্রমে অর্ন্ত নিহিত মূলসুরটি খুঁজতে গিয়ে তিনি গবেষণাপত্রের অধ্যায় বিভাজনে বিষয়ের স্বতন্ত্র্যতা ও অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমন, মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক ভিত ছিল ভূমি-রাজস্ব, ভূমি রাজস্বের এক মাত্র উৎস ছিল কৃষি-ভূমি। সঙ্গত কারণেই তিনি আলোচনার সুবিধার্থে "কৃষিজ উৎপাদন" এই শিরোনামে লিখিত প্রথম অধ্যায়ে চাষাবাদের বিস্তার, আবাদ ও সেচের উপকরণ, শস্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য, কৃষি সংক্রান্ত হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাপক তথ্য ও উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়ে বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতিতে সত্যিকার অবস্থাটি আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন।

কৃষিজ উৎপাদনের সাথে রাজস্ব দাবী ছাড়াও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রশ্ন জড়িত ছিল। অধিকন্ত 'দামে'র ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করা হতো বলে কৃষকরা কৃষি পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য ছিল। ফলে কৃষি পণ্যকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে ইরফান হাবিব 'কৃষিপণ্যের বাণিজ্য" এই শিরোনামে আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দূরপাল্লায় বাণিজ্য, আঞ্চলিক বাণিজ্য, চাষী ও বাজার, কৃষিজ পণ্যের দামের উঠানামার গতি প্রকৃতি, অবস্থা, স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

এরপর তিনি ভূমিজ উৎপাদনের সাথে জড়িত 'কৃষকদের জীবনের বাস্তব অবস্থা' তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকের জীবন যাত্রার মান, জীবন ব্যবস্থার অবকাঠামো, কৃষক শোষণ, শোষণের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া, কৃষকদের নিয়তিবাদ, দুর্ভিক্ষ এর কারণ ও প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি 'কৃষক ও জমি; গ্রাম-সমাজ' শিরোনামে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাতে মুঘল ভারতের কৃষি ইতিহাসের মূল কর্মকান্ড, মুঘল উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন কাঠামো, শোষণের প্রক্রিয়া ও শোষণের কেন্দ্রবিন্দু, শ্রেণীবদ্ধ সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়ন, মুদ্রা ব্যবস্থা, এর গতিশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে মুঘল রাষ্ট্র ও সমাজ অর্থনীতির সত্যিকার অবস্থা আবিস্কারে আলোচ্য অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। এই অংশে লেখক তথ্য, তত্ত্বের প্রয়োগে নতুনত্ব ও গভীরতায় এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই অধ্যায়টি পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

মুঘল প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান শক্তি কাঠামো গড়ে উঠেছিল জমিনদারদের নিয়ে। মুঘল ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে সম্রাট ও কৃষকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী মধ্যস্বত্ব ভোগী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জমিনদার শ্রেণীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জমিনদার শ্রেণীর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ভূমিতে তাঁদের মালিকানা স্বত্ব, উৎপাদনে তাঁদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রশ্নে ইরফান হাবিব গভীর আলোচনা পর্যালোচনার অবতারণা করেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। তিনি জমিনদার শ্রেণীর বিচিত্র প্রকৃতি, অঞ্চল ভেদে তাঁদের ভিন্নতা, অভ্যন্তরীন শ্রেণীবিন্যাস, প্রশাসনিকভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনা করলেও পরবর্তিকালে বিভিন্ন পন্ডিতের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে খুব সামান্যই বলায় অবকাশ রয়েছে। তাসত্ত্বেও গ্রন্থটির পুর্নবিচারের প্রশ্নে এই অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থের ৬ষ্ট অধ্যায়ে রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণে ইরফান হাবিব প্রথমে রাজস্ব দাবীর পরিমাণ প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্রের আলোকে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। মুঘল সরকারের রাজস্ব দাবীর পরিমাণ, রাজস্ব ধার্যের নির্ধারক, কৃষক শোষণের প্রকৃতি, আদায়কৃত ভূমি-রাজস্বে বাদশা, জায়গীরদার, জমিনদার, ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর অংশের পরিমাণ ও আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইরফান হাবিবের গবেষণা গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'রাজস্ব বরাত' ও 'রাজস্ব অনুদান' শিরোনামে লিখিত অধ্যায়-দ্বয়ে তিনি মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক অবকাঠামো, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা, মুঘল প্রশাসনের গতি প্রকৃতি, প্রশাসনিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা, মুঘল রাষ্ট্রশক্তি কাঠামো, মূল শক্তি; কৃষক, জমিনদার, রাজস্বকর্মচারী, জায়গীরদার ইত্যাদি শ্রেণীর কর্মকান্ডের ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম-সমাজ,ভূমি-রাজস্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় চলে এসেছে। বিশেষ করে মনসব, জায়গীরদারী ব্যবস্থার বিকাশ ও পরিণতি, সর্বোপরি এর সংকটের সাথে মুঘল-রাষ্ট্র প্রশাসন ও আর্থিক অবস্থার বিপর্যয়কে একই সাথে জুড়ে দিয়ে ইরফান হাবিব মুঘল সাম্রাজ্যে গড়ে উঠা দীর্ঘ দিনের ভারসাম্যের নীতি ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে কিভাবে কৃষি সংকট ও কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হল তা তুলে ধরেছেন। সেই সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের চিত্রটি ধরা পড়েছে।

"মুঘল সাম্রাজ্যের কৃষি সংকট" এই শিরোনামে আলোচিত অধ্যায়ে ইরফান হাবিব কৃষক বিদ্রোহের কারণ, বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি, কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব, পরিণতি, কওম চেতনা, বর্ণ, জাতের বন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষনাত্বক আলোচনা করেছেন। আর এই অধ্যায়ে মুঘল রাষ্ট্র শক্তির অবকাঠামো ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক টানাপোড়নে সৃষ্ট বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও অবক্ষয়ের সত্যিকার চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

✓ পুস্তকটির পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে মুঘল রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়েউঠা সামাজিক কাঠামোর অর্ন্তনিহিত তাৎপর্যটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদক শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। উপরন্ত উৎপাদক শ্রেণী, উৎপাদন কাঠামো, উপকরণ বা হাতিয়ার, সর্বোপরি উৎপাদনের রূপান্তরের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের তথা গতিশীলতা ও গভীরতার দিকটি অন্বেষন করা হয়েছে।

✓ সংগত কারণে পুস্তকটি পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'কৃষিজ উৎপাদন'; 'কৃষি পণ্যের বাণিজ্য' ও কৃষকের জীবনের বাস্তব অবস্থা 'এই তিনটি অধ্যায় নিয়ে "কৃষি উৎপাদন; কৃষি পণ্যের বাণিজ্য ও কৃষক জীবন" এই শিরোনামে একটি মাত্র অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হল। গুরুত্বের বিচারে 'কৃষক ও জমি; গ্রাম-সমাজ' ও 'জমিনদার' দুটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হল।

✓ মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়, স্থানু সামাজিক আর্থিক অবস্থা, অনড় উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়কে একটি ধারাবাহিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে "ভূমি রাজস্ব" 'রাজস্ব-বরাত', ও 'রাজস্ব অনুদান' এই তিনটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে "ভূমি রাজস্ব: জায়গীর ও মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট" এই শিরোনামে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্টে লেখন জমির পরিমাণ, প্রচলিত ওজন ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, 'জমা'ও 'ওয়াসিল' পরিসংখ্যান নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। মূল গ্রন্থের অনুসঙ্গ হিসাবে এক বিশেষ আলোচনার অবতারনায় লেখক এই সকল বিষয় নিয়ে এসেছেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে এই আলোচনা অপরিহার্য নয়। গ্রন্থটির পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্নে পরিশিষ্টে উপস্থাপিত প্রতিপাদ্যে প্রবেশ না করলেও খুব একটা ইতরভেদ হবে না। সে কারণে পরিশিষ্টের পূর্বে মূল গ্রন্থের ৩৫২ পৃঃ পর্যন্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

উৎপাদন শক্তিসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে ইরফান হাবিব গোটা পুস্তকের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপস্থাপিত 'কৃষিজ উৎপাদন' শিরোনামে আলোচিত অধ্যায়ে 'আবাদ ও সেচের উপকরণ' শিরোনামে উপঅধ্যায়ে বিদ্যমান কৃষি ব্যবস্থায় প্রচলিত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃষিজ উপকরণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,"আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষির বিরাট কৃতিত্বের পাশে রাখলে ভারতের কৃষদের স্থূল উপকরণগুলোর চেয়ে আরো আদিম কোন জিনিসের কথা কল্পনা করাই কঠিন।"সুতরাং, তিনি কৃষি উপকরণের স্থানু, গতিহীনতার কথাই প্রকাশ করেছেন। তাঁর ✓ আলোচনায় এসেছে কৃষকদের নিয়তিবাদ, সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল গতানুগতিক কৃষি-ব্যবস্থা, কৃষিতে নিয়োজিত মানব সম্পদের গতিশীলতার অভাব কৃষি ব্যবস্থায় যে স্থবিরতায় সৃষ্টি করেছিল তা ফুটে উঠেছে। তিনি মুদ্রা অর্থনীতি, বাজারের মুখ চেয়ে উৎপাদন করার কৃষকের প্রবণতার কথা বলেছেন সত্যি, কিন্ত তা ভারতীয় কৃষি ঐতিহ্যে পরিণত হতে পারেনি।

সামাজিকশ্রেণী হিসাবে জমিনদাররা কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত সত্যি, কিন্তু তাঁরা কখনো একটি সংগঠিত, স্বতন্ত্র সামাজিক শক্তি হিসাবে উৎপাদনের রূপান্তর তথা সমাজ বিকাশে স্বকীয় ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। তিনি মূলধন উৎপাদন, সঞ্চয়, ও বিনিয়োগের বিষয়টি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে অন্বেষন করেছেন। 'দামের' ভিত্তিতে অথবা কখনো কখনো নগদ মূল্যে রাজস্ব আদায়ের ধারণা, গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদন সম্পর্কে মুদ্রা অর্থনীতির যথার্থ বিকাশের প্রমাণ হাজির করার চেষ্টা ও মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের ✓ পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ মুঘল অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাব্যতা তিনি বিভিন্নভাবে পরিক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন। এই বিষয়ে তিনি পরোক্ষভাবে নেতিবাচক মতামত পেশ করলেও

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবনে মুদ্রা অর্থনীতি ব্যবহারের দিক তুলে ধরেন। মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলিত থাকলেও এর পরিমাণের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অপর্যাপ্ত মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ও নগদ লেনদেন উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজি সঞ্চালণে সামগ্রীক উন্নতির দিকে ইংগিত দেয় না।

ইরফান হাবিবের রচনায় মুঘল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ধরা পড়েনি। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ সমাজে বিভিন্ন স্তর ও কাঠামোতে রূপান্তরে বাণিজ্য ও পুঁজি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা, উৎপাদন রূপান্তরে তাঁদের ভূমিকার দিকটি উন্মোচিত হয়নি। বস্তুতঃ মুঘল যুগের বণিকদের উৎপাদন ব্যবস্থায় সামগ্রীকভাবে কি ভূমিকা ছিল, সে প্রশ্ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যের মূলধনের বিপুল পরিমাণ মুঘল অর্থনীতির রূপান্তর ঘটাতে পারত কি না তা ইরফান হাবিবরে আলোচনায় উঠে আসেনি।

পরিশেষে সমাজ উপরিকাঠামো সম্পর্কে তাঁর ধারণা পর্যাপ্ত থাকলেও তিনি উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরে ও সামাজিক গতিশীলতার প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে একে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করেননি। গ্রাম-সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় জাত-পাতের ঐতিহ্য, 'কওম' চেতনা 'ভাইয়াচারা' বাঁধন, গ্রাম পঞ্চায়েত, সর্বোপরি কৃষি উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত শ্রমবাহিনী তৈরীতে জাতিভেদ প্রথার কথা জুরালোভাবে বলেছেন। জমিনদার ব্যবস্থার উৎপত্তি, এর কাঠামো ও কার্যক্রমে ঐতিহ্য, বিশ্বাস, বর্ণ ব্যবস্থার ভূমিকার দিকটি 'জমিনদার' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় স্পষ্ট করেছেন।

তবে ইরফান হাবিবের লেখায় কৃষি সংকট ও কৃষক বিদ্রোহের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ভূমিকা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, কৃষক চেতনা, ন্যায়বোধ, লোকঐতিহ্য, গুরুব ইত্যাদি বিষয় তাঁর রচনায় তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। তিনি উৎপাদন, শোষণ, নিপীড়ন, বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনায় অবক্ষয়ের দিকটি তুলে ধরেছেন সত্যি, তবে সমাজ বিকাশে মুঘল সমাজ কাঠামোর ব্যর্থতার দিকটি স্পষ্ট করেননি বা সমাজবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যর্থতার নিরিখে সমস্যা সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কৃষি উৎপাদন ঃ কৃষি পণ্যের বাণিজ্য ও কৃষক জীবন

ইরফান হাবিব মনে করেন ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার আলোচনা শুরু করতে হবে তৎকালীন মুঘল ভারতের আবাদী এলাকার সমীক্ষা থেকে। কারণ হিসাবে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আলোচনার শুরুতেই তিনি হাজার বছর ধরে ভারতীয় কৃষকের সংগ্রামী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। কৃষিতে আবাদী ভূমির উত্থান পতনের নাটকীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করেছেন। ফলে তিনি জোড়ালো মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিপর্বেই রাজনৈতিক সামরিক সীমারেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে স্থান পেয়েছে তার অরণ্যরেখা আর মরুসীমান্ত। এর সাথেই তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন যে, এই রেখাই বার বার নিদের্শ করেছে আবাদী জমির এলাকা যা সর্বদাই দেশের বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচক।

তিনি কৃষি উৎপাদনের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে কৃষি সভ্যতা বিকাশের পর্যায়গুলো তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদনের রূপান্তরে কাল বিভাগের পেক্ষিতে তা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে উৎপাদন কৌশলের বিবর্তনে নিড়ানি চাষ, জায়গা বদলে চাষ বা স্থায়ী ব্যবস্থায় চাষ -এ সবই এক একটি ঐতিহাসিক স্তর। তবে ভারতীয় প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক কারণেই এর প্রয়োগিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান ছিল বলে ইরফান হাবিব মত প্রকাশ করেছেন । তাঁর মতে কিভাবে চাষ হবে, তার অনেকটাই নির্ধারিত হত কোন পর্বে কতটা অকর্ষিত জমি নতুন করে দখল করা গেল তার উপর। সুতরাং, তিনি মুঘল ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার আলোচনা শুরু করেছেন তৎকালীন আবাদী এলাকার সমীক্ষা থেকে।

ইরফান হাবিব এ পর্যায়ে সমসাময়িক প্রাপ্ত নথিপত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আবাদী ভূমির পরিমাণ আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। আবাদযোগ্য জমি ও অনাবাদী জমি, এই সকল জমির উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের উপর বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি ভূমি পরিমাপের পদ্ধতি, পরিমাপ কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় তৎকালীন আর্থ- প্রশাসনিক অবস্থার একটি স্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মুঘলদের ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার এই সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, "মুঘল প্রশাসন প্রধানত রাজস্ব নির্ধারণের জন্যই জমি জরিপ করত"। যদিও তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে, জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের এই পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত ছিলনা। তিনি বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা করে মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন কোন প্রদেশের রাজস্ব প্রদায়ী সমস্ত জমি জরিপের আওতায় আসেনি। এই সমস্ত কারণে তিনি মুঘল পরিসংখ্যানে "জরিপ করা জমি " বলতে কী বোঝানো হত তা কিছুটা নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।এবং বলা যায় সফলও হয়েছেন। ভূমি পরিমাপের বিভিন্ন একক,'বিঘা-এ দফতরী' ও'বিঘা-এ-ইলাহীর' মধ্যকার পাথর্ক্য নিরসন করে পরিসংখ্যান ভিত্তিক আবাদী ভূমির পরিমাণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ভূমি জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ে 'আইনে' প্রদত্ত তথ্যালোকে মুরল্যান্ড যে সিদ্ধান্তে উপনীতি হয়েছেন ইরফান হাবিব তাকে যথেষ্ট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন।[১] মুরল্যান্ড প্রস্তাব করেছেন যে,"মুঘল যুগের জরিপ করা জমিকে আধুনিক পরিসংখ্যানের পরিভাষায় 'মোট ফসলী এলাকা" হিসাব গন্য করা উচিত"।[২] ইরফান হাবিব মনে করেন যে, মুরল্যান্ডের এই তথ্যকে আরও যথার্থভাবে বলা উচিত, 'মোট ধান-বোনা জমি', কেননা 'নাবুদ' বা শস্যহানির ফলে

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জরিপের আওতায় পড়ত।[৩] কিন্তু জরিপে সম্ভবত শুধু আবাদী জমি নয়, আবাদযোগ্য জমিও ধরা হত। রশিক দাস করোড়ীর কাছে প্রেরিত আওরঙ্গজেবের ফরমানের তথ্যের ভিত্তিতে লেখক মনে করেন যে,"কিছু আবাদযোগ্য জমি, যেমন বসবাসের জায়গা, পুকুর, নালা, ও জঙ্গলও জরিপ করা হত। কিন্তু এই জরিপ গ্রাম ও বসতির সীমাতেই থেমে যেত, বিস্তৃত অরণ্য ও অহল্যা ভূমি অবধি যেতনা।"[৪]

অতপর, ইরফান হাবিব আধুনিক কৃষি পরিসংখ্যানের সাথে মুঘল আমলে জরিপ করা এলাকার পরিসংখ্যানগত তুলনামূলক বিচার করেছেন, যাকে এক কথায় একটি অসাধারণ কাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে। একজন উচ্চমানের গবেষক ও পন্ডিত হিসাবে এক্ষেত্রেও তাঁর বিজ্ঞতার গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুঘল ভারতের জরিপকৃত এলাকার প্রকৃতি ও স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "মুঘল আমলে জরিপ করা এলাকার মধ্যে আধুনিক কৃষি পরিসংখ্যানে মোটামোটি তিন ধরনের জমি নেয়া হতঃ 'চষা জমি, তখনকার মত পতিত জমি, এবং পতিত ছাড়া আবাদযোগ্য অহল্যাভূমি।"[৫] চষাজমির পরিমাণ অবশ্যই ঠিকমত নির্দিষ্ট করা সম্ভব বলে হাবিব মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন 'আবাদ যোগ্য' শব্দটির নানা সংজ্ঞা হতে পারে। সুতরাং, এই আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ বের করার জন্য মুঘল ও ব্রিটিশদের অনুসৃত নীতি এক ছিল কিনা, অথবা আদৌ তাঁরা কোন নীতি বা স্কেল অনুসরন করতেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। এটাই অনুসন্ধান ক্ষেত্র এবং ইরফান হাবিব ব্যাপক তথ্য ও উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়ে বিস্তৃত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর গবেষণা ফলাফল উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন যে,"মুঘল ও ব্রিটিশ যুগে স্থানীয় কর্মচারীদের এই ঝোঁক হওয়াই সম্ভব যে, কেবলমাত্র সেই অহল্যা ভূমিকেই আবাদযোগ্য শ্রেণীতে ধরা হবে, যা তৎকালীন পরিস্থিতিতে আবাদে যাওয়ার প্রান্তিক অবস্থায় ছিল।"[৬] এই সকল বিষয়ে ইরফান হাবিব তাঁর চিন্তা করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন যে,"এইভাবে নিরূপিত আবাদযোগ্য অহল্যা ভূমি আর যথার্থ আবাদী জমির এলাকা সাধারণভাবে একটা বাঁধা অনুপাতে থাকবে। আর তা হলে মুঘল যুগে জরিপ করা এলাকার পরিসংখ্যানের সাথে সাম্প্রতিক কালের আবাদযোগ্য জমির পরিসংখ্যান তুলনা করলে সেটি কাজে আসবে। কারণ এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে চাষাবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে এর থেকেই তার একটা মোটামোটি হদিশ পাওয়া যাবে।"[৫]

সুতরাং, ভারতীয় কৃষির একটি কালোত্তীর্ণ ঐতিহাসিক বিকাশক্রমের বাস্তব চিত্র তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। এখন প্রশ্ন হয়ে দাড়াচ্ছে যে, কোন উপাদানটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, অথবা কোন পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করলে মুঘল ভূমিজ সম্পদের প্রকৃত চিত্র আবিস্কার করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইরফান হাবিব প্রাপ্ত সমকালীন নথিপত্রের তথ্য বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,"মুঘল যুগে আবাদী এলাকার হিসাব করতে শুধুমাত্র গ্রামগুলোর তুলনামূলক পরিসংখ্যান সরাসরি কোন সাহায্য করতে পারেনা। তাই মুঘল ও আধুনিক পরিসংখ্যানের কোন তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক এককগুলোর সীমানা নিখুঁতভাবে স্থির করা প্রয়োজন।"[৬]

এই প্রেক্ষিতে তিনি গ্রামের উপত্যকা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিনের প্রদেশগুলো, পূর্ব প্রান্তিক প্রদেশ-বাংলা, উড়িষ্যা এলাহাবাদ, অযোধ্যা ইত্যাদি প্রদেশে সীমানা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে বিশাল বিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চরিত্রের ভিন্নতা, সর্বোপরি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মর্যদার প্রার্থক্যের ধরুন গোটা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সাধারণ চিত্র অংকন করা সম্ভব নয় এবং সম্ভবত সংগতও নয়। স্বাভাবিক কারণেই ইরফান হাবিব এ প্রেক্ষিতে তাঁর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার অঞ্চলিক চরিত্র ও বৈচিত্র অন্বেষন করেছেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষির বিস্তার ও চাষাবাদের স্বরূপ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন যা একথায় ভারতীয় কৃষি ইতিহাসের মূলসূত্র। তথ্যসূত্র ও উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণে এক্ষেত্রে তিনি মুরল্যান্ডকে পথিকৃৎ স্বীকার করে নিয়েছেন।

কারণ মুরল্যান্ড কৃষি পরিসংখ্যানমালায় জেলাগুলোর বার্ষিক বিবরণকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কেননা, করদ রাজ্যগুলোর আলোচনায়, বিশেষ গোড়ার দিক্কার কৃষি পরিসংখ্যান ও আদম শুমারীর বিবরণ দুই-ই প্রায় অসম্পূর্ণ। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে পরবর্তিকালের বিবরণ ও 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের' তথ্য নেয়া হয়েছে। ইরফান হাবিব মনে করেন মুরল্যান্ড এই বিশ্বাস থেকে কাজ করেছিলেন যে, এই সময়ের বৃটিশ ভারতীয় অর্থনীতির ফলাফল সবচেয়ে অমার্জিত অবস্থায় ছিল। তাই পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের সেরা দিনগুলোর সঙ্গে তুলনার জন্য এই অংকগুলোই সবচেয়ে সুবিধা জনক।[৭] সুতরাং ,ইতিমধ্যেই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, ইরফান হাবিব তাঁর গবেষণাকর্মে তৎকালীন মুঘল ভারতের ভূ-সম্পদের প্রকৃতি, পরিমাণ ও স্বরূপ আবিস্কারেই ক্ষান্ত হননী, বরং তাঁর উদ্দেশ্য ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু-ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসিক ধারাকে আধুনিক ভারতীয় প্রেক্ষিতে বিবর্তিত রূপে উপস্থিত করা। একাজে তিনি সফল হয়েছেন বলে মনে হয়। কেননা হাবিব পরবর্তি পন্ডিতগন তাঁর কর্মের এই দিকটি নিয়ে কোন জোরালো বির্তক তুলেননি।

ইরফান হাবিব কৃষিজ উৎপাদন অধ্যায়ে আবাদী এলাকার সীমানা নির্দিষ্টকরণ, সরকার, পরগণা ও গ্রামের অবস্থা ও অবস্থানগত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অত্যন্ত চাতুর্য ও সচেতনতার সহিত বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির বৈশিষ্ট্য ও চাষবাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। যেমনঃ দোয়াব এবং হরিয়ানা অঞ্চলের ভূ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি চাষ ব্যবস্থার কথা বলেছেন যে,"দোয়াব ও হরিয়ানা এই দুই ভুঅঞ্চলে খাল সেচের ভূমিকা গত শতকের শেষের দশকগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।"[৮] মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় নদ-নদী বিলের অবস্থানের কারণে কৃষি উৎপাদন, প্রকৌশল ও উৎপাদন পরিমাণ ভিন্নমাত্রা পরিগ্রহ করত। এবং ভারতীয় কৃষির প্রকৃতির লীলা খেলার বিচিত্র রূপটি তিনি বিভিন্ন এলাকার ভূমি বিষয়ক পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় ইতিহাস অধ্যায়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা।

পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে ব্যাপক পরিধি হাবিব নিয়েছেন আলোচনার এক পর্যায়ে নিজেই তা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর আলোচনায় উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত ছকে ব্যাখ্যা করেছেন। কয়েকটি ছোটখাট সমস্যা বাদ দিলে এই সব পরিসংখ্যানের ধাচঁ খুবই সুসংহত, আর এর সমর্থনে যে তথ্য পাওয়া যায় তার পরিমাণও তুচ্ছ নয়। আধুনিক পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করে যে দলিলগুলো পাওয়া যায় তার উপর অন্তত কিছুটা আস্তা রাখার অধিকার এর থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাই এ কথা নিশ্চিত বলেই মনে হয় যে, মুঘল আমলের পর থেকেই চাষাবাদ বেড়েছে সবর্ত্র, যদিও মাত্রার হেরফের আছে। তিনটি অঞ্চলে এই বৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশীঃ প্রায় শতকরা একশ ভাগ। প্রথম অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এলাহাবাদ, অযোধ্যা বিহার এবং সম্ভবত বাংলার কিছু অংশ। অবশ্যই এখানে এই বৃদ্দি ঘটেছিল প্রধানত বিরাট পাহাড়তলীর জঙ্গল, তরাই পুরুদ্ধার করে। দ্বিতীয় অঞ্চল হল বেরার। এখানে চাষ-আবাদ ছড়িয়েছে মধ্য ভারতীয় জঙ্গল সাফ করে। আর অবশেষে কিছু উপত্যকা, এখানে কৃষি বিকাশ ঘটেছে প্রায় পুরোপুরি আধুনিক খাল ব্যবস্থার ফলে। মনে হয় এ অঞ্চল বাদে অন্যত্র চাষ আবাদ বৃদ্ধির হেরফের হয়েছে একের দুই-ভাগ থেকে একের তিন ভাগ, বা মাত্র একের চার ভাগ। এই বৃদ্ধিতে জঙ্গলসাফাই এর কোন ভূমিকা নেই। প্রধানত নীচু মানের জমি আর চারণভূমিতেই লাঙ্গল চালিয়ে এমন করা সম্ভব হয়েছে। এধরনের কাজ এখনও চলছে।[৯]

সবশেষে তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটির মিমাংসা করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত নথিপত্রের সর্তক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে হাবিবের মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার হল, জমির গড়-পড়তা উৎপাদনের প্রশ্নটি জড়িত ছিল চাষাবাদের বিস্তারের দুটি পদ্ধতির সাথে। প্রথমতঃ নীচুমানের জমিতে চাষের বিস্তার ও দ্বিতীয়তঃ সাফ করা জঙ্গলের ক্রমাগত ব্যবহার। প্রথম কারণটি প্রায় সর্বত্রই কাজ করেছিল। মুঘল আমলের পর যেসব নীচু জমিকে লাঙ্গলের বশে আনা হয়েছিল, তার

পরিমাণ দাঁড়ায় আগের আবাদী এলাকার তুলনায় একের তিন ভাগ, এমনকি কোথাও কোথাও অর্দ্ধেক। দ্বিতীয় কারণটিকে বিহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝা যেতে পারে। সেখানে পুরানো সাফাই করা জমি ফুরিয়ে গেলে লোকে সে জায়গা ছেড়ে চলে যেত, আবার অন্যত্র নতুন করে জঙ্গল সাফ করা হত।

প্রথম উপ অধ্যায়ের সর্বশেষ আলোচনায় লেখক বিভিন্ন জরিপ ও আদম শুমারীতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে গ্রামগুলোর ব্যাপক হ্রাস বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। উত্তর ভারতীয় প্রদেশগুলোতে গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[১০] অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য এলাকায় গ্রামগুলোর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একটি আনুমানিক কারণ তিনি তুলে ধরেছেন যে,"সুনিরাপত্তার জন্য ছোট ছোট গাঁ ছেড়ে লোকে চলে যায় বড় গ্রামে। অথবা পরে যখন দুটি গ্রামের সীমাসূচক সব অহল্যাভূমি ও চারণভূমি চষে ফেলা হল, তখন নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে অন্য গ্রামের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবনতা দেখা দিয়ে থাকতে পারে"।[১১]

আবাদের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে আবাদের উপকরণের ও সেচের উপকরণের প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত। মুঘল ভারতীয় স্থূল কৃষি উপকরণের আদিমতা নিয়ে তিন-শ- বছর আগে কোন প্রশ্নই উঠত না বলে হাবিব যে মত পেশ করেছেন তা যথার্থ। এক্ষেত্রে মুঘল ভারতীয় কৃষি উপকরণ তৎকালীন ইউরোপীয় পর্যটকদের দৃষ্টিতে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, বা ভারতীয় কৃষি উপকরণ সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব কি ছিল তা তুলে ধরেছেন। ইউরেপীয়দের দৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষি পদ্ধতি সে সময়ের মাপকাঠিতে আদৌ আদিম স্তরের ছিলনা।[১২] উর্বরতা বাড়ানোর জন্য মাছের ব্যবহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। কোন বিশেষ জাতের শস্য যা জমির উর্বরতা বাড়তে পারে তাও ভারতীয় কৃষকের জানা ছিল বলে ইরফান হাবিব মত প্রকাশ করেছেন।

ইরফান হাবিব মনে করেন, যে অসাধারণ বিষয়টি ইউরোপীয় পর্যটকদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল, তাহল বছরে দুবার এবং কোন কোন এলাকায় তিনবার ফসল তোলা। কৃষির অসাধারণ এই বিকাশের কারণ খুঁজতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন যে,"পর্যায়ক্রমিক শস্য উৎপাদন কার্যত ছিল প্রকৃতিরই দান, আর কোন কোন বিশেষ ধরনের মাটিতে কোন বিন্যাস সবচেয়ে উপযোগী হবে সে ছিল অভিজ্ঞতার ব্যাপার ।"[১৩] তবে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিকের প্রতি লেখক গুরুত্বারোপ করেছেন-যা কৃষি সভ্যতা বিকাশের আধুনিকায়নের পরিচয় বহন করে, তাহল মৌসুমী বৃষ্টির স্বাভাবিক দানকে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা দিয়ে পরিপূরণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রধানত ব্যবস্থা নেয়া হত 'কুয়ো', 'পুকুর' ও 'খাল' কেটে।[১৪] তিনি সেচ-ব্যবস্থা ও সেচের বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতির এক ব্যাপক তথ্য নিষ্ঠ পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই পর্যায়ে লেখকের বক্তব্যের সার- সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি ও দক্ষিণে কিছু কিছ অংশে কুয়োই ছিল সেচের প্রধান উৎস। কুয়ো থেকে জল উঠানোর বহু পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। ঝিলমের পূর্বদিকে 'লাহোর', 'দিপালপুর' এবং 'সিরহিন্দি' প্রদেশে ছিল একাধিক 'অরহট', বা 'রহট' পদ্ধতি, ইংরেজরা একে 'পারসী চাকা' পদ্ধতি বলত। আগ্রার চারধারে এবং আরো পূর্বদিকে জোড়া বলদ দিয়ে (চরস) বা চামড়ার থলি করে জল টেনে তোলার চল ছিল। ফ্রায়ারের বিবরণে 'লিবার' রীতিতে গড়া 'ঢেৎকলীর' মাধ্যমে পানি টেনে তোলার বিবরণ রয়েছে। 'খর-মরুভূমি'তে সেচ ব্যবস্থাকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে পেশাদার যাযাবর কুয়ো খুঁড়িয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের বিবরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাবিব মন্তব্য করেছে যে, বিভিন্ন প্রদেশে ফসল প্রধানত বৃষ্টির পানি ও কুয়োর পানির উপর নির্ভর করত। কাজেই আবুল ফজল সেচের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা অবান্তর মনে করেছেন।[১৫] কিন্তু আবুল ফজলের এই মন্তব্যে ইরফান হাবিব চমৎকৃত হয়েছেন যে, লাহোর প্রদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলে চাষাবাদ হত কুয়ো সেচের সাহায্যে। এর ব্যাখ্যায় লেখক মন্তব্য করেছেন যে,

"পাঞ্জাবের উত্তরাংশে কুয়ো ছিল এখনকার চেয়ে অনেক জরুরী, আবার বহু ভূখন্ডে, বিশেষতঃ মধ্য গংগা-যমুনা দোয়াবে প্রাকৃতিক নিকাশ ব্যবস্থার মধ্যে খালের অনুপ্রবেশ ঘটায় সম্ভবত কুয়োর সংখ্যা কমে গিয়েছিল।[১৫] পুরাতাত্ত্বিক নির্দশনের ভিত্তিতে হাবিব মধ্য ভারত ও দক্ষিণের সেচের পুকুর গুলোর প্রাচীনত্ব আবিস্কার করেছেন।[১৫] তাভার্নিয়ে 'গোলকুন্ডা'কে পুকুরে ভর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। 'বিহার' প্রদেশের উত্তর দিকে বাঁধ দিয়ে তৈরী 'কামথানা' নামে যে বিশাল পুকুর ছিল তাকে যথার্থই এক 'টাইগ্রিস' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এর ফলে এই প্রদেশের চাষীদের বৃষ্টির উপর নির্ভরশীলতা চূড়ান্তভাবে হ্রাস পেয়েছিল।[১৬] শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষদিকে মুঘল প্রশাসন বাঁধ তৈরীর জন্য 'বেরার', 'খান্দেশ',ও 'পাইনঘাটে'র চাষীদের কাছ থেকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিম দেয়ার যে প্রস্তাব মুঘল প্রশাসন পেশ করেছিল তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলে হাবিব মনে করেন। এই সময় উত্তর ভারতের মেবারে উদয় সাগরের '১৬ কুয়োহ' পরিধির বিখ্যাত জলাধারটি ঐ এলাকার গম চাষে সাহায্য করেছিল।

ইরফান হাবিব সেচ ব্যবস্থার সত্যিকার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রাপ্ত নথিপত্রের আলোচনা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থান পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমেই চাষাবাদের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, লাঙ্গল, জোয়াল, গরুর ব্যবহারসহ প্রচলিত অন্যান্য উপকরণের একটি পরিচয় তুলে ধরেছেন, যা হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় আজও আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় জীবন্ত রয়েছে। কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে চূড়ান্তভাবে জড়িত সেচের বিভিন্ন উপকরণ, পদ্ধতি, মাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধান আধুনিক ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের পাঠককে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি সর্ব প্রথম না হলেও নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপক তথ্য সরবরাহকারী বটে। এ বিষয়ে যিনি পথিৎকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন সেই মুরল্যান্ডের মতের বিরোধীতা করে তিনি বলেছেন যে,"মুঘল ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিজ উৎপাদনে স্বাভাবিক প্লাবণের নালাগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলেও বেশ কিছু খাল কাটা হয়েছিল যার কয়েকটি সত্যিই বেশ বড় মাপের কাজ"।[১৭] আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে তিনি বলেন যে,"জলধারণের ক্ষমতা বা কারিগরিবিদ্যার ব্যবহার বা বিন্যাসের সুষ্ঠুতা কোন দিক দিয়েই আধুনিক খাল খননের সঙ্গে এগুলোর তুলনা চলেনা।" তাসত্ত্বেও সিন্ধু উপত্যকা ও উচ্চ গাংগেয় সমভূমিতে বিশাল আধুনিক খাল ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় খাল ব্যবস্থার চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

কৃষির জন্য আবাদী ভূমি, উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের পর কৃষি ব্যবস্থাপনার আলোচনার পরিধিতে কৃষিজ উৎপন্ন পণ্যের ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। তা সত্ত্বেও ইরফান হাবিবের এ পর্যায়ের আলোচনা, (শস্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য) একাধিক ভিন্ন মাত্রা পরিগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি মুঘল ভারতীয় কৃষিজ উৎপাদনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন শস্যের ব্যাপক বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষিজ দ্রব্যের ভূমিকা, অর্থকরী ফসল ও উৎপাদনে কৃষক সচেতনতা, কৃষিজ উৎপাদনে প্রশাসনের ভূমিকা বিশেষ করে বাজার মূল্যের ভিত্তিতে কৃষিজ উৎপাদনে কৃষকের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তাঁর আলোচনার আলোকে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন শস্যের যে বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত -সার নিম্নরূপ। আসাম উপত্যকা, বাংলা, উড়িষ্যা পূর্ব উপকূল, তামিলদেশ, পশ্চিম উপকূলের একফালি সংকীর্ন জায়গা ও কাশ্মীরে ধানের চাষ হত। গম ও জোয়ারে চাষ ছিলনা বললেই চলে। এ ছাড়াও বিহার, এলাহাবাদ প্রদেশের কিছু এলাকায় ধান হত। গুজরাট, বিশেষত দক্ষিণ উপকুলবর্তী অঞ্চলে ধান ফলত। উত্তর পশ্চিমের শুর্খা অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধানের চাষ হলেও সিন্ধুনদ ও শাখা নদীগুলোর সেচের ফলে ধানই ছিল ঐসকল-ব-দ্বীপ এলাকার প্রধান ফসল। লাহোরেও উচ্চজাতের ধান বোনা হত।

মধ্য সমভূমি ও গুজরাটে গম ও বার্লি সর্বাধিক উৎপন্ন হত। বাংলায় গম চাষ হলেও এর চাষ ভালো হতনা। কন্নড়, তামিলনাড়ু ও কাশ্মীরে একেবারেই বার্লির চাষ ছিলনা। গম চাষের এলাকায় জোয়ার ও বাজরার চাষ একেবারেই হত না। পশ্চিমে দিপালপুর অঞ্চলে জোয়ার ছিল প্রধান 'খারিফ' (শরৎ) শস্য এখানে 'রবি' (বসন্ত) শস্যের সময় গমের চেয়ে জোয়ার বাজরা চাষই ছিল বেশী। ডালের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি। আইনে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করে ইরফান হাবিব বলেন ,"আইন থেকে বিভিন্ন শস্য সম্বন্ধে যা জানা যায় তাতে মনে হয় সাধারণভাবে উৎপাদনের ধরণ যদি একেবারেই এক না ও হয়, তাহলেও মিল ছিল খুবই।"[১৮]

মুরল্যান্ড ও 'আইন' এ অযোধ্যা, আগ্রা ও দিল্লী প্রদেশের বিভিন্ন শস্যের যে দাম ও রাজস্ব নির্ধারণের হার দেয়া আছে সেগুলো পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে,"এক শস্যের অংকে আরেক শস্যের দাম ও একক প্রতি -উৎপন্নের মূল্য সেই আমলের পর থেকে অল্পই পাল্টেছে"[১৯] শস্যের দামের উঠা নামা তৎকালীন কৃষিজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করত বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে,"শুখা' জমিতে ঐ সময় জোয়ারের চাষের বদলে ভুট্টার চাষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।"অবশ্য ভারতে সতর শতকে এই প্রয়োজনীয় শস্যটির কথা জানা না থাকলেও উনিশ শতকে জলবায়ুর ফলে খাপ-খাইয়ে এই শস্যটির ব্যাপক চাষ হতে থাকে। ইরফান হাবিব শস্য মূল্য ও রাজস্ব নির্ধারণে শস্যমূল্যের তারতম্যের কারণে চাষবাদে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের আর্বিভাব ও অর্ন্তধান ঘটত বলে মনে করেন।[২০]

অর্থকরী ফসলের একটি পৃথক বিবরণী লেখক উপস্থিত করেছেন। মুঘল ভরতে এই শ্রেণীর শস্যকে 'জিনস্-এ কামিল' বা 'জিনস্- আলা' বলা হত। যার অর্থ বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন উচু জাতের ফসল। আধুনিক শ্রেণী বিভাগের অর্থকরী ফসলের কার্যও তাই। এই ধরনের দুটি প্রধান শস্য ছিল তুলা ও আখ।[২১] লেখকের মতে গোটা উত্তর ভারত জুড়েই তুলোর চাষ হত। তবে বোম্বাই ও খান্দেশে এটি ভিন্ন মাত্রায় ছিল। আর তুলা ছিল বাংলার প্রধান ফসল যেখানে তার চাষ এখন নেই বললেই চলে।[২২] এ পর্যায়ে ইরফান হাবিব আধুনিক অবস্থার নিরিখে তুলা উৎপাদন ও বিপণনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তুলার বাজার মূল্যের সাথে তার উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যর উপর আলোকপাত করেছেন। অর্থকরী ফসল হিসাবে আখের ব্যাপক উৎপাদনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং আখের চাষ তুলার চেয়ে বেশী হত বলে তিনি মনে করেন। আখের চাষে সম্ভবত বাংলা ছিল শীর্ষস্থানে। পরিমাণ ও মান-দুদিক দিয়েই বাংলার চিনি ছিল সবার সেরা।[২৩]

তৈলবীজ উৎপাদনে ভৌগোলিক বিভাগে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পরিবর্তন ধরা পড়েনি। রেপসীড, শষিনা, তিসির চাষ কম বেশী উত্তর ভারতের সর্বত্রই ছিল। বাংলায় এগুলো ছিল খুবই পরিচিত। তন্তু উৎপাদন ফসল হিসাবে এই সময় পাটের চেয়ে ফলের চাষ অধিক হতো বলে ইরফান হাবিব অনুমান করেছেন। এবং অনুমানের পিছনে বিভিন্ন যুক্তিও তিনি উপস্থিত করেছেন। বাংলায় পাট উৎপাদন হত শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের জন্যই।[২৪]

ইরফান হাবিব মনে করেন যে,"রঞ্জক উৎপাদন ফসলকে এখন আর কোন গুরুত্ব না দেয়া হলেও এক সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।"মধ্যযুগীয় বিশ্বে রঞ্জক উৎপাদক ফসলের বেশ গুরুত্ব ছিল বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, মুঘল ভারতীয় বাণিজ্য বিষয়ক লেখাপত্রে বিশেষ করে নীলের চাষের কথা বার বার এসেছে। সবচেয়ে ভালো জাতের নীল জন্মাত আগ্রার বায়নাতে। সাধারণত দ্বিতীয় স্থান দেয়া হত আহমেদাবাদের কাছে সরখেজ-এ-উৎপন্ন নীলকে। সিন্ধু প্রদেশে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের নীল চাষ হত। দখিনের তেলিঙ্গনার নীল একটা মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল। নীলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে,"নীলই হল সম্ভবত একমাত্র ফসল যার ফলন সম্পর্কে

সমসাময়িক কালের আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়।"প্রাপ্ত তথ্যসুত্রগুলোর আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে লেখক বলেন, "মুঘল সাম্রাজ্যে র প্রধান তিনটি নীল উৎপাদক ভুখন্ড বায়ানা, দোয়াব, মেওয়াট,সরখেজ ও সিহওয়ানে এর রঞ্জক দ্রব্যটির বাষিক উৎপাদন অনুকুল বছরে ১৮ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত হত।"[২৫]

মুঘল আমলে আফিম-গাঁজার চাষ বিদ্যমান ছিল। তবে বাদশাহী প্রশাসনের কড়াকড়ির ফলে তা বহুলাংশে কমে গিয়েছিল। আবার সিদ্ধি ও ভাঙ্গের চাষ হত ব্যাপকভাবে, যদিও আরঙ্গজেব এটি পুরোপুরি উচ্ছেদ করেছিলেন বলে তিনি মনে করেন। ভারতে যত জিনিস উৎপন্ন হত, মসল্লার মধ্যে মরিচ ছিল ব্যবসায়িক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পিপুল হত প্রধানত বংলায়, তবে সবচেয়ে ভালো জাতের গোল মরিচ বা কালো মরিচ পাওয়া যেত মুঘল সাম্রাজ্যের সীমার বাইরে, পশ্চিমঘাট পবর্তমালায়। হাবিব মনে করেন যে,"পান চাষের ক্ষেত্রে আজকের তুলনায় খুব সমান্য তফাৎও নজরে পড়েনা। তবে বর্তমানে উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা পানচাষ বাড়াতে সাহায্য করেছে মাত্র।"[২৬]

মুঘল ভারতে ব্যাপক ভিত্তিতে সব্জীর চাষ হত। শহরের চাহিদা মিটানোর জন্য শহরের কাছাকাছি ছোট ছোট জমিতে সব্জী চাষ করার মত বাড়তি উৎসাহ পাওয়া যেত। ইরফান হাবিব মনে করেন, মালী নামের এক বিশেষ জাতের লোক শুধু একাজেই হাত পাকিয়েছিল। তিনি মুঘল পরবর্তী সব্জীর বিবর্তনে রাঙ্গা আলু এবং সাধারণ আলুর সংযোজন লক্ষ্য করেছেন।[২৭] তবে বিভিন্ন প্রকার খাম আলুর কথা লোকে আগেই জানত।

ভারতে ফলের চাষের প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইরফান হাবিব তৎকালিন ভারতীয় পরিবেশে ফলের চাষের বৈচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,"স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশী রকমফের ছিল ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে।"[২৮] জঙ্গলে বিপুল বুনো ফল ছাড়াও চাষীরা বুনত বিশেষ কিছু কিছু ফলের (বিশেষ করে তরমুজের) চাষ করতেন। কৃষকরা বাগানে সারি করে আমের চারা রোপন করতেন। চাষীরা বাগানের মালিক হলেও বেশীব ভাগ ক্ষেত্রে বাগানের মালিক হতেন আরো ধনী কোন বণিক। খানদানী লোক ও রাজকর্মচারীদেরও ফলের বাগান ছিল। তাঁরা নিজেরাই শুধু এর ফল খেত না, মুনাফা করার জন্য বিক্রিও করত। মুসলমানের কবরে গড়ে তোলা ফলের বাগানে উৎপন্ন ফল বিক্রি করেই তাঁদের বংশধরদের বা কবরের পাহারাদরদের ভরণ পোষণ চলে যেত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরফান হাবিব মনে করেন যে,"ফলের উৎপাদন পদ্ধতি, স্বাদ, ব্যবহার বিধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তৎকালীন তথ্য সূত্রে প্রাপ্ত বক্তব্য আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও সমান-সত্য। তবে আলোচ্য পর্বে ও পরবর্তিকালে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্তণ হয়েছে।"[২৯]

সতর শতকের প্রথমদিক হতেই বিশেষ করে ইউরোপীয় জাতিগুলোর আগমনের ফলে (এক্ষেত্রে বিশেষভাবে পর্তুগীজদের কথা বলা যায়) ভারতীয় কৃষি পণ্যের তালিকায় অনেক নতুন দ্রব্য সংযোজিত হয়। এদের মধ্যে কতগুলো পণ্য আর্থিক পণ্য হিসাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তার মধ্যে তামাক চাষের সূচনা ও দ্রুত প্রসার একটি গুরুত্বর্পর্ণ বিষয়। আকবরের আমলে তামকের যাত্রা আরাম্ভ হলেও জাহাঙ্গিরের পোষাকী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তা দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। ইরফান হাবিব মনে করেন "শাহ্জাহানের আমলেই খানদানী লোকদের বাড়ীতে সুগন্ধী জিনিসের মধ্যে তামাকও ঢুকে পড়েছিল। তামাকের ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে চাষীরা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে এর চাষ করতে লাগল যে, তামাক আর সব ফসলকে টেক্কা দিতে লাগল।"[৩০] ১৬১৩ সালে সুরাটের আশে পাশের গ্রামগুলোতে প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ আরাম্ভ হলেও এত দ্রুত এর প্রসার ঘটে যে, ১৭ শতকের মধ্যভাগে দুটি রাজস্ব বিষয়ক পুস্তিকায় সম্বল ও বিহারের মত দূর এলাকাতেও তামাক চাষের কথা জানা যাচ্ছে। আমেরিকা হতে পর্তুগীজ মারফত যে সব নতুন ধরনের ফলগাছ এসেছিল তার ফলে ভারতীয় পরিবেশে বাগান করার রীতিনীতি ও ফলনের

ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হল আনারস, এটি অতিদ্রুত গোটা মুঘল ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ শতকের শেষ দিকে বাংলা, গুজরাটসহ অন্যান্য ভারতীয় এলাকাতেও এর চাষ এতই ব্যাপক হয়ে যায় যে, আনারস এইসব এলাকায় প্রধান উৎপাদনের মধ্যে গণ্য হতে থাকে। পেঁপে ও কাজুবাদাম একই উৎস হতে এসেছিল। কিন্ত এ দুটি ফলের প্রসার এত দ্রুত ঘটেনি। পেয়ারা চালু হয় সম্ভবত আলোচ্য পর্বের পরে।[৩১] মোটামোটিভাবে ফলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইরফান হাবিবের মতামত ছিল এই।

মুঘল ভারত রেশম উৎপাদনের জন্য বেশ বিখ্যাত ছিল। হাবিব মনে করেন যে,"মুঘল সাম্রাজ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী রেশম উৎপন্ন হত বাংলায়।" আসাম, কাশ্মীর এবং পশ্চিম উপকূলে রেশমগুটি চাষের চল ছিল। রেশম উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য পর্যাপ্ত না হলেও হাবিব তার্ভানিয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বলেন যে,"বাংলায় কাসিমবাজারে একই বছরে ২২০০০ গাট রেশম যোগান দিতে পারে। এক গাঁট সমান ১০০ 'লিভার' বললেও হাবিব মনে করেন তা ছিল ৩.১ বা২.৪ মিলিয়ন এর যেকোন একটা। মুঘল যুগের লাক্ষা শিল্প বর্তমানে তার স্বরূপে বজায় আছে বলে তিনি মনে করেন।"[৩২]

ইরফান হাবিব প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে, গবাদি পশু ও অন্যান্য ভারবাহী প্রাণীর ক্ষেত্রে ১৭ শতকের কৃষকদের অবস্থা তার এখনকার বংশধরদের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, বর্তমানের তুলনায় পশু চারণের জঙ্গল ও অহল্যাভূমি দুই-ই ছিল অনেক বিস্তৃত। এমনকি বাংলার মত ঘন আবাদী প্রদেশেও মানরিক বিরাট পশুর পাল ও তাদের চারনভূমি দেখতে পেয়েছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকদের দেয়া তথ্যে ভারতের নানান জায়গায় বিরাট সংখ্যক গবাদি পশুর যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে হাবিব তা তুলে ধরেছেন।[৩৩] ইরফান হাবিব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মন্তব্য করেছেন যে, তৎকালীন ভারতীয় চাষীর গবাদি পশুর প্রাচুর্য ছিল। কেননা, আবুল ফজল যখন উল্লেখ করেন যে,লাঙ্গল পিছু চারটে বলদ দুটো গরু আর একটি মোষের জন্য কোন কর লাগত না, তখন ধারণা হয় যে, আজকের তুলনায় তখন সাধারণ চাষীর কাজের জন্য অনেক বেশী গরু মোষ থাকত। গবাদি পশুর পর্যাপ্ততার প্রমাণ হাজির করতে গিয়ে ইরফান হাবিব বলেছেন যে, "বাংলায় মাখন এত প্রচুর হত যে, তা শুধু সেখানকার লোকই খেতনা, রফতানিও হত।"[৩৪]

এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় পরিবেশে গবাদি পশু সম্পদের বিকাশ না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইরফান হাবিব কতিপয় যুক্তি পেশ করেছেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তিনি দিয়েছেন এই বলে যে, "অপ্রয়োজনীয় গবাদি পশু মেরে ফেলার বিষয়ে চিরাচরিত অনিহা থাকায় ভালো জাতের পশু প্রজনন সম্ভব হত বলে মনে হয় না।"[৩৫] ইউরেপীয় গাভীর তুলনায় ভারতীয় গাভীর অল্প দুধ দেয়ার বিষয়টি তুলে গবাদি পশু অব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাসত্ত্বেও তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত যে যুক্তি পেশ করেছেন তা নিরেট সত্য হতে পারেনা। এ বিষয়ে ভারতীয় জলবায়ু, পরিবেশ, পশু খাদ্য, নিম্ন জাতের পশু ও তার ধারাবাহিক প্রজনন ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ইরফান হাবিব যদি এই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে সমস্যাকে বুঝার চেষ্টা করতেন তবেই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হত। গবাদি পশুর প্রাচুর্যতার কথা বিবেচনা করে তিনি গোবর সারের ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। তবে আগ্রা প্রদেশের মত ঘন আবাদি জায়গায় গরীবেরা সাধারণত ঘরের কাজে ঘুঁটে পোড়াতেন, কারণ এখানে জ্বালানি কাঠ ছিল দুস্প্রাপ্য।

এ পর্যায়ে আলোচনার উপসংহার টানতে গিয়ে ইরফান হাবিব কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন, যা শুধুমাত্র মুঘল ইতিহাসের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি নয়, ববং আধুনিক ভারতের কৃষি ইতিহাসের সত্যিকার

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাগুলো উন্মোচিত করেছে। তিনি এই বলে বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন যে, মুঘল আমলের পরের কৃষির পরিবর্তনগুলো আলোচ্য সূচীর পর্যায়ভুক্ত না হলেও মুঘল ভারতীয় কৃষিজ উৎপাদনকে বুঝতে পারার জন্য কতগুলো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা উচিত। এইপরিবর্তন গুলো নিম্নরূপ ঃ কৃষি এলাকা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতক এলাকায় বিশেষ ধরনের শস্য চাষের ব্যাপারটি ভৌগোলিকভাবে যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১৯ শতকে দেখা দিল এক দ্বৈত প্রক্রিয়াঃ, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় হস্ত শিল্প, বিশেষ করে তাঁত ধবংস হয়ে গেল। আমাদের কৃষি অর্থনীতি পরিণত হল বিশ্বের কারখানার কাচামাল যোগানের উৎসে। ঐ একই তাড়নায় নীল ও রেশমগুটিরও চাষ অবশেষে নষ্ট হয়ে গেল। তবে মুঘল পরবর্তি কৃষি-ব্যবস্থায় একটি ইতিবাচক দিক হল অঞ্চল ভাগ করে শস্য উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থার ফলেই যারপক্ষে যেটি উপযুক্ত সেই রকম জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে মুঘল আমলে প্রবণতা ছিল প্রধান প্রধান শস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসর্ম্পূণ হওয়ার দিকে, আর প্রায় সব অঞ্চলেই এই নীতি মানতে হত। তাছাড়া তখন জোর দেয়া হত খাদ্য শস্য উৎপাদনে। ফলে কৃষির অনুকূল বছরে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকত। ভারতীয় কৃষির ধবংসের প্রেক্ষাপটের প্রতি নজর রেখে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, এক মুমূর্ষু অর্থনীতির পরিবেশে হঠাকারিতা করে চারনভূমি ও বন ভূমি দখল করার ফলে পশু পালনের ক্ষেত্রে এক ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়েছে। পরিশেষে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি এভাবে বলেছেন যে, "দেশে লাঙ্গল টানা ও জল তোলার জন্য পশুশক্তির ব্যবহার হয়, যেখানে পশুপালনকে অবশ্যই কৃষির অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসাবে গণ্য করা উচিত।" [৩৭]

উল্লিখিত মন্তব্যগুলোর গুরুত্বের মৌলিক দিকটি আজও ভারতীয় সমাজ -ইতিহাসের পাঠকের নিকট সমান গুরুত্ব বহন করে। মুঘল ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্বতির রূপান্তরের বিষয়ে ইরফান হাবিব ইতিমধ্যে যতটুকু আলোচনা করেছেন তা পরিবর্তনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। অবশ্য হাবিবের এসকল আলোচনার সাহায্যে পাঠক উৎপাদিত পণ্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে যতটা জানতে পারেন, পরিবর্তণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনের পিছনে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশেষ করে বাদশাহী প্রশাসন ও সামন্তশ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে তেমন কোন জুরালো উত্তর এ পর্যায়ে পাওয়া যায় না। অত্র গবেষণাপত্রের ২য় অধ্যায়ে (গ্রামীন সমাজঃ তত্ত্ব ও বস্তবতা) যথেষ্ট আলোচনা হওয়ায় এ পর্যায়ে আলোচনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

কৃষির উৎপাদনের সাথে কৃষিজাত হস্তশিল্প তথা গ্রামীন কুঠির শিল্পের প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাভাবিক কারণেই ইরফান হাবিব তাঁর 'কৃষিজ উৎপাদন' সংক্রান্ত আলোচনার শেষাংশে কৃষি সংক্রান্ত হস্ত শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আলোচনার প্রারাম্ভে যেমন কৃষিজ উৎপাদনের সঙ্গে কারিগর শ্রেণীর জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন এই বলে যে, "কৃষি জীবনের একটি লক্ষনীয় দিক ছিল বিশুদ্ধ কৃষি কর্মের সঙ্গে কারিগর ধারার বা কার্যধারার মিলন।" পরক্ষণেই তিনি এই আলোচনার সমাপ্ত টেনে দিয়েছেন এই বলে যে, "গ্রামীণ কুঠির শিল্পের বিন্যাস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম হিংস্র অধ্যায়।"[৩৮] সুতরাং, তিনি আলোচনার সীমারেখা যেমন নিদিষ্ট করে দিয়েছেন, তেমনী কুঠির শিল্পের বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধেও জোরালো ইঙ্গিত দিয়েছেন। অতপর, তিনি চাষী পরিবারের সহিত কিভাবে বাধ্যগতভাবেই কারিগরি ক্রিয়াকর্ম জড়িত ছিল তা তুলে ধরেছেন। যেমন, অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে চাষীদের হাত থেকে সেগুলো বেরিয়ে বা অন্ততপক্ষে গ্রামের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে কিছুটা কারিগরি করতেই হত। শুধু তৎকালীন কলা কৌশলের জন্যই নয়, পরিবহনের কারণেও তার দরকার পড়ত। চাষীদের বাড়ীতেই সুতা বোনা হত। এমনিভাবে চিনি ও গুড় শিল্প, তৈল শিল্প আজও বহু অবহেলিত এলাকায় স্বরূপে বহাল আছে। আগ্রা অঞ্চলে নীল থেকে রং তৈরীতে চাষীদের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হত বলে ইরফান হাবিব যে মন্তব্য করেছেন তাতে করে গ্রামীন কৃষিজ জীবনে কৃষি ও ক্ষুদ্র কুঠির শিল্পের সমন্বয়ে যে স্বাবলম্বী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল মুঘল কৃষি ইতিহাসের জীবন্ত চিত্র।[৩৯] তিনি কুঠির শিল্পের ব্যাপক কোন পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

তুলে না ধরে শুধুমাত্র পরবর্তী সমাজ ও আর্থিক জীবনে এর প্রভাব সম্বন্ধে গুরুত্বপুর্ণ কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন কৃষি থেকে শিল্পের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ গ্রামে ঘরমুখী বেকারত্বের সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছিল। তবে বিষয়টাকে তিনি শর্তাধীন করেছেন এই বলে যে, 'যদি না ঐ বিচ্ছেদের ফলেই এর সৃষ্টি হয়ে থাকে'। তবে উপসংহারে তিনি গ্রামীন সমাজের স্বয়ংস্পূণতার প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন তাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নেয়ার আগে কিছু যুক্তি পেশ করা প্রয়োজন, যা লেখক যে কোন কারণেই হউকনা কেন করেননি।[৪০] তবে এবিষয়ে কৃষি পণ্যের বানিজ্য নিয়ে আলোচনা করার সময়েও কেন করেননি তা বোধগম্য নয়। কৃষিজ পণ্যের বণিজ্য বিষয়ে আলোচনায় কুঠির শিল্পের বিষয়টা বিবেচনায় আস্তে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতেই ইরফান হাবিব কৃষি অর্থনীতির তিনটি অপরিহার্য দিকের কথা উল্লেখ করেছেন, (১) কৃষিপণ্যের বাজার, (২) কৃষি পণ্যের প্রসার ও বিস্তার, (৩) বাণিজ্য কাঠামো। এই আলোকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উপাত্তের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েই বলেছেন যে, "এই মুহূতে এই বিষয়ের খুটিনাটির ভিতর না যাওয়াই ভালো।" [৪১] বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে নিবিষ্ঠ থাকার লক্ষ্যে তিনি কৃষি পণ্যের ব্যবসার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ধরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার কথা বলেই তবে, আলোচনায় প্রবেশ করেছেন।

প্রথমেই তিনি দূরপাল্লার বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষভাবে যাতায়াত ও পরিবহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে দূরপাল্লার বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল যানবাহন। [৪২] আজকের এই ঠাস-বুনট জাতীয় বাজার যে রেলপথের বদৌলতে গড়ে উঠেছে তা উল্লেখ করে তিনি উলিখিত মতামতকে দৃঢ় করেছেন। পরিবহন কাজে নিযোজিত লোকদের নিয়ে ভারতীয় পরিবেশে এক বিশাল যাযাবর জাতি বিকাশ লাভ করেছিল। এদের 'বনজারা' বলা হত। এই বনজারারা পুরো পরিবার নিয়ে 'টান্ডা' বা তাবুতে বসবাস করত। এক একটি বড় টান্ডায় ৬০০ থেকে ৭০০ লোকও ১২০০ থেকে ১৫০০ এমনকি ২, ০০০০০ পযর্ন্ত বলদ থাকত। এই সব বলদ ১,৬০০ থেকে ২,৭০০ টনের মত মাল বয়ে নিয়ে যেত। 'বনজারা'রা' প্রয়োজনে লাখ খানেক বা তার ও বেশী বলদ যোগাড় করে ফেলত। [৪৩]

এই পরিবহন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত,এটা ছিল শ্লথগতি সম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থা। তাছাড়া চলার পথের ধারে ধারে পশুগুলোর জন্য চারনভূমির দরকার হত বলে গ্রীষ্মকালে ও শুকনা এলাকায় 'বণজারা'দের কাজ সীমিত হয়ে পড়ত। এই পরিবহন ব্যবস্থা স্বল্প খরচ সম্পন্ন হলেও এর ব্যবস্থাপনা ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিল।

এসমস্ত কারণেই ইরফান হাবিব মনে করেন যে, নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে সস্তা। বাংলা সিন্ধু ও কাশ্মীরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নৌকায় মাল আনা নেয়া চলত। ৩০০ থেকে ৫০০ টন ওজনের বড় বড় 'বজরা' যমুনা ও গংগা ধরে আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা পযর্ন্ত আসত। প্রতি বছর জলপথে আগ্রা থেকে বাংলায় শুধু নুনই যেত দশ হাজার টন। নৌ বাণিজ্যে ভারতীয় উপকুগামী নৌকাগুলোর ভূমিকা তিনি খাট করে দেখেননী, বরং ইউরোপীয় বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ভারত সাগর গুলোতে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় জলদস্যু সূলভ আচরণ নিয়ে এগুলোর উপর আক্রমন চালাত। [৪৪]

মুঘল ভারতীয় বাণিজ্যের উপর পরিবহন ব্যবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে ইরফান হাবিব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজকের মত তখনকার দিনেও পরিবহণের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করত। পরিবহন ব্যয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টায় তিনি সমকালীন প্রাপ্ত নথিপত্রের বিচার

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষন করেছেন। আইন, 'ফ্যাক্টরিস' ইত্যাদি উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হল, ১৭ শতকের গোড়ার দিকে আগ্রা থেকে সুরাট পর্যন্ত একমন ওজনের মাল উটের পিঠে চাপিয়ে আনতে খরচ পড়ত আইনে নির্দিষ্ট 'দাম' অনুযায়ী তা ঐ ওজনের গমের দামের প্রায় চার গুন, কিন্ত সাদা চিনির দামের মাত্র অর্ধেক। আবার সতর শতকের মাঝামাঝি সময় মুলতান থেকে ঠাট্টায় মাল নিয়ে যেতে, আইন এ নির্দিষ্ট দাম অনুযায়ী খরচ পড়ত গমের দামের দ্বিগুন। কিন্ত সাদা চিনির প্রায় একের ছয় ভাগ। সুতরাং দূরদূরান্তের বাজারের মধ্যে দামের যে আনুপাতিক ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হত তা অনেক সময়ই পরিবহন ব্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হত। উপরত্ত স্থল পথের চেয়ে নদী পথে দামের পার্থক্যের হার আরো কম হত।[৪৫]

ইরফান হাবিব মনে করেন মুঘল ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যে কম-ব্যবস্থা, অন্য কথায় প্রচলিত শুল্ক ব্যবস্থা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করত। মূলতঃ মাল চলাচলের উপরই এই শুল্ক চাপানো হত। আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ 'বাজ''তমগা' অথবা 'জাকাৎ' নামে পরিচিত ধরনের কর পুরোপুরি অথবা আংশিক ছাড় দিয়েছিলেন। ছাড় দেয়া শুল্কগুলোর বেশীর ভাগই অধিকার ভুক্ত রাজ্যগুলো থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া।[৪৬] বিভিন্ন ফরমান, আদেশের দ্বারা ঐ সমস্ত শুল্ক যতই রদ করা হউক না কেন সামন্ততান্ত্রিক ভারতে কোন 'হুকুম', 'ফরমান', 'নিশান' তেমন কার্যকর ছিলনা। কারণ স্থানীয় প্রশাসন রাজস্ব আদায়ের এক ধরনের অধিকার ভোগ করত। ফলে বাদশাহী ফরমানের অসারতা প্রায়ই প্রমাণিত হত। কারণ, সব রকম শুল্কই আদায় করা হত বেআইনীভাবে জায়গীরদার বা অন্যান্য রাজ কমচারীদের সুবিধার জন্য, নয় একদিকে যা রদ হয়েছে, অন্যদিকে তাই অনুমোদন করা হত।

১৭ শতকের 'রাহাদারী' শুল্ক ব্যবসা বাণিজ্যেকে আরো দুর্বিসহ করে তুলেছিল। কারণ, এই সব শুল্ক নানা ধরনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রন করত । ফলে নানা ধরনের কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রন করত যাতায়তের পথঘাট, তারাই জোর করে এসব আদায় করত।[৪৭] প্রাকৃতিক দুর্যোগ দূর্ভিক্ষের সময় বাদশাহী ফরমানে মানুষের ভোগ্য সামগ্রীর উপর থেকে শুল্ক রেহাই দেয়ার কথা বিশেষভাবে বলা থাকলেও বাস্তবে ঘটত ভিন্ন ঘটনা। ব্যাবসায়ীরা বর্ধিত মূল্যে মুনাফা লুটত। ফলে প্রাপ্ত বর্ধিত মুনাফার একটা অংশ না পাওয়া পযর্ন্ত রাজকর্মচারীরা কর আদায়ের অছিলায় ব্যবসা দিত আটকিয়ে। ইরফান হাবিব মনে করেন যে,"মুঘল রাজত্বের শেষের দিকে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এধরনের তোলা আদায়ের ঘটনা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল'।[৪৮] সুতরাং, বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোতে ক্ষমতার বিচিত্র চর্চার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ভারতে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইরফান হাবিব দূরপাল্লার বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য যে সকল কারণের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে আইন শৃংখলা ও পরিবহন ব্যবস্থায় নিরাপত্তা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অভ্যন্তরীন বাণিজ্যে 'বনজার' শ্রেণী সব সময় সশস্ত্র থাকত। তাদের 'কাফেলা' সরাই, 'টান্ডা 'এবং সম্ভবত নদীগুলোতে ছোট ছোট জাহাজের বহর এমনভাবে সুসংগঠিত হয়ে থাকত যাতে তারা সর্বক্ষেত্রে রাহাজানীর মোকাবেলা করতে পারে। রাস্তা ঘাটের নিরাপত্তা ছিল প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ছিল এই যে,যদি কোন পদস্থ রাজকর্মচারীর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় কোন চুরি বা ডাকাতি ঘটে, তবে হয় তিনি সেই চোরাই মাল উদ্ধার করবেন নয়তো নিজে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবেন। এ ব্যবস্থার কুফল ছিল রাজকর্মচারীদের প্রতিহিংসা চরিতার্থে সাধারণ মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার নিত্য ঘটনায়।[৪৯]

এই সময় ব্যাংকিং ও হুন্ডি ব্যবস্থা অসাধারণ সুগঠিত ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও একটি সংগঠিত বীমা ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল।

কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত এত বিশাল পরিসরে আলোচনা এক জটিল ও পর্যাপ্ত উপাত্ত নির্ভর কাজ। ইরফান হাবিব তাঁর আলোচনার পরিধির কথা বিবেচনা করে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এই বলে যে, "বাণিজ্যের উপর উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের প্রভাব যথাযথ বিচার করা সহজ নয়"।[৫০] এর পূর্বেই তিনি পণ্য দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির পার্থক্যের হার, মূল্য নিয়ন্ত্রনে প্রভাব বিস্তরকারী বিভিন্ন কাঠামো নিয়ে আলোচনার পরেই আমদানী ও রফতানী বনিজ্যের বিষয়ে ব্যাপক আলোকপাত করেছেন।

আন্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্য ছাড়াও রফতানী বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখার উপর তাঁদের প্রদত্ত মতামত ততটা প্রতিফলিত হয়নি, যতটা তিনি প্রাপ্ত তথ্য নথিপত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও লেখক মধ্য যুগীয় বাণিজ্য তত্ত্বের গোড়ার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অতএব তিনি বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ামক শক্তিগুলোর ভূমিকার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। এটাও কম কথা নয়, কারণ কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কিত বাণিজ্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন ইউরোপীয় বাণিজ্যের গতি প্রকৃতির সাথে দেশীয় বাণিজ্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো মোটা দাগে চিহ্নিত করে পরবর্তি কালের পাঠক গবেষকদের চিন্তা ভাবনার পথ বহুদূর বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছেন।

আঞ্চলিক বাণিজ্যে 'চাষী ও বাজার' এই শিরোনামে তিনি বাজার ও 'দাম' বা বাজার মূল্যের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছেন। তাঁর মতে "কৃষক সাধারণের কাছে আঞ্চলিক বাজারের গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে, তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা চলত না"।[৫১] আর আঞ্চলিক বাণিজ্য বলতে সাধারণভাবে গ্রাম -শহরের বাণিজ্যই বোঝাত।

মুঘল ভারতে নগরের বিকাশ ও নগরকেন্দ্রীক জীবনের বিশালতা তুলে ধরতে গিয়ে ইরফান হাবিব ভারতের বিখ্যাত শহর ও তাদের জনসংখ্যার বিবরণ দিয়েছেন। মুঘল ভারতীয় শহরগুলোর জনসংখ্যার বিশালত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে,"দেশের শহরবাসী মোট জনসংখ্যার মধ্যকার অনুপাত অনেক বেশী থাকা সত্ত্বেও ইদানীংকাল ছাড়া এই অনুপাত ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা"।[৫২] গ্রাম ও শহরগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে,"শহরগুলো খাদ্য ও হস্তশিল্পের কাঁচামালের জন্য পুরোপুরি গ্রামের উপর নির্ভর করত।" অথচ শহরে শিল্পের উপর গ্রামগুলোর নির্ভরশীলতার সপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। শহরকেন্দ্রীক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য শহরের ভোগ বিলাসেই নিয়োজিত হত। এই সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাসত্ত্বেও শহরের বিরাট জন্যসংখ্যার খাদ্যসহ ভোগ বিলাসের যোগান দিতে মোট কৃষি উৎপাদনের একটা বড় অংশই চলে যেত। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামীন উৎপাদনে বাজারের টানছিল অনিবার্য ।[৫৩] ইরফান হাবিবের উল্লিখিত আলোচনার আলোকে এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠার একটা সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। গ্রামীন সমাজঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা' শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ে গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থার এই দিকটা নিয়ে বেশ জুরালো আলোচনা করার সুযোগ থাকায় এ পর্যায়ে আর আলোচনা না করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

ইরফান হাবিব কৃষি পণ্যের বাণিজ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে,"কৃষি উৎপাদনের একটা বড় অংশই বাজারে পৌছত। কাজেই বাজারের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবতই অনুসন্ধান যোগ্য"।[৫৪] কারণ,নগদ অর্থে রাজস্ব নির্ধারণ ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে চাষীকে বাজারে দ্বারস্থ হতে হত। এ পর্যায়ে কৃষিজ উৎপাদন বাজার জাতকরণের সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন দালাল, মধ্য স্বত্বভোগী ও স্থানীয় বণিক দল গড়ে উঠে। পণ্যের মূল্য নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থায় কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লেখক কৃষকের অসহায়তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। যেমন ভাগচাষীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, "যেমন ভাগ চাষী খোলা বাজার অবধি পৌঁছতেই পারত না, কারণ চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁরা দালালদের কাছে মাল বেঁচতে বাধ্য হত। এক্ষেত্রে চাষীদের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও খাজনার জন্য নগদ টাকা এবং বেঁচে থাকার জরুরী তাগিদে তারা ফসল উঠা মাত্র বিক্রি করতে বাধ্য হত।" [৫৫] আবার একচেটিয়া কারবারের ফলেও চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। যদিও সরকারী অনুমোদন ছিল না। তা সত্ত্বেও ভারতের সর্বত্র। অবৈধ একচেটিয়া কারবার বেশ জোরে সোরেই চলত বলে হাবিব মনে করেন, তবে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি কৃষক সচেতনতা বোঝার চেষ্টা করেছেন। যেমন ১৬৩৩ সালে বাদশাহী মদদেও মজুরী পেয়ে সারা সাম্রাজ্যে জুড়ে একচোটিয়া নীল ব্যবসার পত্তন হয়। তিন বছর অবধি এটি চালু থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুবছরের মধ্যেই তা পরিত্যক্ত হয় বোধহয় একারণে যে, অনেক চাষী (যারা সাধারণভাবে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও দুদার্ন্ত লোক) প্রতিবাদস্বরূপ তাঁদের যারাগাছ উপড়ে ফেলে ছিল।[৫৬]

কৃষিপণ্যের মূল্য, চাষীর পাওয়া বাজার দর ইত্যাদি বিষয়ে ইরফান হাবিবের বক্তব্য স্পষ্ট ও তথ্য উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত। তিনি কৃষি পণ্যের বাজার অর্থনীতি বিকাশের বিভিন্ন প্রবনতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যদিও চাষীর ঋণগ্রস্ততা, নানা ধরনের তোলা, বাজার অনাচার এবং একচেটিয়া কারবার চাপানোর ফলে বাজার দাম ও চাষীর প্রাপ্যের মধ্যে ফারাক বাড়াতে সাহায্যে করেছে, তা সত্ত্বেও চাষবাসের কাজ বাজারের চাহিদার উপর ঘনিষ্ঠভাবে এমনকি নিরুপায় হয়ে নির্ভর করত। সুতরাং কৃষি উৎপাদনে পণ্য নির্বাচনে চাষীদের সচেতনতা বৃদ্ধ পাচ্ছিল বলে ইরফান হাবিব ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে, "বাজার দর ও চাষীর প্রাপ্যের মধ্যে প্রার্থক্যের মাত্রা বেশী হলে ব্যবসায়ীরা সরাসরি চাষীর কাছে থেকে মাল কিনত। এক্ষেত্রে চাষীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিত।" এই সময় চাষাবাদের ক্ষেত্রে একটি বড় মৌলিক পরিবর্তনের প্রতি ইরফান হাবিব পাঠকের সৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। তিনি বলেন, "সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রি হবে এমন যেকোন চাষের কাজে চাষীদের তৈরী থাকার সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য দৃষ্টান্ত হল তামাক চাষের প্রসার।" [৫৭] এ ব্যাপারে পরবর্তি অধ্যায়ে গ্রামীন সমাজের কৃষি উৎপাদনের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আরো কিছু মূল্যবান তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। চাষীরা বাজারের চাহিদার উপর ভিত্তি করে দাম বাড়িয়ে দেয়ার মত বিচক্ষনতার পরিচয় দিত। অন্যদিকে তিনিই মন্তব্য করেছেন যে, চাষবাসের কাজ বাজারের চাহিদার উপর ঘনিষ্ঠভাবে, এমনকি নিরুপায় হয়ে নির্ভর করত। ইরফান হাবিব বাজারের সাথে তাল রাখার ব্যাপারে চাষীদের সাধারণ প্রবনতার বিষয়ে মোরল্যান্ড ও সুজান রায়ের মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন যে, "চাষীরা সত্যিই বাজারের ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারছে।"

কৃষি পণ্যের দামের উঠানামা নিয়ে ইরফান হাবিব যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা অনেকটা পর্যায়ক্রমে চলে এসেছে। হলেও বর্তমান আলোচনার আওতায় পড়েনা। কারণ পণ্য মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে হলে এই পর্বের মূল্যবান ধাতুগুলোর আপেক্ষিক পণ্য থেকে এই মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটি বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্য লেখক পরিশিষ্ট (গ) তে রূপার টাকার ক্রটি ছিল মুঘল মুদ্রা ব্যবস্থার মনিস্বরূপ) অংকে সোনা এবং তামার দামের বিশ্লেষন দিয়ে মুদ্রা মুল্যমানের তারতম্যের ভিত্তিতে পন্য মুল্যের বাস্তব অবস্থা অনুধাবণের চেষ্ঠা করেছেন। কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যের আলোচনায় তিনি গ্রাম ও শহরে মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক গভীর সূত্র আবিস্কার করেছেন। তিনি মনে করেন"শহরগুলো গ্রামের উৎপন্নের এক বিরাট অংশ গ্রহন করত। বলা যায়, শহরগুলো খাদ্যসহ প্রাত্যহিক কৃষিজ পণ্যের জন্য গ্রামের উপর নির্ভর করত। পণ্যের বিনিময়ে গ্রামে শহরেই নিয়ে আসত।"

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে তিনি দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথমতঃ সামন্ততান্ত্রিক মুঘল ভারতে যে দ্রুত নগরায়ন শহরকে সামন্ত প্রভু তথা ভোক্তা শ্রেণীর আবাসস্থলে পরিণত করেছিল। দ্বিতীয়তঃভূমি রাজস্ব বাবদ প্রাপ্য অর্থের একটি নগন্য অংশ ব্যতিত পুরোটাই শহরে চলে আসত। তিনি গ্রাম ও শহরের মধ্যকার আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যের সঙ্গে ভূমি রাজস্বের সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে,"কৃষিপণ্যের মূল্য বেড়ে গেলে শহরে উৎপন্ন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা যেত বলেই একমাত্র পথ ছিল ভুমি রাজস্ব দাবী বাড়িয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা।" সুতরাং লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী বাজার অর্থনীতি কৃষকের ভাগ্যের উন্নতির সহায়ক ছিলনা। কারণ উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপর সর্বদাই ভাগ বসাত বাড়তি রাজস্ব দাবী। এই কারণেই বাজারের গতি প্রকৃতি বোঝা সত্ত্বেও কৃষক সম্ভাব্য আর্থিক প্রাপ্য থেকে সবর্দা বঞ্চিত হত।

ইরফান হাবিবের এই বক্তব্যের মাঝে তৎকালীন কৃষিজ সমাজের প্রকৃত চিত্র বিদ্যমান থাকলেও তা এত সরলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিনা তা একটি প্রশ্ন। তাঁর এইরূপ মতামতে বেশ সারল্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তিনি তাঁর গ্রন্থের পরবর্তি অধ্যায় গুলোতে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী 'জমিনদার' জায়গীরদার মনসবদার ইত্যাদির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট কতটুকু তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন তা পরবর্তি আলোচনায় ফুটে উঠবে।

এই অংশে লেখক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে 'কৃষকদের জীবনের বাস্তব অবস্থা' এই শিরোনামে কৃষিজীবিদের জীবন যাত্রার মান ও অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন। ইরফান হাবিবের গবেষণার পূর্বে ভারতীয় কৃষকদের করুণ জীবন কাহিনী সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে এভাবে কেউ তুলে ধরেন নি। যদিও বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিক কৃষি জীবন বিভিন্ন গবেষকের আলোচনায় উঠে এসেছে। ইরফান হাবিবের পূর্বে কে. এম আশরাফ তাঁর গবেষণাকর্মে কৃষকদের জীবনের যে চিত্র অংকন করেছিলেন তা ছিল একটি রেখাচিত্র, ফলে সেখানে আলোচনার গভীরতা ছিলনা। যদিও তা ছিল প্রাথমিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আলোচনার এই অংশে ইরফান হাবিব উৎপাদক শ্রেণী কৃষকদের জীবন-যাপন প্রনালী, জীবনযাত্রার মান, খাদ্য, পোষাক বাসস্থান, চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে যে চিত্র অংকন করেছেন তা এতটাই জীবন্ত যে, আজও গ্রাম বাংলার সবর্ত্রই তাঁর ধারা বিদ্যমান। তিনি নিজেও আলোচনার কোন কোন অংশে বর্তমান চিত্রের সঙ্গে মুঘল ভারতের কৃষকদের জীবনচিত্রের সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন।

প্রথমেই তিনি কৃষকদের খাদ্যের বিবরণ বা খাদ্য তালিকা উপস্থিত করেছেন। তারপর পোষাকের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আর তা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, তার আলোকে তৎকালীন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার একটি অংশের (কৃষক বা মূল উৎপাদন শ্রেণী) শ্রেণী চরিত্রের রকমফের, অনুরাগ, ইত্যাদি বিষয়ে জুরালো ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে তিনি কৃষকদের বাসস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। বাসস্থান নির্মান উপকরণ, গৃহের আকৃতি ও অবস্থান ইত্যাদি বিষয় কৃষি জীবনের নির্মম বাস্তবতা তাই ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিবরণে কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা প্রণালী, উপকরণ, আসবাবপত্র, ভেজষপত্র ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে তথ্যনিষ্ট অনুসন্ধিৎযু দৃষ্টিতে যে চিত্র অংকন করেছেন তাতে গোটা মুঘল সমাজ ও অর্থনীতিতে তাদের সত্যিকার অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। যেমন, দক্ষিণ ভারতে সাধারণ লোকের থালা ছিল একটি পাত বা ছোট একটি তামার থালা। এতে গোটা পরিবারই খেত। তাছাড়াও মেয়েরা অতি সাধারণ (তামা, কাঁচ, শাখা) অলংকার ব্যবহার করত বলে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

আচার অনুষ্ঠান, পূঁজা পার্বন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করার অর্থ হল লেখক এই প্রসঙ্গে চাষীদের জীবন যাত্রার মান ও গোটা জীবন প্রনালীকে সমাজ নিরীখে বিচার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেছেন। [৫৮]

এর পরেই তিনি তাঁর রচনার ১০৭ পৃষ্ঠা থেকে ১১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দুভির্ক্ষের কারণ প্রকৃতি, বিভিন্ন সময় এর প্রতিকারে গৃহিত সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নির্ভর আলোচনা করেছেন। দুভির্ক্ষের ফলাফল তুলে ধরেছেন। তবে তিনি ফলশ্রুতিতে ঘটে যাওয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর পাঠকের সৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ প্রতিটি অনটনের সময় ক্রীতদাসের বাজার খুব তেজী হয়ে উঠত। দ্বিতীয়তঃ কৃষি কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্বেষনে চাষীরা বাড়ীঘর ছেড়ে কাজের খোঁজে দূর দূরান্তে চলে যেত। এখানে লেখক মধ্যযুগীয় ভারতীয় কৃষকের ভিটে বাড়ী ছাড়ার বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলে মনে করেন। এর ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদনে নিরন্তন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তীব্র সঞ্চালনশীলতার প্রশ্নে বিভ্রান্তি এসে যায় বলে তিনি মনে করেন।

কৃষক ও কৃষি জীবনের এই বাস্তব অবস্থাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের গ্রাম-সমাজ ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে উৎপাদক শক্তির সাথে অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশ

1. Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India*, (1556-1707), First edi. 1963, p. 3
2. *Ibid*, p. 4
3. *Ibid* ,p. 5
4. *Ibid*, p. 5
5. *Ibid*, p. 5
6. *Ibid*, p. 6
7. *Ibid*, pp. 7-13
8. *Ibid*, pp. 10-28
9. *Ibid*, p. 20
10. *Ibid*, p. 21
11. *Ibid*, p. 22
12. *Ibid*, p. 23
13. *Ib,id* p. 23
14. *Ibid*, p. 24
15. *Ibid*, p. 26
16. *Ibid*, p. 27
17. *Ibid*, p. 33
18. *Ibid*, p. 37
19. Moreland, *India at the death of Akbar*, Dehhi, 1938, pp. 305-306
20. Irfan Habib, *op. cit.* p. ৩৯
21. *Idib*, p. 39

Dhaka University Institutional Repository

22. *Ibid*, p. 39
23. *Ibid*, p .40
24. *Ibid*, p. 40
25. *Ibid*, p. 40
26. *Ibid*, p. 47
27. *Ibid*, p. 48
28. *Ibid*, p. 50
29. *Ibid*, p. 50
30. *Ibid*, p. 45
31. *Ibid*, p. 49
32. *Ibid*, pp. 52
33. *Ibid*, p. 54-56
34. *Ibid*, p. 56
35. *Ibid*, p.
36. *Ibid*, p. 57
37. *Ibid*, p. 57
38. *Ibid*, p. 57
39. *Ibid*, p. 60
40. *Ibid*, p. 60
41. *Ibid*, p. 64
42. *Ibid*, p. 64
43. *Ibid*, p. 64
44. *Ibid*, p. 65
45. *Ibid*, p. 65
46. *Ibid*, p. 70
47. *Ibid*, p. 69
48. *Ibid*, p. 69
49. *Ibid*, p. 71
50. *Ibid*, p. 70
51. *Ibid*, p. 78
52. *Ibid*, p. 78
53. *Ibid*, p. 80
54. *Ibid*, p. 80
55. *Ibid*, p. 81
56. *Ibid*, p. 84
57. *Ibid*, p. 84
58. *Ibid*, pp. 92-107

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম সমাজঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা

"কৃষক ও জমি, গ্রাম সমাজ" এই শিরোনামে ইরফান হাবিব চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি জমির মালিকানার প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য জমির মালিকানার প্রশ্নটি বিতর্কীত। এই বিতর্কে ইউরোপীয় পর্যটকদের মতামত হল জমির মালিকানা স্বত্ব রাজার। ইরফান হাবিব মনে করেন ইউরোপীয় সাক্ষ্যগুলো এই মতামতকেই সমর্থন করে গিয়েছে এবং তা এক বাক্যে।

ইউরোপীয় লেখকদের এইরূপ মতবাদের কারণ খুঁজতে গিয়ে ইরফান হাবিব বলেন যে,"প্রথমতঃ ইউরোপীয় লেখকদের ভারতীয় জীবন ও সমাজ বাস্তবতা সর্ম্পকে ভাসা-ভাসা জ্ঞান ছিল দ্বিতীয়তঃ মুঘল জায়গীরদার বা ইউরোপীয় জমিদার-অভিজাতদের স্বাভাবিক প্রতিকল্প, ইউরোপীয়দের চোখে নিশ্চয় এমন মনে হয়েছে।"

বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক জায়গীর বরাদ্দ ও প্রত্যাহার ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থার সাথে এই সকল ইউরোপীয়রা বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন না। ফলে তাঁদের মনে হয়েছিল মুঘল বাদশা অভিজাতদের স্বাভাবিক মালিকানা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করে নিজেই তা দখল করেছেন। ইরফান হাবিব মনে করেন, এইরূপ ভুল করা ইউরোপীয় লেখকদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ দেশের এক বিরাট অংশ জুড়ে যে তথাকথিত "রায়তী'বা চাষীদের দখলে থাকা গ্রামগুলো ছিল ইউরোপীয় পর্যটকরা সেখানে দুটি মাত্র শ্রেণীকে খুঁজে পেয়েছেন, যাদের মধ্যে জমির উৎপন্ন ভাগ-বাটোয়ারা হয়। একটি চাষীশ্রেণী ও অপরটি বাদশাহ ও তাঁর জায়গীরদার বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁরা কখনোই চাষীদের মালিক বলে ভাবতে পারেননি। তাই শুধু বাদশাহ তাঁদের কাছে এই স্বত্বের অধিকারী বলে মনে হয়েছিল। এইভাবে তিনি ইউরোপীয় লেখকদের অজ্ঞতা ও পূর্ব ধারণার ধুম্রজালে তাঁদের বিভ্রান্তি আবিস্কার করেছেন। ইউরোপীয় লেখকদের চিন্তায় তিনি তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার দিকটি যেকোন কারণেই হউক না কেন তুলে ধরেননি। ইরফান হাবিবের আলোচনার এই ঘাটতি পূরণ করা জরুরী, কারণ, তা না হলে মুঘল কৃষি-ব্যবস্থার প্রাণশক্তি গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে সত্যিকার পরিচয় তুলে ধরা যাবেনা, তেমনি পরবর্তি ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসন নীতি নির্ধারণের গতি-প্রকৃতিও থেকে যাবে অন্ধকারে। ইউরোপীয় চিন্তধারার (চাষীরা যে জমির মালিক হতে পারেনা) বাস্তব ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে ইরফান হাবিব ভূমির মালিকানা প্রশ্নে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থান অন্বেষন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী গবেষক পি-শরণের মতামতের (জমির আসল মালিক চাষীরাই) ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক তথ্য ও উপাত্তের পুংখানুপুঙখ বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, সার্বজনীন একক কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়নি। কেননা, ভারতীয় পরিবেশে বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থায় ছিল বৈচিত্র্যের সমাহার। স্বাভাবিক কারণেই তিনি কখনো ইতিবাচক দৃষ্টিতে কৃষকের মালিকানা স্বত্বকে বিবেচনা করেছেন, আবার কখনো নেতিবাচক দৃষ্টিতে কৃষকের সত্যিকার অবস্থান বিচার করেছেন। লেখকের বক্তব্য হল, ইতিবাচকভাবে দেখলে চাষী যে জমির চাষ করে সেই জমির উপর তার স্থায়ী ও বংশগত দখলী স্বত্বের ব্যাপারে একটা সাধারণ স্বীকৃতি ছিল। এই ক্ষেত্রে তিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের জন্য ব্যাপক তথ্য, উপাত্ত ও নথিপত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আধুনিক মালিকানা স্বত্বের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছেন। যার গুরূত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মালিকের ইচ্ছামত জমি ছেড়ে চলে যাওয়া বা বিক্রি করা। পরিমাপের এই মাপকাটিতে মুঘল আমলের কৃষকদের মালিকানার প্রশ্নটি বিচার করতে গিয়ে তিনি হতাশ হয়েছেন। কারণ, চাষীরা ইচ্ছা করলেই জমি ছেড়ে চলে যেতে পারতনা বা

Dhaka University Institutional Repository

যথেচ্ছা জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারতনা। কিন্তু আমরা এই দৃষ্টান্তও খুঁজে পাচ্ছি যেখানে বাদশাহী প্রশাসন চাষীদের ভুমি ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এর পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছিল, তা হল চাষাবাদ অব্যাহত রাখা। কেননা, ভূমি রাজস্ব নির্ভরশীল সামরিক শক্তিনির্ভর সাম্রাজ্যের মূল শক্তিই ছিল চাষী, যারা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জ্বালানী সরবরাহ করত। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে।

তবে, ইরফান হাবিব অনেকটা অস্পষ্টভাবে জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন এই বলে যে, "মুঘল আমলে চাষীরা যে অধিকার ভোগ করত, ব্রিটিশ ভারতে শুধু কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ প্রজাস্বত্বের আইনের দরুন চাষীদের কিছু অংশ "চিরস্থায়ী বা বংশানুক্রমিক দখল স্বত্ব" অধিকার পেয়েছিল।[১] কিন্তু লেখকের এই স্বীকৃতি শর্তাধীন। সেই কারণে পরক্ষণেই তিনি বলেছেন যে,"কোন কোন ক্ষেত্রে এই অধিকারকে এক ধরনের মালিকানা স্বত্ব বলে ধরা যায় বটে, তবে মালিক হবে স্বাধীন ও তারই হাতে থাকবে ইচ্ছামত জমি হাত বদলের অধিকার। আর চাষী যেহেতু আইনগতভাবে কোন জমিই কোন কারণে ছেড়ে দিতে পারতনা, তাই আসলে সে ছিল 'ভূমি দাসে'র সামিল।[২] কিন্তু ইরফান হাবিবের এই বক্তব্যে সরলীকরণের ছাপ সুস্পষ্ট। কেননা, ভূমিদাস ব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়নি, তবে লেখকের চিন্তাধারাকে চরমত্বের দোষ থেকে এই বক্তব্যের জন্য সহনশীল বলে বিবেচনা করা যায় যে, "তাঁরা ছিল ভূমিদাসের সামিল"। এখানে তিনি ভারতীয় কৃষকদের সঙ্গে ভূমিদাসদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, তাদের (ভারতীয় কৃষকদের) বাস্তব অবস্থা যাই থাকুকনা কেন, ভূমির মালিকানা প্রশ্নে ইরফান হাবিবের সিদ্ধান্ত হল, "জমির প্রকৃত মালিকানা না ছিল রাজার, না ছিল চাষীর। অথ্যাৎ, 'রায়তী' এলাকায় অন্তত জমির কোন মালিকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জমি ও ফসলের উপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু সম্পত্তির নিরংকুশ অধিকার বলতে কিছু ছিল না।" ইরফান হাবিব আলোচনার এই পরিধি শুধু 'রায়তী' এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। 'জমিনদারী' এলাকার চিত্র ছিল ভিন্ন। আবার জমিনদাররা ছিল মধ্যস্বত্ব ভোগী স্বত্ববান শ্রেণী। তাঁদের মধ্যেও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ ও স্বত্বভোগে বৈচিত্র বিদ্যমান ছিল। আবার এই শ্রেণীটি ছিল মুঘল প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সহিত জড়িত সামন্তশ্রেণী, ভোক্তাশ্রেণী হলেও তাঁদের সাথে জমি ও কৃষকের নাড়ীর সম্পর্ক থাকায় এই শ্রেণীটি মুঘল কৃষি ব্যবস্থায় বিশেষ অভিধায় অভিষিক্ত। স্বাভাবিক কারণেই একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অধ্যায়ে এই শ্রেণীটি নিয়ে আলোচনা করা হল।

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন সূত্র এসে গ্রথিত হয়েছে একটি বিন্দুতে, আর তাহল ' গ্রাম-সমাজ'। শুধুমাত্র ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিই নয়, ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, সাম্রাজ্যের আর্থিক ভিত এবং এর স্থায়ীত্ব, অবক্ষয়, প্রশাসনিক কর্মকান্ড ইত্যাদি প্রশ্নে 'গ্রাম-সমাজের অবস্থানটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবিক কারণেই ইরফান হাবিব মুঘল কৃষি ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু গ্রাম-সমাজের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করার পূর্বেই জমির মালিকানার প্রশ্নটির মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। কারণ, জমির মালিকানার প্রশ্নটির সঙ্গে গ্রামীন-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকান্ড, অবস্থান ও অবস্থার বাস্তব চিত্র জড়িয়ে রয়েছে।

বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ইরফান হাবিব গ্রামীন কৃষিজপণ্য নির্ভর শহরে জীবন ও রাজস্বভারে ন্যুব্জ গ্রামীন জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরেছেন। এই পর্যায়ে গ্রামীন সমাজের আলোচনার সূত্র ধরেই তিনি বলেন, "গ্রামের উৎপন্ন জিনিসের একটা বড় অংশ শহরের বাজারে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু গ্রামগুলো তার বিনিময়ে শহর থেকে প্রায় কিছুই পেতনা। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে হত নিজের ভিতর থেকেই। অতএব, সেখানে পাশাপাশি বিরাজ করত মুদ্রা-অর্থনীতি ও স্বয়ংম্ভরতা। পরস্পর বিরোধী এই দুটি

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক উপাদানের অস্তিত্বের দরুনই বোধ হয় এই সামাজিক দ্বন্দ্ব, যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল একদিকে কৃষিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন রীতির অস্তিত্বে, অন্যদিকে গ্রাম সমাজ গঠনে।"

সুতরাং, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে গ্রামীন সমাজের অবস্থান লেখক প্রথমেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। পদে পদে বাদশাহী প্রশাসনের সঙ্গে গ্রামীন-সমাজের প্রথম ও চূড়ান্ত সম্পর্ক অর্থাৎ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছেন। ভূমি রাজস্ব প্রদানে কৃষকের ব্যক্তিগত দায় ও সমষ্টিক দায়ের (গ্রাম-সমাজ) প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি গভীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

তিনি মনে করেন সরকারী দলিলপত্রে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে চাষীদের প্রত্যেকের উপর আলাদা আলাদা করে রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। এটি শুধু কাগজ কলমেই মানা হলেও ইরফান হাবিব ব্যক্তিগত কৃষি ব্যবস্থার ধারণাটি অর্ন্তনিহিত ছিল বলে মনে করেন। কেননা, জমিতে চাষীর অধিকার সমবেতভাবে ছিল-তথ্য সূত্রে বিন্দু মাত্র তার আভাসও নেই বলে ইরফান হাবিব মনে করেন। কাজেই এই জটিল বিষয়টি গ্রামীন-সমাজের আলোচনায় অন্যতম অংশে পরিণত হতে পারে। এবার পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। শ্রেণী-বিভক্ত গ্রামীন-সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইরফান হাবিব সম্পদের মূল্য অনুযায়ী গ্রামীন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন, 'জমিনদার', 'মহাজন' ও 'শস্য ব্যবসায়ী'দের এক ছোট গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রথম শ্রেণী। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল 'ধনী' চাষীরা, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণী। ইরফান হাবিব একটি বাদশাহী ফরমানের ভিত্তিতে গ্রামীন নিঃস্ব সর্বহারা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করেছেন এইভাবে "ছোট চাষীরা" তারা চাষাবাদ নিযুক্ত আছে কিন্তু (চাষ করার) ক্ষমতা, বীজ ও গবাদিপশুর জন্য পুরোপরি ঋণের উপর নির্ভরশীল, তাদের নিঃস্ব শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হবে।" তিনি মনে করেন, শেষের এই শ্রেণীর মধ্যে আগে গরীব চাষী ছিল, এই ক্ষেত্রে উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে ইরফান হাবিব গ্রামীন সমাজের শ্রেণী বিন্যাস, শ্রেণী চরিত্র, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন শ্রেণীর উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মুল্যবান, নব তথ্যালোকে নতুন ও অভিনব। কিন্তু পরবর্তীকালের বিভিন্ন ব্যক্তির গবেষণায় বহু নতুন তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গির নব প্রয়োগ লক্ষ্য করা গিয়েছে, চিন্তার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও ইরফান হাবিবের এই আলোচনা মৌলিক ও ভিত্তিভূমি। সুতরাং, পরবর্তী আলোচনায় ইরফান হাবিবের গবেষণায় প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে অন্যান্য পন্ডিত ও গবেষণাকর্মের তুলনার ভিত্তিতে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

ইরফান হাবিব গ্রামীন সমাজের উৎপত্তির উৎস মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেন যে,"উৎপাদনের বাইরে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ছিল যেখানে গ্রামের চাষীরা প্রায় যৌথভাবে কাজ করত"। এরা ছিল সাধারণত একই 'ভাইয়াচারার' লোক। আর এই যৌথভাবে কাজ করার জন্য তারা যে মিলিত সংস্থা গড়ে তুলেছিল আমরা তারই নাম দিয়েছি 'গ্রাম-সমাজ'। কাজেই যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রাম-সমাজ নির্মাণে বড় নিয়ামক শক্তি। কিন্তু গ্রাম সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। যেমন, 'জাতের সংহতি', শ্রম-বিভাগ, 'কওম' বা গোষ্ঠীচেতনা।

ইরফান হাবিব বলেন, "গ্রামের চাষীরা শুধু যে একই জাতের হত তা না, ঐ জাতে একই বিভাগ বা উপবিভাগ নিয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে উঠত। তাদের চেতনায় কাজ করত তাদের পূর্ব পুরুষ একই, এবং তারা একই 'ভাইয়াচারা" বা ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত। রক্তের সম্পর্কে গড়ে উঠা এই 'ভাইয়াচারা' চাষীদের অনেক দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখত।" তিনি মনে করেন গ্রাম-সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল যে, রাষ্ট্রশক্তিকে মোকাবেলা করতে চাষীদের জোট বাঁধতেই

Dhaka University Institutional Repository

হত। তবে, বাদশাহী প্রশাসন ও গ্রাম সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্কের ভিত্তিমূলে কাজ করছিল রাজস্ব ব্যবস্থা। ইরফান হাবিব মুঘল ভারতে গ্রাম-সমাজ টিকে থাকার বা টিকিয়ে রাখার মূল দর্শন আবিস্কার করেছেন গ্রামীন সমাজভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনায়। তিনি বলেন যে,"গ্রামগুলোতে চাষীরা সকলেই বিশ্বস্ত ও যৌথভাবে রাজস্ব জমা দেয় অথবা কর্তৃপক্ষের বিরোধীতার জন্য সবাই মিলে জোট বাঁধে।" এখানে তিনি যৌথভাবে প্রতিনিধির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের বাস্তবতা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্রের ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করেছেন।

পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছেন এই বলে যে, "সব গ্রাম-সমাজেই কঠোরভাবে একই নিয়ম বা একই নীতি অনুযায়ী চলত না। প্রত্যেক গ্রামের চাষীরা একটি গ্রাম-সমাজে সংগঠিত ছিল, এমন ধরে নেওয়া উচিত নয়।" চাষীদের এই ধরনের গ্রাম-সমাজ গড়ে উঠার পিছনে নির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল।

ইরফান হাবিব গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষন করে এর দৃঢ় বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এক সময় ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, বাংলা সংস্করণের ভূমিকাতেই তাঁর বক্তব্যের দুর্বলতা স্বীকার করে তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। প্রথমে তিনি পণ্য উৎপাদন ও বাজারের জন্য উৎপাদন কৃষকের মধ্যে অর্থনৈতিক স্তর ভেদের সৃষ্টি করেছে বলে মনে করেন। এর ফলে চাষীদের ধনী অংশ ও বাদ বাকীদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাত বা "ভাইয়াচারা" বাঁধন আলগা হতে বাধ্য। তিনি আশা করেছিলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের বিত্তবান সদস্যদের হাতে সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে গ্রাম-সমাজ হয়ত কিছু দিন বাদে সম্পূর্ণভাবেই হারিয়ে যেত। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত চিন্তার আলোকে বলেন যে, "গ্রাম সমাজের চেহারাটা যতদূর ধরা যায় তাতে এটি ছিল গ্রামের বড় লোকদের ছোট ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী মারফত গ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রতিষ্ঠান (তার উৎপত্তিও হয়েছিল হয়তো এই ভাবেই)।" "গ্রাম-সমাজ তাই ততদিন বাঁচতে পারত, যতদিন কেবল মাত্র উদ্বৃত্তকেই পণ্যে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। অন্যান্য অধিকার ও উপরি লাভের সঙ্গে সঙ্গে অসম করবন্টণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রাম-সমাজই ছিল গ্রামের উপরতলার লোকদের অর্থনীতি বহিভূত বাধ্যবাধকতার কৌশল।" তাই বলে কোন স্বায়ত্ব-শাসিত একক ছিল না গ্রাম-সমাজ, এটি ছিল কর আদায়ের সংগঠনেরই প্রয়োজনীয় অংশ, যার ফলে গ্রামের উপর তলার লোকেরা হয়ে উঠেছিল বলতে গেলে প্রধান শোষক শ্রেণীগুলোর দালাল। কাজেই, চাষীদের বংশানুক্রমিক শ্রম বিভাগ ও জাতের সংহতি গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বয়ং সম্পূর্ণতাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার যৌক্তিকতার প্রশ্নটি আর থাকল না। তবে,"নিদিষ্ট সংরক্ষিত শ্রমবাহিনী তৈরী করতেই জাতিভেদ প্রথা কাজ করে গেছে অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে" লেখকের এই মন্তব্য এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীন সমাজের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণে তিনি গ্রামের উপর তলার সুবিধাভোগী শ্রেণীর পরিচয় তুলে ধরেছেন এইভাবে যে,"এই সব শোষিতশ্রেণীর নিম্নস্তর ও স্থানীয় অংশ তৈরী হয়েছিল জমিনদারদের নিয়ে।"গ্রামীন সুবিধাভোগী বা গ্রামের উপর তলার শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, বহুমূখী কর্মকান্ডে উৎপাদক ও শোষকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'জমিনদার'শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ে। স্বাভাবিক কারণেই এখানে এর আলোচনা খুব সংগত হবে বলে মনে হয়নি।

উল্লিখিত তথ্যের বাইরে ইরফান হাবিব আরও একটি বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আর্কষন করেছেন যে,"অর্থনৈতিক কারণে গ্রামের স্বয়ং সম্পূর্ণত'র প্রয়োজন ছিল," ফলে প্রতিটি গ্রামে কয়েকটি প্রাথমিক ধরনের হাতের কাজের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। যেমন, কামারের কাজ,কুমারের কাজ, ছুতোরের কাজ, তাঁতী, ধানুক ইত্যাদি পেশাজীবির উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। পেশাগুলো আবার আলাদা আলাদা জাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং এক একটি গ্রামে তাদের একটির বেশী পরিবার থাকত না বলে লেখক অনুমান করেছেন। বৃত্তির পার্থক্যের এই ব্যবস্থাটি

Dhaka University Institutional Repository

জাতিভেদ প্রথার ফলে সংহতরূপ পেয়েছিল এবং একবার এই ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি গ্রাম অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বতন্দ্র এককে পরিণত হল, ফলে প্রতিটি গ্রাম হয়েউঠল এমন এক সমাজ যেখানে লোকসংখ্যা বাড়লে একই ধরনের আরেকটি সমাজের জন্ম দিতে পারত। সার্বিকভাবে গ্রামীন সমাজ সম্পর্কে ইরফান হাবিবের মতামত ছিল এইরূপ, যা বর্ণনা করা হল।

কিন্তু ইরফান হাবিব (কৃষক ও জমি, গ্রাম-সমাজ) শিরোনামে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাঁর সাথে লেখকের আলোচনার ধারাবাহিক সংগতি থাকলেও আলোচনা কোন নির্দিষ্ট গভীর স্তরে পৌছায়নি। জমির মালিকানা প্রশ্নে তিনি ইউরোপীয় লেখকদের সাথে ভিন্নমত পোষন করেছেন সত্যি, কিন্তু তিনি গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় চিন্তার প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং তার ঐতিহাসিক মূলের দিকটি তেমন জোরালোভাবে বিবেচনায় আনেননি। আবার, কৃষক ও জমির পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে তিনি জমির মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতেই এই দুয়ের মধ্যকার সম্পর্কের সার্বিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষেত্রেও গ্রামীণ-সমাজে কৃষকের অবস্থা, অবস্থান ও শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণের চিন্তা না করে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব প্রশাসনের প্রয়োজনে গড়ে উঠা গ্রামীন সমাজের অবকাঠামো, বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, চেতনা, প্রাপ্ত সুবিধা, বর্ণ, স্বার্থ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয় গ্রাম-সমাজের সঠিক প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়নি। আবার বলা যায় যে, গ্রামীন সমাজের ব্যাপক স্তর বিন্যাসের পরেই কেবল মাত্র কৃষিজ সমাজের শক্তি কাঠামো, দূর্বলতা ও সফলতার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হতে পারে।

তবে এ কথাও সত্য যে, তিনি গ্রামীন সমাজের শ্রেণীর বিন্যাস ও শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণে সীমিতভাবে হলেও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যখন বলেন যে,"জাতিভেদ প্রথা চাষী ও ক্ষেতমুজুরের মধ্যে যে বংশানুক্রমিক পার্থক্য তৈরী করেছিল তা থেকে গ্রামীন সমাজে শ্রেণীগত প্রভেদের পরিমাণ কিছুটা বুঝা যায়।" এছাড়া তিনি গ্রামীন পেশাদারী বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বর্ণ ব্যবস্থা ও নিঃস্ব নিম্ন শ্রেণীর কৃষকের কথা বলেছেন। কিন্তু এসবই ছিল গ্রামীন সমাজের একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। কৃষকের বিভিন্ন স্তর, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা, শ্রেণী-রূপান্তরে কৃষক, জাত-পাত ও গ্রাম-সমাজের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইরফান হাবিবের আলোচনায় একটি অসম্পূর্ণ খন্ডিত সুরছেঁড়া গ্রাম-সমাজের চিত্র দেখতে পাই।

স্বাভাবিক কারণেই "গ্রামীন-সমাজ" তত্ত্ব ও বাস্তবতা' এই শিরোনামে ইরফান হাবিবের প্রদত্ত তথ্য, তত্ত্ব ও চিন্তার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বিশিষ্ট পন্ডিতদের চিন্তার আলোকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

ভারতীয় অর্থনীতির গতি প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য তৎকালীন ভারতীয় গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজনে একই সাথে তৎকালীন বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রশাসন, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম-সমাজের উপরি কাঠামোর উদ্ভব ও বিকাশের সাথে এর অভ্যন্তরীন সঞ্চালিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক খুজেঁ পাওয়া যায়। ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই গ্রাম-সমাজ গড়ে উঠেছিল। স্মরনাতীত কাল থেকে গড়ে উঠা এই গ্রাম-সমাজ হঠাৎ করেই ব্রিটিশ আমলা ও পন্ডিতদের চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন ব্রিটিশ শাসকবর্গ গ্রামীন সমাজের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রথম মাথা ঘামাতে শুরু করেন? কেনই বা তাঁরা গ্রামীন সমাজকে আদর্শিক করে তুলেন? কেনই বা তাঁরা গ্রামীন সমাজকে তাঁর ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকুক এরূপ প্রয়াসী হন? ইত্যাদি প্রশ্নগুলো ব্রিটিশ শাসনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষনে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ[১] মেটকাফ, মেইন, এলফিস্টোন, মনরো, ফিলিপ, ফ্রান্সিস, জন শুর প্রমুখ বিশিষ্ট শাসকরা ভারতীয় গ্রামীন-সমাজের অস্তিত্বের কথা নিয়ে গুরুত্বসহকারে বিভিন্ন রির্পোট তৈরী করতে গিয়ে এর পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন।[২] গ্রাম-সমাজের প্রতি ব্রিটিশ আমলাদের এরূপ আগ্রহের পিছনে বিভিন্ন কারণ কার্যকর ছিল। বস্তুতঃ ইংরেজ কোম্পানী অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাজনীতিরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে প্রথমেই তৎকালে বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। ১৭৭২ খ্রী থেকে ১৮৩২ খ্রীঃ পযর্ন্ত ব্রিটিশরা এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি নিধার্রণে নিয়োজিত ছিল। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের অনুসৃত ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতির সপক্ষে মিত্র সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল।[৩] ফলে, মুঘল শাসনামলে ভূমির অধিকার সম্পর্কিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর দাবী ও প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণ করা, মুঘল সরকার ও বিভিন্ন শ্রেণীর রায়তের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়া তাঁদের জন্য পরিহার্য হয়ে পড়ে। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুরানো ব্যবস্থার সঙ্গে কত দূর আপোষ করবে এবং কতটা তাকে ভাঙ্গবে।[৪] বস্তুতঃ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে শুধুমাত্র ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নই জড়িত ছিলনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি কি হবে সে প্রশ্নও জড়িত ছিল। চার্টার অ্যাক্টগুলো ব্রিটেনে আলোচিত হওয়ার সময়ে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোম্পানী, মিশনারী প্রভৃতির ভূমিকা নিয়ে রীতিমত বির্তক হত। (এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান ব্যবস্থার গভীরতা উপলব্ধিতে যথেষ্ঠ সাহায্য করে)।

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ভীত অনুসন্ধান, হাজার বছর ধরে লালিত এদেশীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসন্ধানের পশ্চাতে ব্রিটিশ আমলাদের আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। শোষনের যাতাকলকে অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে হলে শোষন প্রক্রিয়ার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। তাই ভারতীয় সভ্যতার তলদেশে প্রবেশের জন্য ব্রিটিশ শাসকবর্গ আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের তাগিদেই সুচিত হয় প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চা।[৫]

গ্রাম সমাজের চরিত্র চিত্রন ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের নিজস্ব ধারণার সাথে ভারতীয় পরিবেশে বিদ্যমান বাস্তবতার সমন্বয় সাধন করেছেন। বস্তুতঃ ব্রিটিশ আমলারা ভারতীয় গ্রামীন-সমাজ বলতে কি বুঝিয়েছেন প্রথমে তা স্পষ্ট করা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসকবর্গের ধারণা হয়েছিল যে,"গ্রাম সমাজের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ভূমিতে যৌথ মালিকানা"[৬]

গ্রামীন-সমাজ হল সংগঠিত স্বয়ংক্রিয় এমন পরিবার গোষ্ঠী, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূমির উপর যৌথ মালিকানার অধিকারী।[৭] গোষ্ঠী বা জাতি সম্পর্ক গ্রাম-সমাজকে বেঁধে রাখত।[৮] দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল গ্রাম-সমাজের বিচ্ছিন্নতা। গ্রামীন-সমাজ হল ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র, যারা নিজেদের চাহিদা প্রায় সবটাই নিজেরাই মেটায়, বাইরের কোন প্রকার সর্ম্পক থেকে মুক্ত। এই সমাজ হলো স্থানু, যখন কোন কিছুই টেকেনা, তখনো তারা টিকে থাকে। একের পর এক রাজবংশের উত্থান পতন, ক্রমাগত বিদ্রোহ, কিন্তু এগুলোর কোনটাই গ্রামীন-সমাজকে স্পর্শ করেনা। কারণ, তখনো গ্রামীন-সমাজ একইভাবে থেকে যায়।[৯] এক্ষেত্রে 'গ্রাম্য পঞ্চয়েতের' অনড় উপস্থিতিকে মূল নিয়ামক শক্তি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। আর গ্রাম-সমাজ গঠনে যে ঐতিহাসিক সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হলো রক্তের সম্পর্ক বা গোষ্ঠী শাসন। কারণ, যেখানে একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত ব্যক্তি পঞ্চায়েতের বিকল্প হিসাবে বংশনুক্রমিকভাবে বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করে। আবার উনিশ শতকের 'ভাইচারা' জমি ব্যবস্থাকে গ্রাম্য-সমাজের অস্তিত্বের প্রমান বলে গ্রহন করা হয়। এই ব্যবস্থায় গ্রামের সমস্ত চাষযোগ্য জমি প্রথম বসবাসকারীদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হত।[১০] গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে ইরফান হাবিবের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে ইতিমধ্যেই গ্রাম-সমাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক অথচ প্রয়োজনীয় ধারণাগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

উপর আলোকপাত করা হয়েছে; গ্রাম-সমাজের ধারণা ঐতিহাসিক বিকাশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখন গ্রাম-সমাজের যথার্থ প্রকৃতি ও তার ঐতিহাসিক অবদান অনুসন্ধানের পূর্বে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে আনতে হয়, যাতে করে পদ্ধতিগত আলোচনা সম্ভব হয়।

আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র তাঁর মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও 'কৃষক-বিদ্রোহ' নামক গ্রন্থের 'ভারতীয় গ্রামীন সমাজঃ তত্ত্ব ও তথ্য' শিরোনামে আলোচিত প্রবন্ধে পাঁচটি পর্বভাগে বিভক্ত করেছেন।[১১] মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতিতে গ্রামীন অবস্থান ও অধিকার বিচার করা; বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করা, কৃষি অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক আলোচনা করে সমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্বের স্বরূপ আবিস্কার করা এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ বিকাশে গ্রামীন সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে উপনিবেশিক শাসনে ভারতের অর্থনীতির উন্নতি ও অবনতির চালচিত্র নিয়ে বহু পুরানো বির্তক লক্ষ্য করা যায়। কাজেই, এ বিষয়ে সুচিন্তিত ও বস্তুনিষ্ঠ মতামত পেশ করার প্রয়োজনেই আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে মার্কসের 'এশিয়াটিক সমাজের' মডেল নিয়ে বুদ্ধিজীবি মহলে যে বির্তক চলছে তা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে।

তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক আলোচনার পূর্বে এ পর্বে মুঘল ভারতে যে গ্রামীন-সমাজ অস্তিত্বশীল ছিল তার উৎপত্তি ও বিকাশের ঐতিহাসিক দিকটি তুলে ধরে এর স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। ইরফান হাবিব স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে,"চাষীদের পুরুষানুক্রমিক শ্রম বিভাগ ও জাতের সংহতি গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল গ্রামীন সমাজ"[১২] বস্তুতঃ ভারতীয় গ্রামগুলো গোষ্ঠী চেতনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এবং এর সংহতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা ছিল বর্ণ বিন্যাস। কারণ, গোষ্ঠীবদ্ধ পল্লী সমাজগুলো কোন জাতির স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশের সুস্পষ্ট একটি পর্বের চিহ্নমাত্র।[১৩] গ্রামের 'এজমালি' পতিত-জমি ও বনাঞ্চলের অবিভাজ্যতায় এবং দাবীদার শুন্য সম্পত্তির ভাগের বিধিমত নিয়ন্ত্রনে সামূহিক সামাজিক অধিকার লক্ষ্য করা যায়। কাজেই, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভারতীয় গ্রাম- সমাজ কোন বিশেষ জাতি বা দেশের উদ্ভাবন নয়,বরং তা সমাজ বিকাশেরই একটি স্বাভাবিক পর্যায় মাত্র।

এখন মুঘল পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত না করলে আলোচনার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যাবেনা। মুঘল কৃষি ভিত্তিক সমাজে ভূ-সম্পত্তি ও ভূ-স্বামীর পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল তা জানা প্রয়োজন। প্রশাসনিক তথ্যের সাহায্যে তা আমরা জানতে পারি। মুঘল রাজস্ব প্রশাসনের হিসাব-নিকাশে গ্রামগুলোকে যথাক্রমে 'আস্‌লি' ও 'দাখিলী' এবং 'রায়তী' ও 'তালুক' এই ভাগে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৪] 'খুলাসত-উস-সিয়াক' নামক ফারসী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এন, এ, সিদ্দিকী বলেন, "আস্‌লি বলা হত সেই গ্রামকে, যে গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামেই বসবাস করত আর 'দাখিলী' বলা হত সেই পরিত্যক্ত গ্রামকে যা কালক্রমে তার অস্তিত্ব বিলীন করে অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেত।" [১৫] সুতরাং, ভারতীয় গ্রামের গঠন ও ক্ষয়িষ্ণু রূপ এ তথ্যে পরিস্কার ফুটে উঠেছে। কারণ, ভারতীয় পরিবেশে গ্রামগুলো স্থায়ী ছিল এমন কথা বলা যাবে না। বিভিন্ন কারণে ভারতীয় গ্রামগুলো ছিল অস্থায়ী ও ক্রমপরিবর্তনশীল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রশাসনের নিষ্পেষন, বহিঃআক্রমন ইত্যাদি কারণে পুরাতন গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং কোথাও কোথাও নতুন গ্রাম গড়ে উঠছে। এরূপ চিত্র ছিল স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে বাবুরের মন্তব্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য- "হিন্দুস্থানে পাড়া গাঁ, গ্রাম এমন কি শহর গুলোও মুহূর্তের মধ্যে যেমন জনশুন্য হয়ে যায়, তেমন আবার গড়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। বছরের পর বছর ধরে বেশ বড় শহরেই বাস করছে এমন সব লোকও যদি পালায় তারা এমনভাবে পালায় যে, এক দেড়দিন পরে তাদের বসবাসের কোন চিহ্ন বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়না।' অন্যদিকে যে জায়গায় তারা বসবাস করবে সেখানে তারা না কাটে খাল কিংবা কুয়ো খুড়ে আর বাড়ী তৈরী বা দেওয়াল তোলার হাঙ্গামা

Dhaka University Institutional Repository

নেই।"[১৬] কাজেই ভারতীয় গ্রাম গড়ে উঠার জন্য যেমন বিশাল আয়োজন ও আন্‌জামের প্রয়োজন ছিল না, তেমনি তা শুন্য হতেও সময় লাগত না। গ্রাম সমাজের অবকাঠামোগত এ চিত্রটি মুঘল শাসনামলেও অব্যাহত ছিল স্বরূপে। 'আস্‌লি' বা 'দাখিলী' গ্রাম ছাড়াও 'রায়তী' ও 'তালুক' নামে অন্য শ্রেনীর গ্রাম চিহ্নিত ছিল। প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাহায্যে আমরা অনুমান করতে পারি যে, 'রায়তি' ও 'তালুক' গ্রামগুলো প্রশাসনিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠেছিল বলে এগুলো বহুলাংশে স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল। মুঘল শাসনে এরূপ গ্রামগুলোর স্থায়ীত্ব ধরে রাখার জন্য রাজকীয় প্রশাসন ও জমিনদারদের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল।

এই ধরনের শ্রেণী বিন্যাস কোন অঞ্চলের কৃষি জীবনের নিদের্শক হিসাবে কাজ করত।[১৭] এপর্যায়ে গ্রামীন কৃষক ও বিদ্যমান অন্যান্য শ্রেণীর বিন্যাস, পারস্পরিক সর্ম্পক ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করা বাঞ্চনীয়। ভারতীয় গ্রামের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল কৃষক। তৎকালীন গ্রামীন-সমাজে কৃষকের অবস্থান ও অন্যান্য শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করার পূর্বে কৃষক বলতে কি বুঝাত তা পরিস্কার করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ কৃষক বলতে বুঝাত সেই চাষীকে, হালি জমিতে যার দখলী স্বত্ব থাক বা না থাক, জমি বিক্রয় অথবা বন্দক দেয়ার যার কোন অধিকার ছিল না।[১৮] মোরল্যান্ড তাঁর "এ্যাগ্রারিয়ান সিষ্টেম অফ-মুসলেম ইন্ডিয়া" গ্রন্থে ফারসী ভাষায় রচিত কড়চা ও নথিপত্রে উল্লিখিত কৃষক শব্দের পরিভাষাগত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,"কৃষক সমিতি অথবা গ্রামীন জমিনদার এবং গ্রামে যে সব চাষীর বাস, অথবা যাদের বসত গ্রামের সীমানার বাইরে হলেও চাষ করবার জন্য গ্রামেই আসত; এই তিন শ্রেণীর চাষীকে নিয়েই কৃষক সমাজ গঠিত"।[১৯] এক্ষেত্রে কৃষকদের সাথে একই শ্রেণীতে জমিনদার শ্রেণীকে সমপর্যায়ভুক্ত করে নিলে সমাজবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ও অধিকারের সীমা চিহ্নিতকরণে বিভ্রান্তির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ, ইরফান হাবিব স্বয়ং গ্রাম-সমাজের অভ্যন্তরে জমিনদার শ্রেণীকে একটি উচ্চতর অধিক সুবিধাভোগী উপরতলার শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন "গ্রামীন জনসংখ্যা যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, সম্পদের মূল্য অনুযায়ী এই শ্রেণী বিভাগকে তার এক নমুনা হিসাবে ধরা যেতে পারে।" আমরা ধরে নিতে পারি জমিনদার, মহাজন ও শস্য-ব্যবসায়ীদের এক ছোট গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রথম শ্রেণী। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল ধনী চাষীরা আর বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীদের নিয়ে গড়ে উঠে ছিল তৃতীয় শ্রেনী।[২০] কাজেই আমরা গ্রামীন-সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি সর্ম্পকে নিশ্চিত। তবে শ্রেণীবদ্ধ গ্রামীন-সমাজে সংঘবদ্ধ বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণী চরিত্র ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই ভারতীয় গ্রাম-সমাজ এশিয়াটিক সমাজের ভিত্তিতেই আলোচনায় ব্যতিক্রমের দাবীদার।

গ্রামীন-সমাজের যে কোন আলোচনায় জমির উপর মালিকানার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে জমির মালিক কে ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক আধুনিক গবেষক। এই বিতর্কে ইউরোপীয় পর্যটক ও আমলারা তাঁদের নিজস্ব ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজাকেই জমির একমাত্র মালিকানা স্বত্বের অধিকারী বলে রায় দিয়েছেন। রো, বার্ণিয়ে, ফ্রায়ার, মানুচি, তার্বানিয়ে প্রমুখের বিবরণে উল্লিখিত মতের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। ব্যাডেন-পাওয়েল তাঁর 'ইন্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি' গ্রন্থে এই মতবাদকে শক্তিশালী করেছেন।[২১] পরবর্তীকালে এই ধারণাকেই কৃষি ইতিহাসের প্রামান্য ব্যাখ্যাকাররা প্রায় সকলেই সমর্থন করে গিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা ইরফান হাবিবের সাথে ঐক্যমত পোষন করি যে, "সমস্ত জমির মালিক রাজা এই মতটি আগের মত স্বীকৃত মতের অংশ বলে মনে হয় না।" [২২] কারণ, হিন্দু ও মুসলিম প্রচলিত কোন বিধানেই এই রকম কোন মতের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না । মধ্যযুগীয় গ্রন্থকারদের বিবরণে বা অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রাশাসনিক বা ব্যক্তিগত দলিল দস্তাবেজেও এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'চাষী ও ব্যবসায়ীদের' উপর কর আরোপের উদ্দেশ্য সমর্থন করতে গিয়ে আবুল ফজল একটি যুক্তিই দেখান যে, "প্রজাদের রক্ষনাবেক্ষন ও তাদের জন্য ন্যায় বিচারের প্রয়োজনে বাদশাকে যে ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করতে হয় তাঁরই বিনিময়ে এই করকে বাদশাহের পারিশ্রমিক হিসাবে গন্য করতে হবে।" [২৩] কারণ, বাদশাহের প্রশাসনিক ব্যায়ভার বহন করার জন্য বাদশাহের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। তাই বাদশাহের করের প্রয়োজন, যার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ থেকে তিনি প্রশাসনিক ব্যায়ভার বহন করবেন। তাই বলে বাদশাহী ভূ-সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য চাষীকে খাজনা দিতে হবে, ভূমি রাজস্বের ধরণ সম্পর্কে তেমন কোন আভাস কোথাও পাওয়া যায় না।[২৪]

'ওয়াকাই-ই-আজমীর' ইত্যাদি ফারসী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে গৌতম ভদ্র বলেন যে, "শহরে বহু প্রজা তাদের জমি বাদশাহকে বিক্রয় করেছেন, এমন কি তার স্বত্ব নিয়ে বাদশাহের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন।" [২৫] এক্ষেত্রে সমকালীন নথিপত্রে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। আকবরের সময় মথুরার কাছে গোকুল্যের বল্লাভাচার্য গোসাঁইরা জাতিপুরা মৌজায় অর্থের বিনিময়ে জমিনদারের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে শাহ্জাহানও সেই ক্রয়ের আইনগত যর্থাথতা স্বীকার করে নেন।[২৬] জাহাঙ্গীরের আমলে লেখা একটি বিক্রয় কবালায় পূর্ণ মালিকানা স্বত্বের উল্লেখ আছে। 'রহিমাবাদের' 'খাজা করিমুল্লাহ' 'খোজা মুথাথদ'কে একহাজার শাহ্জাহানী টাকার বিনিময়ে জমিসমেত বাড়ী বিক্রি করেছে। সেখানে বাড়ীর মালিক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষনা করেছে যে, সেই বাড়ীতে অন্য কোন শরিকি স্বত্ব নেই এবং মালিকানা তাঁর নিজস্ব।[২৭] কিন্তু এ সমস্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমরা 'আইন-ই আকব রী', 'নিগার নামা-ই- মুন্সী', 'মিরাট-ই-আহমদী', মুহাম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমান ও কাফি খানের রচনা থেকে জানতে পারি যে, জমিতে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলী স্বত্ব ছিল। "যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে জমির মালিক; বাদশা সেই চাষীদের রক্ষা করেন," আইনের এই উল্লেখ থেকে চাষীদের যে 'মৌরুসী' (বংশগত) দখলী স্বত্ব ছিল তা বুঝা যায়।[২৮] কাফীখানও চাষীদের 'মৌরুসী' অধিকারের কথা বলেছেন। আমরা পুর্বেই হাসিমকে দেয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানের কথা উল্লেখ করেছি। উক্ত ফরমানটিতেই মালিক মারা গেলে কিভাবে তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।[২৯] চাষীকে জমির মালিক বলে প্রমাণ করার পক্ষে পি. শরণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও তিনি এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৩০] ইরফান হাবিব কৃষকদের মালিকানা স্বত্বকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করতে গিয়ে মুহাম্মদ হাসিমকে দেয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানটিকে সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করেছেন। আওরঙ্গজেবের ফরমানটিতে 'মালিক' ও 'তারবাব-এ-জমিন' (জমির মালিক) এই শব্দ দুটি খুব পরিস্কারভাবে চাষী ও কৃষকদের বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।[৩১] কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষক গৌতম ভদ্র মনে করেন যে, হাসিমের প্রতি ফরমানের সঙ্গে যুক্ত টীকাতে এই মালিকানাকে স্পষ্টভাবে ফসলের উপর স্বত্ব বলেই নির্ধারণ করা হয়েছে, জমির উপর গ্রাহ্য স্বত্বকে হস্তান্তর করার কথা বলা হয়নি।[৩২] তবে জমিতে চাষীদের দখলী স্বত্ব যে অস্বীকার করা যায় না তার স্বীকৃতি রয়েছে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের দুটি বিধানে। প্রথমটিতে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তাঁরা যেন চাষীদের মালিকানা (রায়ত-কাস্তা) কে 'মদদ-এ মআশ' এর অধিকারীদের নিজের চাষের জমি (খুদ-কাস্তা) হিসাবে নথিভূক্ত না করেন।[৩৩] অন্যটি জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে বসার পর ঘোষিত বারটি আদেশ নামার একটি, যেখানে আকবরের ফরমানের অনুরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে।[৩৪] বস্তুতঃ কৃষকদের দখলী স্বত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলার অবকাশ খুব কম; কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ভূমির মালিক হিসাবে স্বাধীনভাবে জমিতে কৃষকের অবস্থানের ব্যাপারে। এক্ষেত্রে ইরফান হাবিব যে মত প্রকাশ করেছেন তা আরও ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য উপাত্ত হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত নির্দ্বিধায় গ্রহন করা যায়। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, "আধুনিক মালিকানা স্বত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মালিকের ইচ্ছামত জমি ছেড়ে যাওয়া ও বিক্রি করা।" কিন্তু সত্যিকারের এই রকম স্বাধীনভাবে জমি হাত বদল করার প্রশ্নই উঠত না। যদিও এক অর্থে জমি ছিল চাষীর অধীন, অন্য অর্থে আবার চাষী ছিল জমির অধীন। উত্তরাধিকারী না থাকলেও চাষীর পক্ষে জমি ছেড়ে যাওয়া বা চাষ করতে নারাজ হওয়া এর কোনটাই সম্ভব হত না।[৩৫] এর কারণ হিসাবে মোরল্যান্ড ভারতীয় বিশাল আবাদযোগ্য ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

করতে হয় তাঁরই বিনিময়ে এই করকে বাদশাহের পারিশ্রমিক হিসাবে গন্য করতে হবে।" [২৩] কারণ, বাদশাহের প্রশাসনিক ব্যায়ভার বহন করার জন্য বাদশাহের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। তাই বাদশাহের করের প্রয়োজন, যার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ থেকে তিনি প্রশাসনিক ব্যায়ভার বহন করবেন। তাই বলে বাদশাহী ভূ-সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য চাষীকে খাজনা দিতে হবে, ভূমি রাজস্বের ধরণ সম্পর্কে তেমন কোন আভাস কোথাও পাওয়া যায় না।[২৪]

'ওয়াকাই-ই-আজমীর' ইত্যাদি ফারসী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে গৌতম ভদ্র বলেন যে, "শহরে বহু প্রজা তাদের জমি বাদশাহকে বিক্রয় করেছেন, এমন কি তার স্বত্ব নিয়ে বাদশাহের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন।" [২৫] এক্ষেত্রে সমকালীন নথিপত্রে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। আকবরের সময় মথুরার কাছে গোকুল্যের বল্লাভাচার্য গোসাঁইরা জাতিপুরা মৌজায় অর্থের বিনিময়ে জমিনদারের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে শাহ্জাহানও সেই ক্রয়ের আইনগত যর্থাথতা স্বীকার করে নেন।[২৬] জাহাঙ্গীরের আমলে লেখা একটি বিক্রয় কবালায় পূর্ণ মালিকানা স্বত্বের উল্লেখ আছে। 'রহিমাবাদের' 'খাজা করিমুল্লাহ' 'খোজা মুথাথদ'কে একহাজার শাহ্জাহানী টাকার বিনিময়ে জমিসমেত বাড়ী বিক্রি করেছে। সেখানে বাড়ীর মালিক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষনা করেছে যে, সেই বাড়ীতে অন্য কোন শরিকি স্বত্ব নেই এবং মালিকানা তাঁর নিজস্ব।[২৭] কিন্তু এ সমস্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমরা 'আইন-ই আকব রী', 'নিগার নামা-ই- মুন্সী', 'মিরাট-ই-আহমদী', মুহাম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমান ও কাফি খানের রচনা থেকে জানতে পারি যে, জমিতে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলী স্বত্ব ছিল। "যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে জমির মালিক; বাদশা সেই চাষীদের রক্ষা করেন," আইনের এই উল্লেখ থেকে চাষীদের যে 'মৌরুসী' (বংশগত) দখলী স্বত্ব ছিল তা বুঝা যায়।[২৮] কাফীখানও চাষীদের 'মৌরুসী' অধিকারের কথা বলেছেন। আমরা পুর্বেই হাসিমকে দেয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানের কথা উল্লেখ করেছি। উক্ত ফরমানটিতেই মালিক মারা গেলে কিভাবে তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।[২৯] চাষীকে জমির মালিক বলে প্রমাণ করার পক্ষে পি. শরণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও তিনি এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৩০] ইরফান হাবিব কৃষকদের মালিকানা স্বত্বকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করতে গিয়ে মুহাম্মদ হাসিমকে দেয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানটিকে সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করেছেন। আওরঙ্গজেবের ফরমানটিতে 'মালিক' ও 'তারবাব-এ-জমিন' (জমির মালিক) এই শব্দ দুটি খুব পরিস্কারভাবে চাষী ও কৃষকদের বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।[৩১] কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষক গৌতম ভদ্র মনে করেন যে, হাসিমের প্রতি ফরমানের সঙ্গে যুক্ত টীকাতে এই মালিকানাকে স্পষ্টভাবে ফসলের উপর স্বত্ব বলেই নির্ধারণ করা হয়েছে, জমির উপর গ্রাহ্য স্বত্বকে হস্তান্তর করার কথা বলা হয়নি।[৩২] তবে জমিতে চাষীদের দখলী স্বত্ব যে অস্বীকার করা যায় না তার স্বীকৃতি রয়েছে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের দুটি বিধানে। প্রথমটিতে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তাঁরা যেন চাষীদের মালিকানা (রায়ত-কাস্তা) কে 'মদদ-এ মআশ' এর অধিকারীদের নিজের চাষের জমি (খুদ-কাস্তা) হিসাবে নথিভূক্ত না করেন।[৩৩] অন্যটি জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে বসার পর ঘোষিত বারটি আদেশ নামার একটি, যেখানে আকবরের ফরমানের অনুরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে।[৩৪] বস্তুতঃ কৃষকদের দখলী স্বত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলার অবকাশ খুব কম; কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ভূমির মালিক হিসাবে স্বাধীনভাবে জমিতে কৃষকের অবস্থানের ব্যাপারে। এক্ষেত্রে ইরফান হাবিব যে মত প্রকাশ করেছেন তা আরও ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য উপাত্ত হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত নির্দ্বিধায় গ্রহন করা যায়। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, "আধুনিক মালিকানা স্বত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মালিকের ইচ্ছামত জমি ছেড়ে যাওয়া ও বিক্রি করা।" কিন্তু সত্যিকারের এই রকম স্বাধীনভাবে জমি হাত বদল করার প্রশ্নই উঠত না। যদিও এক অর্থে জমি ছিল চাষীর অধীন, অন্য অর্থে আবার চাষী ছিল জমির অধীন। উত্তরাধিকারী না থাকলেও চাষীর পক্ষে জমি ছেড়ে যাওয়া বা চাষ করতে নারাজ হওয়া এর কোনটাই সম্ভব হত না।[৩৫] এর কারণ হিসাবে মোরল্যান্ড ভারতীয় বিশাল আবাদযোগ্য ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

যাতে চাষাবাদ করার পর্যাপ্ত লোকের যথেষ্ট অভাব ছিল। তখনো লোক সংখ্যা অপেক্ষা আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ আনুপাতিক হারে অনেক বেশী ছিল। কাজেই, মুঘল ভারতে সমস্যা ছিল কৃষকের, জমির নয়।[৩৬] গৌতম ভদ্রও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনুরূপ পরিস্থিতি অবলোকন করেছেন। তিনি এক অনামী লেখকের বিবরণীতে জন বিরল 'ছত্রিশ গড়' অঞ্চলে কৃষি-সমাজের বিস্তার সম্পর্কে আবাদী জমি নয়, বরং আবাদকারীর সমস্যা তুলে ধরেছেন।[৩৭] জমি চাষের জন্য নতুন চাষীদের সাগ্রহে ডাকা হত। জমির জন্য নয়, বরং মানুষের জন্যই প্রতিযোগিতা হয়। ব্যাডেন পাওয়েল বলেন, "এখানে জমির কোন প্রতিযোগিতা নেই এবং এ কারণে ভূমি স্বত্ব আদৌ বিতর্কিত নয়। এখানে জমির স্বত্বতে কেউ হস্তক্ষেপ করে না। জমি নিয়ে কোন প্রকার বিবাদ-বিসংবাদ নেই, কারণ জমি নিয়ে কোন প্রতিযোগিতা নেই।"[৩৮] গুজরাটের ওলন্দাজ কোম্পানীর কুঠিয়াল গেলেইসন ঠিক অনুরূপ চিত্র অংকন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কৃষকদের জমি এইভাবে দেওয়া হয়-জমি চাষ করতে উচ্ছুক লোক 'মুকদ্দম' বলে কথিত গ্রাম প্রধানের কাছে যায় এবং তার পছন্দমত জায়গায় ইচ্ছামত জমি চাষ। তার অনুরোধ খুব কমই প্রত্যাখান করা হয় এবং প্রায়ই তার অনুরোধ অনুমোদন করা হয়। কারণ, এখানে চাষযোগ্য ভূমির এক দশমাংশও আবাদ করা হয় না। ফলে যে কেউ তার ইচ্ছামত জমি পেতে পারে এবং সমস্ত ধার্য মিটিয়ে দিয়ে তার সাধ্যমত জমি চাষ করতে পারে।" [৩৯] কাজেই জমির মালিকানার স্বত্ব নিয়ে কোন প্রকার বিবাদ বিসংবাদ যেমন উপস্থিত হয়নি, তেমনি মালিকানা স্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঐতিহাসিক কারণেই ছিল অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় ইরফান হাবিবের মতামতকে স্বীকার করার মত প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা অদ্যাবধি সম্ভব না হওয়ায় এই সিদ্ধান্তেই আসতে হচ্ছে যে, "জমির প্রকৃত মালিকানা না ছিল রাজার, না ছিল চাষীর"। অর্থাৎ, 'রায়তী' এলাকায় অন্ততঃ জমির কোন মালিকই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। জমি ও ফসলের উপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকার বলতে কিছু ছিল না।[৪০] উপরন্ত আধুনিক মালিকানা স্বত্বের এক গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট হল মালিকের ইচ্ছামত জমি ছেড়ে চলে যাওয়া বা বিক্রি করা। এই ধরনের কোন অধিকার চাষীর ছিল না, কাজেই এদিক থেকে চাষীর মালিকানা অধিকার ছিল অসম্পূর্ণ। তাই এক অর্থে জমি ছিল চাষীর অধীন, অন্য অর্থে চাষী ছিল জমির অধীন।[৪১]

এতক্ষন শুধুমাত্র 'রায়তী' এলাকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু জমিনদারী এলাকায় অনেকটা ভিন্ন অবস্থা বিরাজ করত। আমরা জমিনদারী এলাকা সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে রায়তদের মধ্যেও যে শ্রেণী বিভাগ ছিল তা আলোচনা করা যায়। মুঘল শাসনামলে প্রাথমিক উৎপাদকের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। কৃষকদের মধ্যে প্রথম স্তরে ছিল 'খুদকাস্তা' কৃষকরা। এ শ্রেণীর কৃষকের প্রধান বৈশিষ্ট সম্পর্কে খাজা ইয়াসিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "যদি মালিক-ই-জমিন নিজের জমি চাষ করে, তাহলে তাকে 'খুদ-কাস্তা' বলে।" [৪২] 'খুদ-কাস্তা' কৃষককে আবাদের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উপকরণ, গরু, হাল ইত্যাদির মালিক হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ 'খুদ-কাস্তা' কৃষকের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হল-প্রথমতঃ সে নিজের জমি নিজেই চাষ করে, দ্বিতীয়তঃ তার চাষাবাদের প্রয়োজনীয় নিজস্ব উপকরণ রয়েছে এবং তৃতীয়তঃ নিজের গ্রামে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। দাক্ষিণাত্যে এদেরকেই 'মিরাসদার' বলা হত।[৪৩] নিজের জমি বিক্রি ও হস্তান্তর করার অধিকার এদের ছিল একথা সত্য কিন্তু বাস্তবে এর ব্যবহার বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবেই বিবেচিত হচ্ছে। ১৭৭২ সালে মহারাষ্ট্রে এমন একজন 'খুদ-কাস্তা'এর জমি বিক্রির দলিল পাওয়া গেছে।[৪৪] 'খুদ-কাস্তা' চাষীদের চাষাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই আবাদের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্যে তাদের যথা সম্ভব বেশী জমি চাষ করতে হত। রাজস্থানে 'গারুহালা'[৪৫] স্বত্বের অধিকারী 'খুদ-কাস্তা' রায়তরা পারিবারিক শ্রমের উপর নির্ভর করত। 'খুদ-কাস্তা' কৃষকরা বিভিন্ন রকম ভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। এই সব 'খুদ-কাস্তা' কৃষকের সঙ্গে সমাজের উচ্চ বর্ণের একটা সম্পর্ক থাকত। এই শ্রেণীর কৃষকরা অনেক সময় সমষ্টিগতভাবে রাজস্ব পরিশোধের জন্য দায়ী থাকত। একজনের রাজস্ব বাকী থাকলে অন্যরা তা মিটিয়ে দিত।[৪৬] 'খুদ-কাস্তা' কৃষকের পরেই 'পাহি-কাস্তা' কৃষকের স্থান। 'পাহি-কাস্তা' কৃষকরা নিজ গ্রাম ছাড়াও ভিন্ন গ্রামে অন্য

Dhaka University Institutional Repository

জমিনদারের অধীনে চাষাবাদে নিয়োজিত হত। সতীশ চন্দ্র খাজা ইয়াসিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,"পাহি হল কোন একজন জমিনদারের আওতায় একটি মৌজার রায়ত, কিন্তু সে অন্য জমিনদারীতে ও চাষ করতে পারে"[৪৭] কাজেই একই জমিনদারের আওতায় থেকে এক গ্রামে বসবাস করে ভিন্ন গ্রামে চাষবাদ করলেও তাকে 'পাহি-কাস্তা' বলা যাবে না। বরং 'পাহি-কাস্তের' বৈশিষ্ট্য হল বসবাস ও চাষাবাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জমিনদারের আওতাভুক্ত থাকা। 'পাহি-কাস্তাদের' আবার দুটি শ্রেণী ছিল। তাঁদের এক শ্রেণীর উৎপাদনের উপকরণ ছিল না। এই সকল 'পাহি কাস্তারা' 'খুদ কাস্তা' রায়তের উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার করত এবং বিনিময়ে এরা 'বটাই' হিসাবে উৎপন্ন শস্যের একাংশ দিয়ে দিত। অন্য শ্রেণীর 'পাহি-কাস্তা'এর উৎপাদনের উপকরণ থাকায় এরা অনেকটা সুবিধা জনক অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন কারণে 'পাহি-কাস্তা' রায়তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের মস্ত বড় অধিকার ছিল। কেননা, তারা সীমিতভাবে হলেও এক জমিনদারের এলাকা থেকে অন্য জমিনদারের এলাকায় যেতে পারত এবং কৃষি কাজে নিয়োজিত হতে পারত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের শ্রমের জন্য সুবিধাজনক শর্তে জমির উপর এক জাতীয় অধিকার পেত।[৪৮] প্রাপ্ত বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণে লক্ষ্য করা যায় যে, মুঘল শাসকদের কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়নে অনাবাদি জমিতে 'পাহি-কাস্তাদের' সাগ্রহে আহবান জানানো হত। দ্বিতীয়তঃ পাটেল, মহাজন, জমিনদার প্রভৃতিরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধাজনক শর্তে পাট্টা প্রদান করে তাদের নিজেদের গ্রামে চাষাবাদে উৎসাহ যোগাত। তৃতীয়তঃ বহু 'পাহি-কাস্তা' রাজস্ব সংগ্রাহকদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে এক পরগনা ছেড়ে এসে অন্য পরগনায় চাষাবাদ করছে। গৌতম ভদ্র উল্লেখ করেছেন যে, "অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহারাষ্ট্রে-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষি ক্ষেত্র সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয় এবং তখন 'উপরি'রা বিশেষ সুযোগ সুবিধা অনুসারে নতুন জমি চাষ করার সুযোগ পায়। এই কৃষকরা সম্পূর্ন ভাবে জমির সঙ্গে বাঁধা ছিল না।" [৪৯] দিলবাগ সিং তাঁর গবেষণায় 'খুদ-কাস্তা' কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে কতিপয় ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা সম্ভব।

'খুদ-কাস্তা' রায়তের ক্ষমতা ও আবাদযোগ্য জমির পরিমাণের উপর'পাহি-কাস্তা' রায়তের অধিকার ও সুবিধা নির্ভর করত এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রকমফের ছিল। আবাদযোগ্য জমিতে চাপ বাড়লে 'পাহি-কাস্তা' তার সুবিধাজনক শর্তলাভে ব্যর্থ হত। তবে 'পাহি- কাস্ত'দের বড় সুবিধা ছিল জাত, বর্ণ, গোষ্ঠী ভিত্তিক মুঘল গ্রাম সমাজে তারা প্রায়ই অন্য বর্ণভুক্ত হত। কারণ, তাঁরা ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী ছিল। বহিরাগত হিসাবে তারা গ্রামীন-সমাজের যৌথ কর্মে তেমন একটা ভূমিকা পালনের সুযোগ পেতনা। মুঘল যুগে'খুদ-কাস্তা'ও'পাহি-কাস্তদের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব না হলেও বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে একথা বলা যায় যে, পাহিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কারণ, যে কোন বিবেচনায় তখন জমির উপর মোটেই চাপ ছিল না। রাজস্থান থেকে প্রাপ্ত দলিলে জানা যায় যে, পরগনা পিয়াদানের মোট ৩৯৩ জন কৃষকের মধ্যে ৭৫ জন পাহি অর্থাৎ মাত্র শতকরা উনিশ। পুনার পাটোদা তালুকে শতকরা ২৪ পাহি। তবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ সময়ে পাহিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া বিচিত্র নয়।[৫০] তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল 'মুজারিয়ান' নামক কৃষক। এরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'খুদ-কাস্তা' কৃষক ও জমিনদারের 'নানকার' জমি নিজেদের চাষের আওতায় আনত। এই শ্রেণীর কৃষকরা জমিনদার ইত্যাদি উচ্চতর শ্রেণীর কৃষকদের খাজনা দিত। তবে নির্দিষ্ট জমিতে রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব থাকত উচ্চতর শ্রেণীর কৃষক গোষ্টীর।[৫১] 'মুজারিয়ান' ও 'পাহি-কাস্তা'দের মধ্যে বিশেষ কতগুলো পার্থক্য ছিল। 'পাহি-কাস্তা' রায়তরা প্রায়ই নিজ গ্রামে 'খুদ-কাস্তা' ছিল এবং ভিন্ন গ্রামের "খুদ-কাস্তা' কৃষকে রূপান্তরিত হতে পারত। 'মুজারিয়ান'দের সাধারণত এরকম অধিকার ছিল না। 'মুজারিয়ানরা' একই গ্রামের বাসিন্দা হতে পারত। জমির উপর চাষের সময়, প্রায়ই পাহি কাস্তাদের একক স্বত্ব ছিল। কিন্তু মুজারিয়ানদের বংশানুক্রমিক দখলী স্বত্বের সমর্থনে রাষ্ট্রের সকল প্রকার নিয়ম কানুন থাকা সত্ত্বেও মুজারিয়ানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জমিতে দ্বৈত স্বত্বের অস্তিত্ব ছিল-(ক), উচ্চতর কৃষক শ্রেণীর স্বত্ব এবং (খ), মুজারিয়ানদের বংশানুক্রমিক স্বত্ব। বস্তুতঃ মুজারিয়ানরা ইচ্ছা অনুযায়ী আবাদী জমিতে কাউকে বসাতে পারত না বা সেই জমির

Dhaka University Institutional Repository

চাষের ভার অন্য কাউকে দিতে পারত না।[৫২] ভূমিহীন কৃষকদের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সম্প্রতি দিলবাগ সিং এর গবেষণায় প্রাপ্ত কৃষকদের অন্যান্য শ্রেণী সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করা যায়। পূর্ব রাজস্থানের কৃষি সমাজের উপর সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা যায় যে, 'পাহি', 'মুজারিয়ান' ইত্যাদি ভাগ ছাড়াও 'গাভোতি' বা স্থায়ী কৃষকের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল। এক শ্রেণী ছিল 'রিয়ায়তি' ও অপর দল ছিল 'রায়তী'। রায়তীরা ছিল নিম্ন বর্ণের কৃষক। এদের একাংশের জমির উপর কোন অধিকার থাকত না। এরা 'গারুহালা'র কাছ থেকে ভাগচাষে জমি নিত। তাই এদের উচ্ছেদ করাও সহজ ছিল। এরাই সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব দিয়ে জমি চাষ করত। তবে কিছু কিছু রায়তীর দখলী স্বত্ব ছিল এবং তারা জমি ইজারা দিতে পারত। রাজস্বভারে এদের সঞ্চয় বলে কিছুই থাকত না, ফলে এরা প্রয়োজনে রাজস্বের সময়, ধান নেয়ার সময় বা কৃষি উপকরণ ধার করার সময় 'রিয়ায়তি' কৃষকের উপর নির্ভর করত। ইরফান হাবিব চাষাবাদে নিযুক্ত অথচ নিঃস্ব শ্রেণীর মধ্যে আরও গরীব শ্রেণীর অস্তিত্ব আবিস্কার করেছেন। নিঃস্ব চাষী শ্রেণীর মধ্যে ছিল বাংলায় 'কালজারান'রা । অন্যান্য স্থানে এদের 'তেয়ারী' বা 'বলাহর' বলা হত।[৫৪] আবার একেবারেই নিঃস্ব বলতে যাদের বুঝায় তারা ছিল ভূমিহীন ভিন্ন পেশাদারী। উচু জাতের চাষীদের যে সব কাজ করতে ঘৃনা হত- চামড়ার কাজ, ময়লা পরিস্কার ইত্যাদি নীচু জাতের লোকেরা সে সব কাজ তো করতই, তা ছাড়াও তাদের এক ব্যাপক অংশ ক্ষেত মজুরী খাটত। তাই 'চামার'রা মুজুরীর জন্য কৃষক বা জমিনদারের জমিতে খাটত। 'ধানুক'রা ছিল আরও নীচু জাতের। চাষীদের ফসল কাটা ও শস্য বহন করা ছাড়াও ধান বানত বলে এদের এরূপ নাম করণ হয়েছে।[৫৫] 'ধানুক'রা আজমীরে 'খোরী' ও অন্যান্য স্থানে 'বলাহর' নামে পরিচিত ছিল। এই সব বর্ণ বা উপজাতিদের সরাসরি কৃষিকর্ম থেকে সরিয়ে রেখে ভারতীয় বর্ণ পদ্ধতিকেই গ্রামাঞ্চলে উৎসাহিত করেছে। ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর পার্থক্য ছিল প্রধানত দুটি। প্রথমতঃ অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকের উপর কোন না কোন স্বত্ব ছিল; কিন্তু এদের তা মোটেই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যেখানে অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকরা মুলতঃ কৃষি থেকেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করত, যেখানে ভূমিহীন কৃষকরা অন্যান্য নানারকম কাজও করত।[৫৬] ইরফান হাবিব মনে করেন যে, 'জমিনদারী' ছিল চাষীকে বাদ দিয়ে তার উপরতলার এক গ্রামীন শ্রেণীর স্বত্ব"। কাজেই জমিনদারের সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামের, জমির নয়। স্বাভাবিকভাবেই জমিনদারী স্বত্বের অধিকারীর কৃষকের উপর একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়াই ছিল এ স্বত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেহেতু এটি মূলতঃ জমি সংক্রান্ত অধিকার, তাই আমরা ধারণা করতে পারি যে, এর অধিকারী জমির উৎপন্নের একটা ভাগ পেত।[৫৮]

এই ভাগের পরিমাণেও যথেষ্ট হেরফের হত। যে সব এলাকার বাদশাহী প্রশাসন স্বয়ং কৃষকদের রাজস্ব হার বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে জোর করত, সেখানে জমিনদারকে নিজের সুবিধার জন্য আলাদা উপকর বসাতে হত। বস্তুতঃ প্রায় গোটা মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে জমিনদারীর আওতাভুক্ত জমির জন্য জমিনদারের একটা আর্থিক দাবী ছিল, সেই দাবী মেটানোর জন্য হয় চাষীদের উপর আলাদা শুল্ক চাপানো হত বা জমির একটা অংশ লাখেরাজ হয়ে তাঁদের হাতেই থাকত; বা কর্তৃপক্ষ নিজেই সমস্ত জমি থেকে রাজস্ব আদায় করে তার থেকে তাঁদের একটা নগদ ভাতা দিত।[৫৯] কাজেই জমিনদারগণ ছিলেন গ্রামীন সমাজে একটা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী যাদের সাহায্য সহযোগিতায় বহুলাংশে বাদশাহী প্রশাসনের শোষন প্রক্রিয়া চলত। আবার, ভারতীয় সমাজ বিকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে জমিনদার শ্রেণী বাদশাহী প্রশাসন ও কৃষকের সহযোগির ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল; ফলে জমিনদার শ্রেণী কখনই স্বতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত হয়ে নিয়ামক সামাজিক শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। তাই কার্যত ভারতীয় সমাজ বিকাশে ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তরে এমন কি সমাজবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য শ্রেণী দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মুঘল শাসনামলে গ্রামীন-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান, অবস্থা, অধিকার ও দ্বন্দের প্রকৃতি ও মাত্রা ছিল বিচিত্র ও জটিল। সুতরাং, সাধারণ্যে প্রচলিত ভারতীয় গ্রামীন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের ধারণার সঙ্গে বেশ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ ভারতীয় গ্রামীন-সমাজে শ্রেণী বিন্যাস বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও কর্তব্য ছিল, আর সঙ্গত কারণেই তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল ভিন্ন। সম্প্রতি সতীশ চন্দ্র ও দিলবাগ সিং এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, গ্রামের উচ্চতর সম্পন্নকৃষক ইচ্ছা করলে (সীমিত অর্থে) নিজের মূলধন ও সামাজিক ক্ষমতার ভিত্তিতে উৎপাদন শক্তিকে নতুনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত (সেচ ব্যবস্থার দ্বারা) করে অন্যদের চেয়ে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ কৃষি থেকে আহরণ করতে পারত।[৬০] এমতাবস্থায় মুঘল ভারতের গ্রামীন সমাজে সংঘবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার ও কর্মে দ্বন্দ্ব থাকলেও তাঁরা একই শ্রেণীভুক্ত না হলেও তাঁদের চরিত্র ছিল এক; ফলে সেখানে কোনরূপ শ্রেণী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে গ্রামীন সমাজের অস্তিত্ব ও স্বরূপ, এতে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি, অবস্থান ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করে এতে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হল। এ প্রেক্ষিতে শ্রেণীবদ্ধ গ্রামীন সমাজে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ বিকাশে গ্রামীন-সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা মুল্যায়ন করা প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাত্ত্বিক আলোচনায় মার্কসের 'এশিয়াটিক' সমাজের মডেল নিয়ে গবেষকরা বিভিন্ন বির্তকে লিপ্ত থাকলেও এটাকে বেশ গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করেছেন। মার্কসের মতে; "এশিয়াটিক সোসাইটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট ছিল গ্রামীন-সমাজের কৃষিজাত ও হস্তজাত শিল্পের ঐক্যবন্ধন"[৬১] অর্থাৎ গ্রামীন সমাজে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করেই একটি গ্রামে কৃষি ও শিল্পের জন্য শ্রমশক্তি যৌথভাবে নিয়োজিত হত।[৬২] এই কারণেই গ্রামীন সমাজে স্বয়ম্ভরতা বিরাজ করত। এই প্রেক্ষিতে মার্কস বলেন, "শিল্প ও কৃষির ঐক্যবন্ধনের ফলে ক্ষুদ্র সমাজ সম্পূর্নরূপে স্বয়ম্ভর হয় এবং নিজের মধ্যেই উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের শর্তকে পূরণ করে।"[৬৩] এশিয়াটিক সোসাইটির অন্য লক্ষণ হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি। মার্কস ভারতীয় গ্রামীন সমাজের ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণ যোগ করেছেন যে,"গ্রামীন-সমাজ যা গড়ে উঠেছিল যৌথ মালিকানার উপর।" [৬৪] মার্কস অন্যত্র উল্লেখ করেছেন যে,"একদিকে প্রাচ্য-দেশীয় স্বৈরতন্ত্র সম্পত্তির আইনগত অনুপস্থিতি সুচিত করে; অন্যদিকে গ্রামীন-সমাজের ভিত্তি হচ্ছে উপজাতিয় বা যৌথ মালিকানা। তাই এশিয়াটিক ব্যবস্থা স্বভাবতই সবচেয়ে বেশীদিন ধরে, সবচেয়ে অনড় অবস্থায় টিকে থাকে।" [৬৫] সামাজিক শ্রমবিভাগ এখানে অনুপস্থিত, ফলে শ্রেণীর বিন্যাস অনুন্নত ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব এখানে স্তিমিত। সঙ্গত কারণেই এখানে পরিবর্তনের হার অত্যন্ত ধীর; কারণ প্রত্যেকটি গ্রামীন-সমাজ পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন; স্বয়ম্ভর ও আপন চলার পথে আপন গতিতেই আবর্তিত হচ্ছে। স্বয়ম্ভর সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির সরলতা আমাদের এশিয়াটিক সমাজের পরিবর্তনহীনতার সূত্রের সন্ধান দেয়। সমাজ কাঠামো মৌল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আওতার বাইরে থাকে।[৬৬] প্রবন্ধের প্রথমেই ভারতীয় গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে ব্রিটিশ আমলাদের ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে, আর এখানে এশিয়াটিক সমাজ সম্পর্কে মার্কসের ধারণা ব্যক্ত করা হল। এ প্রেক্ষিতে ভারতীয় গ্রামীন-সমাজ সম্বন্ধে তুলনামুলক বিচার করা যেতে পারে। আধুনিক গবেষক তপন রায় চৌধুরী ব্রিটিশ আমলা ও মার্কসের ভারতীয় গ্রাম সমাজ সম্পর্কিত ধারণা কে অতি সরলীকরণের দোষে-দুষ্ট ও সমার্থক বলে মন্তব্য করেছেন।[৬৭] তবে স্পষ্টতই উল্লিখিত দুটি ধারণার মধ্যে সাদৃস্যের চেয়ে বৈসাদৃস্যই বেশী ছিল। প্রথম পার্থক্য দৃষ্টি ভঙ্গিতে যেখানে বৃটিশ আমলারা গ্রাম্য সমাজকে আদর্শায়িত করতে চেয়েছিলেন, বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন; সেখানে মার্কস এই সমাজের পশ্চাতমুখিতাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, সমাজের ভাঙ্গনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মার্কস স্পষ্টভাবে গ্রামীন-সমাজে কৃষি ও কুঠির শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরতা ও একতার কথা বলেছেন। তৃতীয়তঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি মার্কস ব্যক্ত করেছেন যে, গ্রামীন-সমাজে যৌথ মালিকানার ধারণা ছিল দ্বান্দ্বিক। ফোরম্যানে মার্কস গ্রামীন সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম্য-সমাজ ও তার উদ্ধর্তন সুবিধাভোগী কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। গ্রামীন-সমাজে এই দুই ধরনের অস্তিত্বের ফলেই দুই ধরনের অধিকার জন্ম নেয়- একক স্বত্ব ও বংশানুক্রমিক স্বত্ব।[৬৮] মার্কস তাই স্বভাবতই এশিয়াটিক সমাজে জমির উপর বিভিন্ন ধরনের অধিকারের কথা বললেন। নীচু তলার দিকে গ্রামীন-সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার কোন ধারণা না থাকলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারের অস্তিত্বের কথা মার্কস উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে গ্রাম্য-সমাজের উপর তলার কোন শক্তি বা গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের উপকরণের মালিক বলে স্বীকার করে এশিয়াটিক সমাজের মধ্যে দুই ধরণের কাঠামোর কথা চিন্তা করলেন। [৬৯] ইতিমধ্যেই গ্রামীন কৃষক সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও ধারণার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তবে গ্রামীন-সমাজ শ্রেণীবদ্ধ ছিল কি না? বা এতে শ্রেণী চরিত্র বিকাশের সম্ভাবনা ছিল কিনা? এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মার্কস গ্রামীন-সমাজে উদ্বৃত্ত সম্পদের বিভিন্ন অংশকে ভোগ করার জন্য গড়ে উঠা একটি উচ্চতর গোষ্ঠীর কথা স্বীকার করেছেন, আর অসংখ্য গ্রাম্য-সমাজ এই উচ্চতর গোষ্ঠীর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে। কাজেই, এশিয়াটিক সমাজে পাশাপাশি অবস্থান করছে একদিকে শ্রেণীবিহীন গ্রাম্য-সমাজ,অন্যদিকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রশক্তি- যা এক ধরনের উচ্চতর ক্ষমতা, যায় মধ্যে শ্রেণী সমাজের বীজ সুপ্ত আছে।[৭০] সুতরাং, এশিয়াটিক সমাজ শ্রেণীবিহীন 'আদিম সাম্য-সমাজ', 'দাস-সমাজ' ও শ্রেণী বিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মাঝামাঝি একটি অবস্থা।[৭১] মার্কস ও ব্রিটিশ আমলারা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি সম্পর্কে একমত হলেও আমলারা এশিয়াটিক সমাজের দ্বান্দ্বিক দিকটি আবিস্কার করতে পারেননি। অন্যদিকে মার্কস অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা এশিয়াটিক সমাজে পরিবর্তনের দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এশিয়াটিক সমাজ দুই বিপরীত ধর্মী সামাজিক কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত, সেই সমাজে তাই দ্বন্দ্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই কালক্রমে উচ্চতর শ্রেণী একটি পরিণত শোষকশ্রেণীতে পরিণত হতে পারে ("সাম্রাজ্যবাদ আসার আগেই এশিয়াটিক সমাজ একটি পুরোপুরি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পরিণত হতে পারে")[৭২] মার্কসের এমতবাদের সাথে ইরফান হাবিবের মতের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের বিত্তবান সদস্যদের হাতে সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে গ্রাম-সমাজ হয়তো কিছুদিন বাদে সর্ম্পূণভাবেই হারিয়ে যেত এবং এই বিত্তবান লোকেরাই সাধারণত দেখা দিত মোড়ল হিসাবে।"[৭৩]

এতক্ষন গ্রামীন-সমাজ, এশিয়াটিক সমাজের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করা হল। এই পর্যায়ে মুঘল ভারতের গ্রামীন সমাজের বাস্তব প্রেক্ষিতে তার প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষন করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বেই গ্রামীন সমাজের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। সংঘবদ্ধ গ্রামীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী লক্ষন, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাদের পারস্পরিক সর্ম্পক,বিভিন্ন প্রকার অধিকার, সামাজিক দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ইত্যাদি দিক নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামীন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আমলা ও মার্কসের মতাদর্শের ভিত্তিতে অথ্যের সাহায্যে মুঘল গ্রামীন সমাজের চরিত্র ও লক্ষনগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইরফান হাবিব বলেন যে, "আমরা যখন গ্রাম-সমাজ শব্দটি ব্যবহার করি তখন তার মানে এই দাঁড়ায় যে, তার সদস্যদের প্রতিভূ হিসাবে গ্রাম কর্মিগণ গ্রামের সব জমির অধিকারী ছিল।" জমিতে যে চাষীদের যৌথ মালিকানা ছিল বা চাষীদের মধ্যে মাঝে মাঝে জমি বন্টন বা পূনর্বন্টন করা হত-তেমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। জমিতে চাষীর অধিকার বরাবরই ছিল ব্যক্তিগত, তবে উৎপাদনের বাইরে এমন কয়েকটি ক্ষেত্রে ছিল, যেখানে গ্রামের চাষীরা যৌথভাবে কাজ করত।[৭৪] তখনকার দিনে অবস্থা যা ছিল তাতে যৌথভাবে কাজ না করে উপায় ছিল না। কারণ, বসতি পাল্টানো ছিল তখনকার দিনে চাষীদের জন্য সাধারণ ঘটনা। একা একা ঘুরে কোথাও জঙ্গলাপূর্ণ এলাকায় বসতি পাল্টানোর ক্ষেত্রে চাষীদের দল বেঁধে কাজ করতে হত। দ্বিতীয়তঃ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যে, রাষ্ট্রশক্তির মোকাবেলা করতে চাষীদের জোট বাঁধতে হত।[৭৫] বস্তুতঃ 'দেহাৎ-ই-রায়তির' কৃষকরা সরাসরি রাষ্ট্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

আমলা বা গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে রাজস্ব দেয়। ফলে কৃষককে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করতে হত। তাই গ্রাম-সমাজে যৌথভাবে রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রবনতা ছিল। তবে এ কথা সত্য যে,'পাট্টাদারী' ও 'ভাইয়াচারী' মালিকানা ব্যবস্থার সাথে গ্রামীন সমাজের সাধারণের কোন মিল নেই। মূলতঃ জমিনদারী এলাকায় কয়েকটি পরিবার একত্রে জমিনদারীর মালিকানা ভোগ করত। ইরফান হাবিব 'মন্‌সারৎ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে ষোড়শ শতকের কোংকনের গ্রামগুলির এক বিবরণে এই বিষয়টি পরিস্কার করেছেন। এখানে বারটি 'আলদিয়ার' (গ্রাম) প্রত্যেকটি থেকে দুজন করে প্রতিনিধি তাঁদের মুনসি সমেত একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমেবেত হয়। সেখানে তাঁরা সভা করে সাধারণ লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান এবং রাজাধিরাজের সেবা বাবদ খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কি করতে হবে তা স্থির করে। রাজাধিরাজের রাজস্ব এভাবে নির্ধারিত হয় যে, জমিতে বেশী বা কম যাই উৎপন্ন হোক না কেন ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সব সময় দিতে হবে। যতদিন কোন "আলদিয়া" (গ্রাম) বিনষ্ট অবস্থায় থাকে বা সেখানে কোন ফসল না হয় তবে তার রাজস্ব দেয় অন্যান্য গ্রাম।[৭৭] এ থেকে প্রমাণ হয় যে, কোংকন দ্বীপের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একটি যৌথ তহবিল। কিন্ত 'মনসরাতে'র বর্ণিত এইরূপ কোন সংস্থার পরিচয় উত্তর ভারতের গ্রামগুলোতে লেনদেন করত এমন কোন প্রমাণ নথিপত্রে পাওয়া যায় না বলে ইরফান হাবিব মত পেশ করেছেন। ইরফান হাবিব মনে করেন যে,"গ্রামীন-সমাজে 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থা চালু ছিল বলে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, আসলে তা বাড়ীর কর্তাদের সমিতি এবং এর উপরই 'ভাইচারা' সমাজের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল"[৭৮] ইরফান হাবিব মোরল্যান্ডের সাথে ঐক্য মত পোষন করেন যে, সাম্প্রতিক কাল অবধি যে কাজের জন্য 'পঞ্চায়েত' টিকে আছে তা হল প্রত্যেক জোতের উপর রাজস্বের অনুপাত স্থির করা এবং গ্রামের সাধারণ খরচের টাকা বরাদ্দ করা। হিসাব-নিকাশের কাজ গ্রামীন মোড়লের নেতৃত্বেই হত। এই ধরনের গ্রামে মোড়ল ছিল শুধুমাত্র গ্রাম-সমাজের মুখপাত্র, সব সময়েই সে চলত গ্রাম-সমাজের ইচ্ছানুযায়ী।[৭৯] কিন্তু গ্রামের সাধারণ খরচ সর্ম্পকে যে সব তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে করে একে যৌথ তহবিল হিসাবে গ্রামের সাধারণ লোকের স্বার্থে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ইরফান হাবিব বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, গ্রামীন সমাজে যৌথ তহবিল ছিল এবং চাষীরা মিলিতভাবে কাজ করত। ইরফান হাবিব টোডরমলের সুপারিশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন," গ্রামগুলোতে চাষীরা" সকলেই বিশ্বস্ত ও যৌথভাবে রাজস্ব জমা দেয় অথবা কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করার জন্য সবাই জোট বাঁধে"[৮০] কিন্ত আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র ইরফান হাবিবের সাথে ভিন্নমত পোষন করে বলেন যে," একথা সত্য যে, ;'দেহাৎ-ই-তালুকে' শক্তিশালী জমিনদারের উপস্থিতি এই গ্রামগুলোকে কিছুটা স্বতন্ত্র চরিত্র দিয়েছে। কিন্ত মুঘল আমলে জমির উপর বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার অধিকার থাকলেও সাধারণভাবে গ্রামীন সমাজের যৌথ মালিকানার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ, রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি কৃষক পরিবারকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হত কেননা জমিতে কৃষকের দখলী স্বত্বকে সমষ্টিক ভিত্তিতে বিবেচনা করার তেমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে রাজস্ব নির্ধারণ (জমা) করা এমনকি আয়ের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির ধারণা চূড়ান্ত প্রাধান্য পেয়েছে, এর ব্যতিক্রম খুব একটা নজরে পড়ে না। কাজেই, এমন কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গ্রহন করা যাবে না- যেখানে গ্রামীন সমাজে যৌথ মালিকানার প্রশ্নটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য গ্রামের যৌথ তহবিল ও গ্রামীন সমাজের যৌথ মালিকানার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। বস্তুতঃ এ রকম কোন প্রমাণ নেই যে, কৃষি সমাজের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদকের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করার দায়িত্ব গ্রামীন সমাজের ছিল।[৮২] ইরফান হাবিব মনে করেন, গ্রামীন সমাজের যৌথ তহবিলের (খরচ-ই-দেহ্ বা গ্রামের খরচ) মধ্যে 'মোড়ল' ও 'পাটোয়ারীর' ভাতা, কানুনগো ও আমীন- এর দস্তুরী চৌধূরীকে খাতির যত্ন করা ইত্যাদি খরচ নিহিত ছিল।[৮৩] কাজেই 'খরচ-ই-দেহ' বা গ্রামের খরচ বাদশা নির্ধারিত ধার্য রাজস্বের পরিমাণ নয়, বরং তা ছিল গ্রামীন সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের আমোদ-প্রমোদের ও গতানুগতিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে ধার্য রাজস্বের অতিরিক্ত কিছু। এই ধরনেরই এক প্রকার কর ছিল 'কালিব' যা সম্রাট-আকবরের আমলেই বেআইনী ঘোষনা করা হয়। সুতরাং, 'খরচ-ই-দেহ' কখনই গ্রামীন সমাজের যৌথ ভান্ডারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ব্যয়ের নিজস্ব খাতেই তাকে ধরা হত।[৮৪] অধিকন্তু, গোচারণ ক্ষেত্র ও বন জঙ্গল গ্রামীন সমাজের অধিকার ভুক্ত ছিল না। একথা সত্য যে, অনাবাদী জমি আবাদ করার অধিকার রায়তের ছিল এবং কোন কৃষক বন কেটে আবাদ করলে সেখানে তার দখলী স্বত্ব জন্মাত। বিনিময়ে তাকে রাষ্ট্রকে কম হারে রাজস্ব দিতে হত। তবে এক্ষেত্রে 'জমিনদার' ও 'মুকদ্দম'কে কিছু ধার্য অংশ দিতে হত- সেগুলো' সয়ের'ও 'জিহাৎ' এর মধ্যে পরিগণিত হত।[৮৫] সুতরাং, জমিতে গ্রামীন-সমাজের যৌথ মালিকানা ছিল একথা প্রমাণ করার মত এখন পযর্ন্ত তেমন জোরালো কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইরফান হাবিব স্বয়ং 'গ্রাম্য পঞ্চায়েতের' কার্যাবলীর সীমা সীমিত বলে উল্লেখ করেছেন যা ইতিমধ্যেই অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, গ্রামীন সমাজে বিচারের জন্য বিভিন্ন কর্তাব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'চৌধুরী' 'কানুনগো' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আবার 'মনসেরাৎ' এর বিবরণ গ্রামীন-সমাজের 'মুন্সীর' কথা অবগত হওয়া যায়। এখানে তিনি গ্রামীন-সমাজের মনোনিত একটি "জেনারেল চেম্বারের" মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে 'মুন্সীর' প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই 'মুন্সী' গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতি কিনা তা সাক্ষ্য প্রমাণে নির্ধারণ করা যায় না। কাজেই, এ কথাও সত্য যে, মুঘল আমলে গ্রামীন পঞ্চায়েতের অস্তিত্বও ছিল ক্ষীন। [৮৬]

ব্রিটিশ আমলা ভারতীয় গ্রামীন সমাজকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ মুঘল যুগে প্রদত্ত নথিপত্রে গ্রামীন সমাজের বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রামীন সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভিত্তিতে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে ইরফান হাবিব বলেন, "সেখানে পাশাপাশি বিরাজ করত মুদ্রা অর্থনীতি ও স্বয়ংম্ভরতা। পরস্পর বিরোধী এই দুটি অর্থনৈতিক উপাদানের অস্তিত্বের দরুনই বোধহয় এই সমাজিক দ্বন্দ্ব, যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল একদিকে কৃষিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন রীতির অস্তিত্বে অন্যদিকে গ্রাম সমাজ গঠনে"[৮৭] ইতিমধ্যে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রামাণ্য নথিপত্রে দেখান হয়েছে। এখন অর্থনৈতিকভাবে গ্রামের অবস্থান বিচ্ছিন্ন ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে গ্রামীন অর্থনীতিতে মুদ্রা অর্থনীতি ও স্বয়ম্ভরতার বিষয়ে পরে ভিন্নভাবে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এই পর্যায়ে গ্রামীন-সমাজের বিচ্ছিন্নতার কথার যর্থাথতা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ইরফান হাবিব তাঁর পূর্ববর্তী মত থেকে সরে এসে বাংলা সংস্করণের ভুমিকায় মত পেশ করেছেন যে, "গ্রামেও বাজারের মুখ চেয়ে উৎপাদন করা হত।" [৮৮] বস্তুতঃ কৃষকের উৎপাদনের একটা বড় অংশই বাজারে পৌছত। তাই বাজারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ইরফান হাবিব তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুঘল ভারতের কৃষি-পণ্যের বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে দিয়ে কৃষি উৎপাদন ও কৃষি-পণ্যের বাজার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "কৃষকের উৎপাদনের একটা বড় অংশই বাজারে পৌছত।"[৮৯] মুঘল ভারতে রাজস্ব নির্ধারণ করা হত টাকার অংকে এবং যথাসম্ভব নগদেই রাজস্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টা ছিল শাসক গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য। ফলে কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করে নগদ প্রাপ্তি অনেক সময়ই চাষীদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ত। আবার সব এলাকায় সব রকমের পণ্য-উৎপাদন হত না, এমন অনেক পণ্য-ছিল যে গুলো অপরির্হায বিধায় কৃষককে বাধ্য হয়েই বাইরে থেকে আমদানী করতে হত। প্রধানতঃ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে এমন গ্রাম ও ছিটমহলগুলোতেও নিশ্চয়ই খাদ্য-শস্যের ব্যবসার প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দিত। সব গ্রামের পক্ষে এই সব জিনিসে স্বয়ং নির্ভরশীল হওয়া সম্ভব ছিল না।[৯০] মুঘল আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা হত-সেগুলো দুরের বাজারে বিক্রি করা হত। বাংলায় 'মোম'.'গোল মরিচ','গন্ধক', 'চাল', 'মাখন', 'তৈল', 'গম' ইত্যাদি[৯১] পণ্য অন্যান্য জায়গা থেকে প্রায় অর্ধেক দামে পাওয়া যেত। জাহাজে করে বাংলার চিনি যেত পারস্যে আর আফিম যেত 'ক্যারলে'। বাংলার রেশম রফতারী হত জাপান ও হল্যান্ডে, ষোড়শ শতকে পর্তুগীজরা রেশমের এক গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বাণিজ্য গড়ে তুলে। আবার ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে বাংলার তুলার সুতা ও চিনি রফতানী আরাম্ভ হয়। আগ্রা ছিল নীলের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর সেরা নীল জন্মাত এই অঞ্চলের কাছাকাছি অঞ্চলেই। এই নীলের আন্তর্জাতিক বাজারও ছিল বেশ চাঙ্গা।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ গোটা মুঘল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আন্ত:-বাণিজ্যে যেমন বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপক আদান-প্রদান হত, তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় বিভিন্ন পণ্যের বাজার ছিল তেজী।

ভারতীয় শহরগুলো তাদের খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে গ্রামের উপরই নির্ভর করত। উপরন্ত শহরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন হস্ত শিল্পের কাঁচা মালের জন্যও শহরগুলো পুরোপুরিভাবে গ্রামের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং, শহরের জন্য শুধুমাত্র খাদ্যই নয়, হস্তশিল্পের কাঁচামালও যোগাতে হত- গ্রামাঞ্চলকেই।[৯৩] যেহেতু শহরগুলো পুরোপুরি খাদ্য-শস্য ও হস্তশিল্পের কাঁচামালের জন্য গ্রামের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাই শহরের বিশাল লোক-গোষ্ঠীর খাদ্যসহ ভোগ বিলাসের যোগানে মোট- কৃষি উৎপাদনের একটা বড় জায়গা দখল করেছিল। এ কারণে, খুব অল্প গ্রামই বাজারের টান এড়াতে পারত। নগদে রাজস্ব আদায় ও দৈনন্দিন অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য কৃষক গরুরগাড়ী, ঘোড়ারগাড়ীতে বাজারে মাল পাঠাত। অর্থনৈতিক শস্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যেত। যেমন নীলের মত দামী জাতের শস্যের ক্ষেত্রে উৎসাহী-ব্যবসায়ীরাই গ্রামে গমন করত। নীল ও তামাকের মত অর্থকরী শস্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী মহাজন প্রমুখ কৃষকদের দাদন দিত। ফলে বেশীর ভাগ চাষী খোলা বাজার অবধি পৌছতে পারত না, কারণ দাদন দাতার চুক্তির শর্তানুযায়ী কৃষকরা দাদন দারদের কাছে মাল বেঁচতে বাধ্য হত।[৯৪] চাষীদের ঋণ গ্রস্ততা, দারিদ্র, শিক্ষা ও মানসিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চাষীরা বাজার ব্যবস্থার হালচাল সর্ম্পকে যথেষ্ট সচেনতা অর্জন করেছিল বলে সাক্ষ্য প্রমাণে অনুমিত হয়। চাহিদা ও যোগানের সাথে বাজার দামের উঠা-নামার সঙ্গে চাষী বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। মুরল্যান্ড তার 'ফ্রম আকবর টু আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে বাজারের সঙ্গে তাল রাখার ব্যাপারে চাষীদের সাধারণ প্রবনতার বিষয়ে তথ্যনিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৯৫] তামাক চাষের ব্যাপক ও দ্রুত প্রসার এটাই প্রমাণ করে যে, কৃষক ব্যক্তিগতভাবে বাইরের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে নিজের গ্রামে উৎপাদনে রত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে চাষবাসের কাজ বাজারের চাহিদার উপর ঘনিষ্ঠভাবে, এমনকি নিরুপায় হয়ে নির্ভর করত। অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মিটানোর কাজ গ্রাম থেকে শুধুমাত্র কাঁচামাল সরবরাহেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শিল্পীও সরবরাহ করা হত। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে শিল্পীদের কৃষি জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। গ্রাম থেকে নগরের চারপাশে তাঁতীদের এবং বিশেষত 'নকদ' বা রেশম সুতা নির্মাতাদের জমায়েত গড়ে উঠেছিল।[৯৭] গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক সংগহ ও বাণিজ্যের ভার ছিল 'বানজারা' নামক এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে।[৯৮] সুতরাং, মুঘল যুগে ভারতীয় গ্রাম-সমাজের বিচ্ছিন্নতার কথা বোধহয় বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সমর্থন করা যায়না।

এখন মুঘল ভারতীয় গ্রামীন-সমাজের স্বয়ম্ভরতার দিকটি বিচার করে দেখা যায়। ইরফান হাবিব গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্নে ইতিবাচক মত পোষন করেছেন। তিনি মার্কসের এশিয়াটিক সমাজের তাত্ত্বিক মতবাদকে নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে, বিশেষ করে উৎপাদনে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল, যদিও তা কখনো কখনো স্বতন্ত্র একক গ্রামে সম্ভব না হলেও আঞ্চলিকভাবে তার সম্পূর্ণতা ছিল। কারণ, আমরা কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য ধারা থেকে জানতে পারি যে, এই ধারা একমুখি ছিল। শহর গ্রাম থেকে দ্রব্য আহরণ করত কিন্তু শহর হতে গ্রামে কিছু ফিরে যেতনা।[৯৯] গ্রামীন সমাজের স্বয়ম্ভরতার সম্ভবত একটি বড় কারণ ছিল গ্রামীন জন গোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরে বিশেষ কিছু কেনার সার্মথ্য গ্রামীন জনগোষ্ঠীর ছিল না। গ্রোভার তাঁর গবেষণায় গ্রামের একক স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়ে সন্দেহ পোষন করে এলাকা ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলে কতিপয় সাক্ষ্য হাজির করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে মেদিনীপুরের উপর একটি সমীক্ষায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, পরগনা 'নারায়ণগড়ে' মোট গ্রামের সংখ্যা ২৪৫টি বাড়ীর সংখ্যা ৩৬৫৪টি সেখানে রায়তদের চাহিদা পূরণ করে ৮১ ঘর তাঁতী। পরগনা 'ভূস্যতায়' আছে ৭৫টি গ্রামের জন্য ৫০ ঘর তাঁতী পরিবার। এবং পরগনা কেদারে আছে ২১১টি গ্রামের জন্য ৩৭টি তাঁতী ঘর।[১০০] প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে মনে হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমবাহিনী তৈরী করতেই জাতিভেদ প্রথা কাজ করে গিয়েছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।[১০১] গ্রামের প্রতিটি হাতের কাজই, যেমন ছুতোরের কাজ, কুমারের কাজ, মিস্ত্রীর কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি এক একটি আলাদা জাতের জন্য নিদিষ্ট ছিল এবং সম্ভবত এক একটি গ্রামে তাদের একটির বেশী পরিবার থাকত না। অর্থনৈতিক কারণে গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল; ফলে প্রতিটি গ্রামে কয়েকটি প্রাথমিক ধরনের হাতের কাজের উপস্থিতি ছিল একান্ত জরুরী। কিন্তু বৃত্তির পার্থক্য যদিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে থাকে তবে জাতিভেদ প্রথার বিধানের ফলে তা সংহত রূপ পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আইনতঃ স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। একবার এ ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর প্রতিটি গ্রাম অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র এককে পরিণত হল; ফলে প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠল এমন এক একটি সমাজ যেখানে লোকসংখ্যা বাড়লে একই ধরনের আরেকটি সমাজের জন্ম দিতে পারত।[১০২] ফলে অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগের এই দৃষ্টান্তকেই মার্কস ভারতীয় গ্রাম-সমাজের গঠনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন।[১০৩] পুরুষানুক্রমিক শ্রম বিভাগ ও জাতের সংহতি পরবর্তিকালে এর স্বাভাবিক বিকাশ ধারায় কয়েকটি বিশেষ গ্রামে হয়ত কয়েকটি বিশেষ বৃত্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল। উল্লিখিত গ্রামগুলোই তাদের নিজস্ব উৎপাদনে আশে-পাশের গ্রামগুলোর চাহিদা মেটাত। উৎপাদনের বাইরেও অন্যান্য কতিপয় ক্ষেত্রে গ্রামীন সমাজের স্বয়ম্ভরতা ছিল। এ ব্যাপারে যৎসামান্য আলোচনা করে গ্রামীন-সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়টা বুঝা যেতে পারে। নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই গ্রামীন জনগোষ্ঠী উৎপাদনের বাইরে কতিপয় ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করতে বাধ্য হত। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এখন স্বয়ম্ভরতার প্রশ্নে আরও দু একটি সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা যায়। 'মনসরাৎ' কংকন সমাজের 'সাধারণ সভার' কথা এবং এতে 'মুন্সী'র ভূমিকা তুলে ধরেছেন। ইরফান হাবিব গ্রামীন সমাজের যৌথ তহবিলের প্রসঙ্গে তথ্যনিষ্ট ব্যাপক আলোচনা করেছেন- যা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন রাজস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শণের কথা উল্লেখ করা হল, যেখানে দেখা যায় যে, কৃষকরা যৌথভাবে জমির ইজারা নিত, বা টাকা শোধ দেবার জন্য দায়ী থাকত। আবার মুলতানে গ্রামের একটি প্রাসঙ্গিক দলিলে দেখা যায় যে, "(পাতিল ও গ্রামের সিরানী চাষী) সকলের উপস্থিতিতে ভূমি 'কাওয়াসজি' ঐ গ্রামে 'সীরাম পাট্রার' জন্য আবেদন করেছ আমরা তোমার আবেদন মঞ্জুর করে তোমাকে 'সোন' বলে জমি দিচ্ছি।"[১০৫] ১৪২৬ সনের নোয়ার পূর্তগীজ শাসনকর্তা 'নুনহো-ডি-কুনহার' আথিক উপদেষ্টা 'আফোনযো মেইডা' গোয়ার নিকটস্থ গ্রামগুলোর উপর একটি বিশদ প্রতিবেদন তৈরী করেন, সেখানেও জমি হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে।[১০৬] সম্প্রতি প্রাপ্ত বিভিন্ন নথিপত্রে দেখা যায় যে, গ্রামীন কারিগরদের ক্ষেত্রেও গ্রামীন সমাজের নিয়ন্ত্রন ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, কারিগররা সমস্ত গ্রামের সেবা করে, ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি পরিবারের বেতন ভুক্ত নয়। অন্যত্র পাঞ্জাবে প্রাপ্ত এক তথ্যে দেখা যায় যে, কৃষকরা গ্রামের কারিগরদের শস্যের শতকরা ৫ ভাগ দিত। একে বলা হত 'হকুক-ই-কামিয়ানা'।[১০৭]

এ পর্যন্ত গ্রাম সমাজের কাজকর্মের যে ধাঁচ হাজির করা হল, সব গ্রাম-সমাজেই যে তা কঠোরভাবে মেনে চলত এমন মনে করলে ভুল করা হবে। প্রত্যেক গ্রামের চাষীরাই যে একটি গ্রাম-সমাজে সংগঠিত ছিল, এমন ধরে নেয়াও উচিত নয়। দক্ষিণ ভারতের গ্রাম-সমাজগুলোর মত উত্তর ভারতে গ্রামীন-সমাজের তুলনামূলক এতটা জুরালো ভূমিকা দেখা যায় না। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও বাইরের আক্রমন প্রতিরোধে কৃষকরা গ্রামীন সমাজের যৌথ প্রয়াসের ভূমিকার কথা বার বার উপলব্ধি করেছে। সুতরাং, ব্রিটিশ আমলাদের বর্ণিত মুঘল ভারতে গ্রাম-সমাজের ধারণার সাথে বাস্তবতার বিরাট ফারাক রয়েছে। বস্তুতঃ ব্রিটিশ আমলাদের গ্রামীন সমাজের ধারণা মুঘল ভারতের বাস্তবতায় বহুলাংশে অবাস্তব। কিন্তু ভারতীয় সমাজ সর্ম্পকে মার্কসের ধারণার সীমাবদ্ধতা থাকলেও তিনি মুঘল ভারতীয় গ্রামীন-সমাজের সত্যিকার অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে ছিলেন একথা বলা যায়। প্রবন্ধের প্রথম দিকেই ভারতীয় গ্রামীন সমাজ সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। অতপর, দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সহজে পরিহার করা (জড়িয়ে দেওয়া) যায় না। জমিতে বিভিন্ন ধরনের অধিকার সম্বন্ধে তাঁদের ধারনা ছিল সীমিত। কৃষক ব্যক্তিগত

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারের দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও পুরোপুরি মালিকানা- স্বত্বের অধিকারী তাকে বলা যায় না।[১০৮] তবে গ্রামীন অর্থনৈতিক ধারা ও উৎপাদন রীতি সম্বন্ধে মার্কস অনেকটা নিভুল তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন যে, "ভারতীয় গ্রাম স্বয়ম্ভর এবং এখানে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতিতে পারস্পরিক পরিপূরকের ভূমিকা পালন করেছে"। এখন এ পর্যায়ে ভারতীয় গ্রাম-সমাজের ভূমিকা এবং তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের বাস্তবতার বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করা যায়। গ্রামীন সমাজের উৎপাদন কাঠামোয় দু ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পন্য উৎপাদন, বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন-যা নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য উৎপাদন থেকে বাজারের জন্য উৎপাদন বা পণ্য উৎপাদন গ্রামীন সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তরে অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। গ্রামীন অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প ছিল সহাবস্থানে পারস্পরিক পরিপূরক মাত্র। কিন্তু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাজারের মুখ চেয়েও উৎপাদন করা হত। এমতাবস্থায় বাইরের অর্থনীতির টান হস্তজাত শিল্পকে ও কৃষিকে নিজেদের পারস্পরিক পরিপুরকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য দূরবর্তী বাজারের চাহিদার দিকে সাড়া দিয়ে উৎপাদন পদ্ধতিতে গতি সঞ্চালনে সম্ভবত উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। সুতরাং, নিছক গ্রামের চাহিদার দিকে দিয়ে হস্তশিল্প ও কৃষির গাঁটছাড়া যেমন সত্য, ঠিক তেমনিভাবে বাইরের বাজারের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের বীজ উপ্ত ছিল।[১০৯] অর্থাৎ গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্যাদি নিছক ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করা হত না, বরং দূরের বাজারে তার একটা বিনিময় মূল্যও ছিল। এখানে গ্রামীন সমাজে শ্রমের গতি-প্রকৃতি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ, উৎপাদনে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রম ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর নির্দেশক। ইতিমধ্যেই গ্রামীন-সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে কৃষক ব্যতিত ভূমিহীন চাষীসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামীন সমাজে সচরাচর নিম্ন বর্ণের লোকেরা কৃষি কাজে সহায়তা করা ছাড়াও বিভিন্ন রকম পেশায় জড়িত ছিল-যা গ্রামীন জীবন যাপনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। এই শ্রেণীর পেশাজীবিদের অবস্থান সর্ম্পকে ইরফান হাবিব স্পষ্টতঃ বলেন যে,"উঁচুজাতের চাষীদের যেসব কাজ করতে ঘৃনা হত-'চামড়া'র কাজ,ময়লা পরিস্কার করা ইত্যাদি,-নীচু জাতের লোকেরা এসব কাজ তো করতো, তা ছাড়া তাদের এক ব্যাপক অংশ ক্ষেত মজুরীও খাটত।"[১১০] 'ধানুকরা' ছিল আরও নীচু জাতের, চাষীদের ফসল কাটা ও শস্য বইবার সঙ্গে এরা ধান বানত বলেই সম্ভবত এদের এই নামকরণ। সম্ভবতঃ কৃষি-উৎপাদনের জন্য একটি নিদিষ্ট সংরক্ষিত শ্রমবাহিনী তৈরী করতেই জাতিভেদ প্রথা কাজ করে গেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। সবচেয়ে ঘৃন্য ও লজ্জাজনক কাজ বরাদ্দ ছিল নীচু জাতের লোকদের জন্য' নিজেদের হাতে জমি পেয়ে বা চাষ করে তারা কখনই চাষী হওয়ার আশা করতে পারত না।[১১১] সুতরাং, এতে প্রমাণিত হয় কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশা ছাড়াও গ্রামীন সমাজের অন্যান্য অপরিহার্য সেবাকর্মে যেসব নিম্ন শ্রেণীর লোক নিয়োজিত ছিল তাদের শ্রম স্বাধীনভাবে বিক্রি বা নিয়োগ করার কোন রকম সুয়োগ ছিল না। কারণ, ইতিমধ্যেই জমিতে কৃষকের স্বত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানা গেছে যে, মুঘল ভারতের আবাদী ভূমির বিশাল অরণ্য চাষীর অভাবে অনাবাদীই পড়ে থাকত। তবে কেন ভুমিহীন ব্যক্তি অহল্যা জমিতে ভিটে গড়ে চাষী হতে পারত না? ইরফান হাবিব এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, "মুঘল ভারতে অপেক্ষাকৃত বেশী জমির কৃষক পরিবারকে ফসল কাটার মত জরুরী সময়ে নিজেদের লোক বলের ঘাটতি পূরণ করতে বেশী 'ঠিকে শ্রমিক' লাগাতে হত'। এই ঠিকে লোক পাওয়া যেত শুধুমাত্র অকৃষক শ্রেণী থেকে, অর্থাৎ এই গ্রামবাসীরা চাষবাস ছাড়াও অন্য পেশায় যুক্ত ছিল। এর কারণ এদের অনেকেরই প্রকৃত অবস্থা ছিল আধা দাসের মত-অর্থাৎ এরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বর্ণ কৃষক বা জমিনদারের কাছে এক ধরনের মুসলেকা বন্দী হয়েছিল।"[১১২] মূলত জাতভেদ প্রথা চাষী ও নীচু জাতের পেশা জীবিদের মধ্যে যে বংশানুক্রমিক পার্থক্য তৈরী করেছিল তা থেকে গ্রামীন সমাজে শ্রমের শ্রেণীগত প্রভেদ অনুমান করা যায়। মার্কস এই অপরিবর্তনীয় শ্রম বিভাগকে ভারতীয় গ্রাম-সমাজের অপরিহার্য লক্ষন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১১৩] বস্তুতঃ মুঘল ভারতে বিভিন্ন ধরনের কৃষকের বিভিন্ন ধরনের অধিকারের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থায়ও ছিল বিভিন্ন। কিন্তু সম্পন্ন কৃষক সীমিত অর্থে ইচ্ছা করলে নিজের মূলধন ও সামাজিক ক্ষমতার ভিত্তিতে উৎপাদনী শক্তিকে নতুনভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত (সেচ ব্যবস্থার দ্বারা) করে অন্যান্যদের চেয়ে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ কৃষি থেকে অর্জন করতে পারত। সমকালীন নথিপত্রে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে পাঞ্জাবের একটি গ্রামে ধার্য জিজিয়া কর সংক্রান্ত দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, গ্রামের ২৮০ জনের মধ্যে ১৩৫ জনের সম্পদ ২৫০০ টাকার মত, ৩৫ জনের সম্পদ ৫২ টাকায় উপরে, ১৩৭ জনের সম্পদ ৫২ টাকার নিচে এবং ২২ জন একবারে নিঃস্ব। বিভিন্ন কারণে ৭৩ জনের জিজিয়া কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়। এখানে২৮০ জন কৃষকের মধ্যে মাত্র ১৩ জন কৃষককে সম্পন্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই জমিতে মূলধন প্রয়োগ করে গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থায় গতি সঞ্চালনের বিভিন্ন সম্ভাবনা আমরা বিচার করে দেখতে পারি। কেননা, জমির আধিক্য থাকলেও তাকে চাষের আওতায় আনার জন্য মূলধন ও শ্রমের প্রয়োজন ছিল। গ্রামীন শ্রম যে অনেকটা গ্রামের উর্ধ্বর্তন গোষ্ঠীর অনুকূলে ছিল তা আমরা দেখেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'অপরিবর্তনীয় সংঘবদ্ধ শ্রম শক্তিকে কেন উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিকতর বিকাশের কাজে লাগানো যায়নি? এক্ষেত্রে শ্রমের গতিশীলতা, শ্রমিকের স্বাধীনতা, মূলধন নিয়োগ ও উৎপদন বৃদ্ধির "অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা" ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ইতিমধ্যেই শ্রমের স্থানুতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতা যে ছিল না তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। মূলধন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্দীপনার বিষয়টি ও অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

মুঘল ভারতে উৎপাদনের প্রধান উৎস ছিল কৃষি। ফলে রাজস্বের প্রধান উৎসও ছিল কৃষি। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী তাঁদের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ, সামরিক শক্তির ভরণ-পোষন, ব্যক্তিগত আমোদ ফুর্তির পিছনে ব্যয়িত অর্থ, প্রজা কল্যান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমি রাজস্বের উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করত। এমতাবস্থায় কৃষি উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির উপর সরকারের আয়ের পরিমাণ নির্ভর করত। ফলে মুঘল শাষকগোষ্ঠী সবর্দাই যে কোন মূল্যে চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাত। মুঘল প্রশাসনের বিভিন্ন নথিপত্রে ও সমসাময়িক প্রাপ্ত তথ্যে এ সংক্রান্ত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।"নিগর-নামা-ই-মুন্সী" ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, রাজ কর্মচারীদের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তাঁরা যেন তাঁদের এলাকায় এক টুকরা জমিও অনাবাদী না রাখেন।। মুহাম্মদ হাসিমকে দেয়া আওরঙ্গজেবের ফরমানে উল্লেখ রয়েছে যে, 'চাষ করার ক্ষমতা ও সেচের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও যদি দেখা যায় যে, চাষীর চাষাবাদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, তাহলে রাজস্ব কর্মচারীদের উচিত তাদের উপর জুলুম করার ভয় দেখানো এবং কয়েদ ও দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করা। 'রসিক দাস কোরির' প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমানেও অনুরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ রয়েছে, চাষাবাদযোগ্য জমি যেন পতিত না থাকে। আমিলের প্রধান কাজই হচ্ছে চাষাবাদযোগ্য জমি যাতে অনাবাদী না থাকে এবং অনাবাদী জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা।[১১৪] "খুলাসাত-উ-সিয়াক" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এন. এ. সিদ্দিকী বলেন যে, "আবাদী জমির মোট পরিমাণ যাতে না কমে এবং আবাদযোগ্য জমি যেন আবাদী জমিতে নিয়োজিত হয় তা দেখাশুষার দায়িত্ব আমিলের হাতে ন্যাস্ত ছিল।"[১১৫] কাজেই রাষ্ট্র সবদাই দাবী করত আবাদী জমির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হউক। কিন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা থাকলেও, এমনকি রাষ্ট্রের প্রবল ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের পক্ষে বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়ে উঠত না। এক্ষেত্রে গ্রামীন জমিনদার ও গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জমিনদার ছিল গ্রামীন সমাজের উর্ধ্বর্তন স্তরের সদস্য। সরকার ও কৃষকের মধ্যকার রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে জমিনদার ছিল মধ্যস্থতাকারী। স্থানীয় রাজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিনদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং বহুবিধ দায়-দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত থাকত। প্রথমতঃ জমিনদারের সমস্ত আবাদী জমিতে চাষ হচ্ছে কিনা তার উপর লক্ষ্য রাখা জমিনদারের দায়িত্ব বলে পরিগণিত হত।[১১৬] কৃষককে স্বেচ্ছায় অথবা প্রয়োজনে বলপ্রয়োগে কৃষিকাজে নিয়োগ করার ক্ষমতা জমিনদারের ছিল। কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকায়, তৎকালীন অবস্থায় কৃষককে কৃষিকাজে নিয়োগ করা সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁরা কোন মতেই একেবারে অপরিচিত বহিরাগতের কথায়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস স্থাপন করত না। অথচ একই গ্রামে বসবাসকারী স্বগোষ্ঠীর জমিনদারের সহিত গ্রামবাসী বিভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ, কাজেই তাদের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ও স্থানীয় রাজস্ব প্রশাসনে জমিনদারের অপরিহার্য অবদান সর্ম্পকে সরকার যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং সেই কারণেই অধিক পরিমাণ জমি কৃষিকাজে নিয়োজিত করা ও বিভিন্ন রায়তের সাহায্য লাভ করা যে জমিনদারের কর্তব্য, তা প্রায়ই তাঁর গোচরে আনা হত। অন্যদিকে গ্রামের সম্পন্ন কৃষক হিসাবে 'খুদ-কাস্তা' কৃষকরাই সত্যিকার অর্থে গ্রামীন সমাজে চাষাবাদের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। বস্তুতঃ জমির আধিক্য থাকলেও তাকে কৃষির আওতায় আনার জন্য মূলধন ও শ্রম প্রয়োজন এবং গ্রামীন-সমাজে "খুদ-কাস্তা" কৃষকরাই সম্পন্ন কৃষক হিসাবে সম্ভবত সামান্য মূলধনের অধিকারী ছিল এবং অন্যান্য কৃষক শ্রেণীর উপরও তাদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল। গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর শ্রম গোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই 'খুদ কাস্তা' কৃষকদের অধীনস্ত ছিল। ফলে নিজস্ব প্রয়োজনের বাইরে বাজারের মুখ চেয়ে অতিরিক্ত উৎপাদনের চিন্তা সম্ভবত 'খুদ কাস্তা' কৃষকের মাথায় ছিল।

এ পর্যায়ে মুঘল সরকারের আবাদী জমি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাদি নিয়ে সামান্য আলোচনা না করলে কৃষিতে গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত অবদানের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাবে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মুঘল প্রশাসনের প্রয়োজনেই আবাদ বাড়ানো অপরিহার্য ছিল । আকবরের আমলের 'করোরী' পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে এলাকা জরিপের কাজ করা হয়েছিল। সমসাময়িক তিনটি তথ্যসূত্রে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এর চেষ্টা ছিল প্রধানতঃ অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনা।[১১৭] কৃষি ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাতে গিয়ে মুঘল প্রশাসন প্রধানত রাজস্ব ছাড় দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। যেমন, যে জমিতে কয়েকবার চাষ হয়নি, সে জমিতে চাষ করা হলে প্রথম বছর রাজস্বের প্রধান হারের অর্ধেক বা এর চেয়েও কম নেয়া হত। তারপর বছর বছর হার বাড়িয়ে যাওয়া হত যতক্ষন না পঞ্চম বছরে পরিমাণটি পুরো অংকে পৌছে। সেই বছর রাজস্ব কর্মচারীদের নির্দিষ্ট জমির (নমক এর আওতায়) চেয়ে বেশী জমিতে ধান বুনলে কৃষককে অতিরিক্ত এলাকার উপর রাজস্ব দিতে হত না।[১১৮] ১৬০০-৩২ সনের দুভিক্ষের পর কোন কোন ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় আবার বসতি স্থাপনে উৎসাহ দেয়ার জন্য অস্বাভাবিক রকমের কম রাজস্ব হার প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে জমিতে ঐ ফসল নতুন চাষ করা হচ্ছে সেখানে প্রথম প্রথম সাধারণ হারের চেয়ে কম নিতে হবে।[১১৯] এইভাবে যে জমিতে আগে শস্য ভাল হত, সেখানে উচুমানের শস্য চাষ করলে রাজস্ব স্বাভাবিক 'দস্তুর" অনুযায়ী যা দাঁড়ায় তার চেয়ে একের চার ভাগ হবে। উন্নয়নে উৎসাহ দেয়ার জন্য আর্থিক ছাড় ছাড়াও অন্য কয়েকটি ছাড়ের সুপারিশ করা হয়েছিল। 'বনজার' জমির চাষী তার খুশীমত রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি বেছে নিতে পারত।

উৎপাদনে উৎসাহ দেয়ার আরেকটি অথচ গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ছিল চাষীদের 'তকাবী' (আক্ষরিক অর্থে শক্তিদায়ী ঋণদান)। আবুল ফজলের বর্ণনায় শুধু এটুকুই পাওয়া যায় যে, যেসব চাষীর হাত খালি 'আলমগুজার' তাদের এ ঋণ দিতে সাহায্যে করবে।[১২১] টোডরমল অবশ্য তার সুপারিশে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "সে সমস্ত চাষীকেই 'তকাবী' দিতে হবে যারা খুব দুর্দশাগ্রস্থ, যাদের বীজ বা বলদ নেই।"[১২২]

সাধারণতঃ 'তকাবী' ঋণ দেয়া হত 'চৌধুরী' ও 'মুকাদ্দামে'র মাধ্যমে। তাঁরাই চাষীদের মধ্যে এ ঋণ জনে জনে বিলি করত এবং নিজেরা ঋণ শোধের জামিনদার হত।[১২৩] মনে হয় এ ক্ষেত্রে সরকারী আমলারা যথাসম্ভব নিজের ফায়দা আদায় করে নিতে চেষ্টা করত। ফলে 'চৌধুরী' 'মুকাদ্দম', 'পাটেল' ইত্যাদি গ্রাম্য আমলারা নিজেদের পুঁজিও সরকারী পুঁজির সাথে সরকারী পুঁজি হিসাবেই কৃষকদের বুঝিয়ে বিতরণ করত। এই সকল ঋণ প্রদানের লক্ষ্য যেহেতু কৃষি উন্নয়ন ও আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োজিত হত, কাজেই ঋণদানের পিছনে সরকারের লক্ষ্য থাকত যেন চাষীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে এবং সে বেঁচে থাকে । তাই ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার খুব বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের

Dhaka University Institutional Repository

নীতি গ্রহন করেছিলেন। আবুল ফজল সুপারিশ করেন, "এই ঋণ আদায় করতে হবে ধীরে ধীরে।" [১২৪] তবে বিভিন্ন কিস্তিতে কয়েক বছরে কখনো একই বছরে বিভিন্ন কিস্তিতে আদায় করতে দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে ধর্মীয় প্রভাবে পড়ে কর্তৃপক্ষ 'তকাবী' ঋণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুদ আরোপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য এও খুব সম্ভব যে, 'চৌধুরী' ও 'মোড়লরা' চাষীদের তরফে 'জামিন' দাঁড়াতে গিয়ে এই অনুগ্রহের সুবাদে তাঁদের 'দস্তুরী' বা খুব উসুল করে নিত।[১২৫] বস্তুতঃ মুঘল প্রশাসনের কৃষির উন্নয়ন বিষয়ক ব্যবস্থা পত্রে শুধুমাত্র উল্লিখিত পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং মুঘল সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারী আমলাদের যুক্ত করে বিভিন্ন অঞ্চলে সীমিতভাবে হলেও কুয়ো খোড়া, খাল কাটা, ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সেচের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। 'নিগরনামা-ই-মুন্সী' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইরফান হাবিব জানান যে,"মুলতান প্রদেশে 'খাল' তত্বাবধায়ককে নতুন খাল খোড়াতে হত ও বাঁধ তৈরী করতে হত। শাহজাহানের আমলে দুটি খাল কাটার উদ্দেশ্য ছিল- একটি থেকে লাহোরে বাগানে জলসেচ করা, অন্যটির উদ্দেশ্য শাহ্জাহানাবাদের দুর্গে জল সরবরাহ করা"[১২৬] এই সকল দৃষ্টান্তে অনুপ্রানিত মার্কস রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থা নির্মান ও নিয়ন্ত্রন মুঘল ভারতের কৃষি জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা অবিশ্বাসযোগ্য বলে ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন। কিন্ত অন্য একটি বিষয়ে এক্ষেত্রে মুঘল সরকারের কিছুটা আগ্রহ ছিল বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বাবর' থেকে শুরু করে প্রত্যেক মুঘল সম্রাটই বাগান করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। কাজেই, সামন্তদের হাতে যে প্রচুর সম্পদ ছিল তার কিয়দংশ এই সকল সামন্তরা তা কৃষি ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করত। এবং এই বিনিয়োগ প্রায়ই ফলের বাগানে নিয়োজিত হত। সম্রাট থেকে 'মনসবদাররা' সবাই নিত্য নতুন নানা ধরনের ফলের গাছ লাগাতেন এবং চারা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রায়ই বিলাসিতা বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটা কখনই কৃষি উৎপাদনের রূপান্তরে বা ব্যাপক কৃষি অর্থনীতির গুনগত রূপান্তরে ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ইরফান হাবিব মুর্শিদাবাদে আমের বাগান ও সেখানে নানা ধরনের চারা নিয়ে পরিক্ষা নিরীক্ষা একটি উন্নত পর্যায়ে পৌছেছিল বলে মতপ্রকাশ করে বলেন, "তবুও সেখানে প্রধানত বাণিজ্যিক চাষ ছিল তুঁত গাছের চাষ।"

দীর্ঘ আলোচনায় ইরফান হাবিবের মতামতের ভিত্তিতে মুঘল ভারতীয় গ্রামীন সমাজের বিভিন্ন দিকের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরবর্তিকালে প্রাপ্ত নথিপত্র ও বিভিন্ন গবেষকের মতামতের ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রামীন-সমাজের সত্যিকার চিত্রটি যথাসম্ভব তুলো ধরার চেষ্টা করা হল। পরবর্তি অধ্যায়ে গ্রামীন সমাজের অন্যতম সামাজিক শক্তি 'জমিনদার' শ্রেণীর সত্যিকার অবস্থান ও ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে তাঁদের অবদান আলোচনা করা প্রয়োজন।

তথ্য নিদের্শ

১. গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ.২
২. উদ্ধৃত, গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২
৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ . ৩
৭. এইচ. এস .মেইন, উদ্ধৃত , গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৯. *Report of The Selecied committee of House of Commons*, ১৮৩২ উদ্ধৃত গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩
১০. গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ .৪
১২. ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, বাংলা সংস্করণ*, কে, পি, বাগাচী এ্যান্ড,কোম্পাণীকলিকাতা, ১৯, ভূমিকা।
১৩. K. M. Ashraf, *The life and comditions of the people of Hindustan* (1200-1526) Delhi, 1960, p .36
১৪. N. A. Siddiqi, *The Revenue Adiministration of The Mughal*, Bombay, 1970, p. 8
১৫. *Ibid*, p. 9
১৬. *Zaharuddin Babur Nama* Tr. Mrs. A, S. Beveridge, Reprint, 2 vols. Delhi, 1970, pp. 487-88
১৭. N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 10
১৮. *Ibid*, p. 10
১৯. W. H. Moreland, *The Agrarian system of Moslem India*, Delhi, 1968, p. 161
২০. Irfan Habib , *The Agrarian system of Mughal India*, Bombay, p. 120
২১. B. R. Grover , *The concept of village Communjity in North India, cited by Gaytam Bhadra*, op. cit. p. 10
২২. Irfan Habib, *op. cit.* p. 111
২৩. Abul Fazl, *Ain-I-Akbari*, Tr H. S. Jarrett, revised J. N. Sarkar. Delhi, 1949, vol. 1, pp. 290-91
২৪. Irfan Habib, *op. cit.* p 111
২৫. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬
২৬. *Imperial Formans*, Tr,& ed, K. M. Javeri, Bombay, 1924, Formans No, 4,6
২৭. *Insha-I- Harkan*, Tr. & ed, Balfour, calcutta, 1881,pp. 163-64
২৮. Irfan Habib, *op. cit.* p. 115
২৯. *Ibid*, p. 115
৩০. P. Saran. *The provincial Goverment of Mughal (1526-1658)* Allahabad, 1958, pp. 328-35
৩১. Irfan Habib, *op. cit.* p. 113
৩২. গৌতম ভদ্র *পূর্বোক্ত* পৃ. ৯
৩৩. Abul Fazl, *op. cit*, vol. 1. p. 287
৩৪. W. H. Moreland, *Jahagir,s India*, Delhi, 1925, p. 48
৩৫. Irfan Habib, *op. cit.* p. 116
৩৬. Moreland, Agrarian, *op. cit. pp.* 144-45
৩৭. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*. পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. B. H. Baden powell, *The land system of British India*, Delhi, 1974, vol. 2, pp,452-53
৩৯. W. H. Moreland, *"A. Dutch Account of Mughal Administrative Methods*, J I H, vol. IV, P. 79
৪০. Irfan Habib, *op. cit*. p. 118
৪১. *Ibid*, p. 116
৪২. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬
৪৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭
৪৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭
৪৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮
৪৬. Satish Chandra, *"The Structre of Village Society in North India*, Madieval India, Bombay, 1982, pp. 29-45
৪৭. *Ibid*, p. 32
৪৮. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯
৪৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫০
৫০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
৫১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
৫২. *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫১
৫৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
৫৪. Irfan Habib, *op. cit*. p. 121
৫৫. *Ibid*, p. 121
৫৬. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
৫৭. Irfan Habib, *op. cit*. p. 141
৫৮. *Ibid*, p. 144
৫৯. *Ibid*, p. 150
৬০. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
৬২ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪
৬৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪
৬৪ *The Capital*, Moscow, 1970, vol. iii, p. 333
৬৫ *The Capital*, *op. cit*. p. 83
৬৬ *The Capital* ,op. cit. vol. 1, p. 48
৬৭ Moreland, *Agrarian System of Mughal India*, Enquiry, 1965, Spring, p,92
৬৮ Karl Marx, *op. cit*. p. 69
৬৯ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫
৭০ Maurice Godelier, *Nature Asiatic Mode of production Marx & Engls*, Enquiry, 1965, winter, pp. 84-85
৭১ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

৭২ Maurice Godelier, *op. cit.* pp. 85-86
৭৩ Irfan Habib, *op. cit.* p. 128
৭৪ *Ibid*, p. 123
৭৫ *Ibid*, p. 123
৭৬ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯
৭৭ Irfan Habib, *op. cit.* p. 125
৭৮ *Ibid*, p. 127
৭৯ Moreland, *op. cit.* pp. 163-65
৮০ Irfan Habib, *op. cit.* p. 124
৮১ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৯
৮২ *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০
৮৩ Irfan Habib, *op. cit.* p. 126
৮৪ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০
৮৫ "সয়ের জিহাৎ" করের প্রকৃতি, আদায় ও ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এন. এ. সিদ্দিকী, *পূর্বোক্ত* Appendix -c
৮৬ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০
৮৭ Irfan Habib, *op. cit.* p. 118
৮৮ ইরফান হাবিবের বাংলা সংস্করণের ভূমিকা দেখুন।
৮৯ Irfan Habib, *op. cit.* p. 76
৯০ *Ibid*, p.77
৯১ *Record of English Factory (1686- 50)* Landon, p. 338
৯২ Irfan Habib, *op. cit.* p. 78
৯৩ *Ibid*, p. 76
৯৪ *Ibid*, p. 77
৯৫ Moreland W. H. *op. cit.* pp. 190-192
৯৬ গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ.১০
৯৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৯৮ Irfan Habib, *op. cit.* p. 76
৯৯ *Ibid*, p. 76
১০০ গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ.১১
১০১ Irfan Habib, *op. cit.* p. 121
১০২ *Ibid*, pp. 121-122
১০৩ Capital , vol. 1, *op. cit.* pp. 350-352
১০৪ গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
১০৫ Rabindra Kumar, *Western India in Ninteenth century*, London, 1968, p. 25
১০৬ *Earliest Known European Account of indian Villages*, Tr. by, Baden powell, JRAS, 1900, April, p. 272
১০৭ Indu Banga, *The Agrarian system of the sikhs*, Delhi, 1978, p. 109
১০৮ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩

১০৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
১১০ Irfan Habib, *op. cit*. p. 121
১১১ *Ibid*, p. 122
১১২ *Ibid*, p. 121
১১৩ Marx, *op. cit*. p. 121
১১৪ গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
১১৫ N. A , siddiqi, *op. cit*. p. 44
১১৬ *Ibid*, p. 34
১১৭ *Ibid*. p.
১১৮ *Ain-I- Akbari*, *op. cit*. p . 285
১১৯ *Ibid*, p. 285
১২০ *Ibid*, p. 303
১২১ *Ibid*, p. 285
১২২ Irfan Habib, *op. cit*. p. 246
১২৩ *Ibid*, p. 254
১২৪ *Ain-I- Akbari*, *op. cit* p . 285
১২৫ Irfan Habib, *op. cit*. p. 255
১২৬ *Ibid*, p. 256
১২৭ গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
১২৮ Irfan Habib, *op. cit*. p. 256
১২৯ *Ibid*, p. 79

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জমিনদার ও মুঘল সমাজ

মুঘল কৃষি ব্যবস্থার প্রকৃতি ও স্বরূপের সঠিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে জমিনদার শ্রেণী। মুঘল কৃষির উদ্বৃত্তের অন্যতম দাবীদার জমিনদার শ্রেণী। এই শ্রেণীটিই আবার কৃষক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী মধ্যস্বত্বভোগী বিশেষ শ্রেণী। মুঘল অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি ও কৃষি অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে জমিনদার শ্রেণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, মুঘল কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক প্রশাসনিক শৃংখলার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই জমিনদার শ্রেণী। সাম্রাজ্যের আর্থিক সংগতি, মনসবদারী, জায়গীর ইত্যাদি প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা নির্ভর করত জমিনদারী ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রন ও শৃংখলার উপর। কাজেই শুধু মাত্র মুঘল কৃষি প্রশাসনেই নয়, বরং গোটা মুঘল প্রশাসন ও সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের প্রশ্নে জমিনদার শ্রেণীর সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির যথার্থ প্রকৃতি ও স্বরূপ আবিস্কার করা এক দিকে যেমন জরুরী, তেমনি মুঘল সমাজ বিকাশের গতিশীলতা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের কারণ অনুসন্ধানে জমিনদারী ব্যবস্থার নানাদিক অন্বেষণ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জমিনদার শ্রেণী ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে কৃষকের নিকটজন। দীর্ঘ প্রায় ছয়শত বছর ধরে উপমহাদেশের কৃষি অর্থনীতি ও রাজ্য-প্রশাসন সরাসরি এই শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই জমিনদার শ্রেণীর চরিত্র ও লক্ষনগুলো স্থির করা, সামাজিক শক্তি হিসাবে তার স্বরূপ আবিস্কার করা, কৃষি ও সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তরে তার ভূমিকা, মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বে তার অবদান ইত্যাদি বিষয় গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। অধ্যাপক ইরফান হাবিব তাঁর 'মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা' নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাপক তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা-পর্যালোচনা করে মুঘল ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন ও মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কৃষি সংকট, সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব, ইত্যাদি প্রশ্নে জমিনদার শ্রেণীর ভূমিকার উপর আলোকপাত করেছেন। তাসত্ত্বেও তৎকালীন সমাজ বিকাশে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশ ও রূপান্তরে জমিনদার শ্রেণীর সঠিক অবস্থান তথা সফলতা ও ব্যর্থতাগুলো ততটা স্পষ্ট হয়নি। ইরফান হাবিব প্রথমেই জমিনদারী স্বত্বের স্বরূপ আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন।[১] আধুনিক ভারতীয় প্রয়োগে জমিনদার বলতে বুঝায় জমির মালিক। ব্রিটিশ শাসনে সৃষ্ট জমিনদারী ও আধুনিক জমিনদারী ধারণার সাথে মুঘল জমিনদারীর প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক কারণেই গবেষকদের মাঝে এই বিষয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্ত যেহেতু মুঘল জমিনদারী ও ব্রিটিশ প্রশাসনের জমিনদারী অভিন্ন নয়, কাজেই এই বির্তক নির্থক। তা সত্ত্বেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, জমিনদার বা জমিদার বলতে কি বুঝায়, অথবা এই শব্দটির অর্থ কি? দুর্ভাগ্যবশত জমিনদার শব্দটির অর্থ তখন কি ছিল সে বিষয়ে 'আইন-ই-আকবরী' বা কোন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে সরাসরি কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।[২] মুঘল আমলে ব্যবহৃত এই জমিনদার শব্দটি স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, সমসাময়িক তথ্যসূত্রে জমিনদার কথাটি সাধারণভাবে প্রায়ই প্রধানদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।[৩] আধুনিক গবেষকদের মধ্যে মোরল্যান্ড ও পি·শরনের মধ্যে এই বিষয়ে প্রায় অভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। মোরল্যান্ড বাংলায় জমিনদার শব্দটির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কথা স্বীকার করে নিয়েও এই মত পোষন করেন যে,"জমিনদার বলতে বুঝাত সামন্ত প্রধানদের এবং সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না"।[৪] পি. শরন, মোরল্যান্ডের মত সামন্ত প্রধানদের জমিনদার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্ত সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনে জমিনদার শ্রেণীর অস্তিত্বকে তিনি উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।[৫] একথা সত্য যে, মুঘল আমলে জমিনদার কথাটি যে সাধারণভাবে সামন্ত প্রধানদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্ত এটিই তার সামগ্রিক বা প্রকৃত অর্থ নয়। কারণ মুঘল ভারতের জমিনদারী

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে একটি ব্যাপক অর্থে, যেখানে জমিনদার শ্রেণীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্বত্ব ও শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও শ্রেণী হিসাবে তাঁদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। সুতরাং, করদ রাজ্যগুলোতে এবং বাইরের নিয়মিত প্রশাসনভুক্ত অঞ্চলেও তথাকথিত জমিনদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল ।[৬] সামন্ত প্রধান ও জমিনদারদের অভেদ সম্পর্ক সম্বন্ধে ভুল ধারণার পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে ব্লাকম্যান কৃত 'আইন- ই-আকবরীর' পরিসংখ্যানগত তথ্যের মারাত্মক ভুল উপস্থাপনা । ব্লকমানকৃত সংস্করনে বারটি প্রদেশের বিবরনে প্রদত্ত পরিসংখ্যানে মূল সারনি আকারে প্রদত্ত তথ্যে শুধুমাত্র মূল সারনির স্তম্ভগুলোই বাদ দেয়া হয়নি, বিনা ব্যাখ্যায় স্তম্ভশীর্ষও বাদ দেয়া হয়েছে।[৭] সুতরাং, জমিনদার শব্দটি শুধুমাত্র সামন্ত প্রধান অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল না। কাজেই সামন্ত প্রধানদের সাথে সাথে সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনেও জমিনদার নামধারী শ্রেণীর অবস্থা, অবস্থান ও অধিকার গভীরভাবে অন্বেষন করতে হবে ।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমসাময়িক তথ্যসূত্র ও ঐতিহাসিক দলিলে জমিনদারের কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট নেই। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রামাণাদির 'ভিত্তিতে আনুমানিক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব।'জমিনদার' একটি ফার্সী শব্দ, এর অর্থ 'যার জমি আছে'। ফার্সী শব্দ হলেও এর উৎপত্তি স্থল ভারত বলে ইরফান হাবিব মনে করেন।[৮] বারানী ও আফিফের বিবরনীর উদ্ধৃতি দিয়ে মোরল্যান্ড মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতে চৌদ্দ শতকে এই শব্দটির উৎপত্তি।[৯] আবুল ফজল প্রায়ই জমিনদারী শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'বূমী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'বূম' শব্দের অর্থ জমি, অবশ্য সমকালীন ফার্সী ভাষায় এই শব্দটি কোথাও পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বস্তুতঃ কালক্রমে ভারতে জমিনদারী শব্দটি বহুল প্রচলিত হয়ে গেলেও এর প্রতিশব্দ হিসাবে আরো বহু শব্দ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল। যেমন, অযোধ্যায় 'সতারহী' ও 'বিস্বী', রাজ্যস্থানে 'ভূমিয়া', আবার ১৭ শতকের শেষ দিকে সারা দেশ জুতেই 'তাল্লুক', আবার তাল্লুকদার বলে এক নতুন শব্দ গুচ্ছের সাক্ষাত পাওয়া যায় ।[১০]

ইরফান হাবিব মনে করেন যে, জমিনদার শব্দের সর্বাধিক ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ হল 'মালিক', কোন কোন নথিতে জমিনদারকে আবার সরাসরি 'মালিক' নামেই অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইংরেজীতে 'প্রাইভেট প্রপার্টি' ও 'মিলকিয়াৎ' এর অর্থ প্রায় অভিন্ন।[১১] মুসলিম আইন 'মালেক' শব্দটির অর্থ সম্পতির অধিকারী । এ প্রেক্ষিতে মুঘল নথিপত্রে সম্ভবত শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমতঃ 'মিলকিয়াৎ' এর (মালিকদের অধিকার) বিশেষ রূপ জমিনদারী, দ্বিতীয়তঃ জমির উপর সব ধরনের 'মিলকিয়াৎ' এর অধিকারের কথা জমিনদার শব্দের মধ্যে নিহিত আছে।[১২] সমসাময়িক বহু নথিপত্রে একই স্বত্বের নাম বুঝাতে মিলকিয়াৎ ও জমিনদার শব্দ দুটিই ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য জমিদারী ছিল এক ধরনের 'মিলকিয়াৎ', আর জমির উপর 'মিলকিয়াৎ' নামের সমস্ত স্বত্বই হলো 'জমিদারী স্বত্ব, এই দুই রকম ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই রূপ পার্থক্য নিরসনে অষ্টাদশ শতকের একজন লেখক 'আনন্দ রাম মুখলিসে'র প্রদত্ত মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "জমিদার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল এমন লোক, যে জমির মালিক (সাহিব ই জমিন) কিন্ত এখন অর্থ দাঁড়াচ্ছে এমন, যে লোক গ্রাম বা শহরের জমির অধিকারী এবং কৃষিকার্যে নিয়োজিত।" সুতরাং, শুধুমাত্র জমির দখলী স্বত্ব বা জমি থাকলেই জমিনদার বলা যাবে না, বরং বিভিন্ন লোকের দখলী জমির উপর এক বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী তাঁকেই জমিনদার বলা যায়। এবং এই ধরনের স্বত্বই জমিনদারী স্বত্ব।[১৪] ইরফান হাবিব তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন যে, অনেক সময়েই চাষীকে মালিক বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও সে জমিনদার না। অধিকন্ত, সমকালীন নথিপত্রে জমিনদারী স্বত্বের অধিনস্থ এলাকার সীমানা যেভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে, জমিনদারের সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামের, জমির নয়। [১৫] বস্তুতঃ জমিনদারের সাথে জমির চেয়ে গ্রামের সংযোগের কথাই বার বার বলা হয়েছে। এই সূত্রেই 'খাজা ইয়াসিন' লিখেছেন "জমিনদারের বিভিন্ন অধিকার হল 'মালিকানা', 'নানকর', 'সির', 'চৌথ' ইত্যাদি।"[১৬] অর্থাৎ, জমিনদারের সঙ্গে কতগুলো বিশেষ দাবী সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলো একটি বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ব। এই শ্রেণীটি

কৃষকের থেকে স্বতন্ত্র এবং কৃষকদের উপরই তাঁদের বিশেষ দাবী প্রয়োগ করে । সাবির্কভাবে সেইসব অর্ধিকার বা সব রকমের 'মিলকিয়াৎ' এর অপর নাম জমিনদারী ।[১৭] বিভিন্ন দিক বিবেচনা করেই ইরফান হাবিব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, "জমিনদারী ছিল চাষীকে বাদ দিয়ে তার উপর তলার এক গ্রামীন শ্রেণীর স্বত্ব । "

এ পর্যন্ত আলোচনায় কৃষক ও জমিনদারের অভিন্ন সম্পর্ক লক্ষ্য করা গিয়েছে। এমন কি জমিন ও কৃষককে বহু নথিপত্রে একই সাথে কৃষক ও জমিনদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার 'মালিক' বলতে জমিনদারকে বুঝাচ্ছে, আবার কৃষককেও বুঝাচ্ছে। কিন্ত শ্রেণী হিসাবে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য ও বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এই পর্যায়ে 'রায়ত' ও 'জমিনদারে'র মধ্যকার বৈশিষ্ট্যগুলো পার্থক্য সহকারে আলোচনা করা যেতে পারে। ইরফান হাবিব লিখেছেন যে, "কোন একটি গ্রামের পুরোঅঞ্চল জুড়ে জমিদারের অধিকার ছিল না। প্রত্যেক জনপদেই এক বিরাট সংখ্যক গ্রামে কোন জমিনদারী স্বত্বই ছিল না।"[১৮] সুতরাং, মুঘল প্রশাসনে দুই ধরনের গ্রাম ছিল-জমিদারী গ্রাম ও 'রায়তী গ্রাম'। 'জমিনদারী গ্রামে' জমিনদারের বিশেষ স্বত্ব বজায় ছিল, অন্যদিকে রায়তী গ্রাম ছিল চাষীকৃত গ্রাম, সেখানে রায়তের অধিকারই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 'রায়তী' ও 'জমিনদারী' গ্রামের মধ্যে এই পার্থক্য সুনির্দিষ্ট না হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।[১৯] একই গ্রামে 'খুদ কাস্ত' এ জমিনদারান' ও 'রায়তী' এই দুই ধরনের স্বত্ব ও অধিকার বিদ্যমান ছিল । 'সিয়াক' নামার উদ্ধৃতি দিয়ে ইরফান হাবিব একই পরগনার 'তাল্লুক' ও 'রাইয়তী' এই দুই ধরনের গ্রাম আবিস্কার করেছেন। এমনিভাবে গুজরাটেও জমি ছিল 'রাইয়তী গ্রাম' ও 'জমিনদারদের তাল্লুক', এই দুইভাগে বিভক্ত ।[২০] ১৯ শতকের গোড়ার দিকেও লেখক মেবারে আলাদা দুই ধরনের গ্রাম দেখেছিলেন। নিস্কর স্বত্বাধিকারী ভূমিয়াদের তিনি অন্য জায়গায় জমিনদারদের সাথে অভিন্ন করে ফেলেছেন।[২১] বস্তুতঃ জমিনদার ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের প্রশ্নে ইরফান হাবিব সম্ভবত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলেন যে, "সব গ্রামই যদি হয় জমিনদারী, নয়তো রাইয়তী হয়ে থাকে, তবে ধরে নেয়া যায় যে জমিনদার ও চাষীদের 'মিলকিয়াৎ' স্বত্ব ছিল পরস্পর নিরপেক্ষ।"[২২] রায়তের সঙ্গে জমিনদারের পার্থক্য অধিকার সংক্রান্ত। কৃষক বহু জায়গায় মালিক বলে উল্লেখিত হলেও একমাত্র সেইসব কৃষককেই জমিনদার বলা যায়, যাদের গ্রামের উপর কোন রকম 'মিলকিয়াৎ' অধিকার আছে।[২৩] যে 'রায়ত' কোন বিশেষ ধরনের অধিকারের দাবীদার নয়, অর্থাৎ, ভুমির দখলী স্বত্ব ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুযোগ সুবিধার অধিকারী নয়, এমন সাধারণ কৃষক জমিনদার শ্রেণীভুক্ত নয়। এন. এ. সিদ্দিকী তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, "সাধারণত জমিনদার নিজে জমির চাষাবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।" কিন্ত এন. এ. সিদ্দিকীর উল্লিখিত মতের যথেষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেই জমিনদারের ক্ষমতা ও ভিত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, "কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষকের উপর তাঁর দাবীর ভিত্তি হল জমিনদারী স্বত্ব, যার ফলে তিনি 'নানকার' জমি ভোগ করতেন।"[২৫] সুতরাং, জমি ও তাঁর ফল ভোগকারীর উচ্চতম যে সব বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত ছিল জমিনদারী সংস্থা তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করত। বস্তুতঃ জমিনদারী স্বত্ব ও দাবীগুলো একটি স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত ছিল এবং বংশানুক্রমে তা ভোগ করার অধিকার ছিল। বাদশাহী সরাসরি প্রশাসনভুক্ত অঞ্চলে জমিনদারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার সময় জমিনদার ও রায়তের মধ্যকার ভিন্ন পার্থক্য ও অধিকার এবং কর্তব্যের ব্যবধান বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

মুঘল রাষ্ট্র ও সমাজ বিকাশের সঠিক স্বরূপ আবিস্কার করতে হলে সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে অন্বেষন করতে হবে। এ পর্যায়ে সামাজিক শক্তি হিসাবে জমিনদার শ্রেণীর যথার্থ ভূমিকা এর ঐতিহাসিক বিকাশক্রমেই খুঁজে দেখতে হবে। ইরফান হাবিব তাঁর গবেষনায় "গোষ্ঠী" বা "কওম"চেতনার এক বিশেষ স্তরে জমিনদারী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৬] বস্তুতঃ সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ শ্রেণী হিসাবে জমিনদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আর সামাজিক শক্তিগুলোই এর জন্ম দিয়েছিল। ইরফান হাবিব

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় কিংবদন্তী ও ইতিহাস চেতনায় আশ্রয় নিয়ে জমিনদার শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এক ধরনের ধারণা উপস্থিত করেছেন। তার বর্ণনা এই রকম, "প্রথমে কোন জাত বা গোষ্ঠীর লোক এক জায়গায় গেড়ে বসে। যে চাষীরা সেখানে আগেই বসত করেছিল তাঁদের উপর এরা আধিপত্য বিস্তার করে, কখনো হয়ত এরা নিজেরাই চাষী। তারপর আরেকটি গোষ্ঠী একে বারে গোড়া থেকেও যদি নাও হয়, তবুও এই প্রক্রিয়ার কোন এক স্তরে বিজয়ী "কওম" এর আধিপত্যই জমিনদারী স্বত্ব হিসাবে দানা বাঁধে। সেই "কওম" এর প্রথম সারির লোকদের অধিকারে থাকে বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ। মনে হয় এই প্রক্রিয়া চলছিল মুঘল আমল অবধি।"[২৭] ইরফান হাবিব আবিস্কার করেন যে ১৮ শতকের কতিপয় লেখক বলেন যে, এই স্বত্বের উৎস ছিল মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে। সুলতানরা কিছু কিছু জমির জমিনদারী স্বীকার করে থাকতে পারেন, কখনো কখনো তা হয়ত মঞ্জুরও করেছিলেন। তবুও মনে হয় তাঁদের উদ্যোগের অপেক্ষা না রেখেই এই স্বত্বটির সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ হাবিব জমিনদারী শ্রেণীর উদ্ভবের সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন একটা নজর দেননি। এই পর্যায়ে জমিনদারী সংস্থার উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিক মতামত কি তা দেখতে একটু গোড়ার দিকে নজর দেয়া যেতে পারে।[২৮] তবে সামাজিক শক্তি কাঠামোয় শ্রেণী হিসাবে জমিনদার শ্রেণীর উত্থান মুঘল যুগেই প্রথম দৃষ্টি গোচর হয়। দিল্লীর সুলতানী আমলে এদের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। সুলতানী শাসনে "ইকতা" ব্যবস্থায় জমিনদারী ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও "ইকতা" ব্যবস্থার সাথে জমিনদারী ব্যবস্থার বহু পার্থক্য রয়েছে। কেননা, একটা সামাজিক শক্তির উত্থান হয় সমাজের একান্ত প্রয়োজনেই, সমাজের অভ্যন্তর হতে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। তেমনি জমিনদারী ব্যবস্থাও দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করেছিল। কখন কিভাবে এই জমিনদারী ব্যবস্থার উদ্ভব হলো তা আজও অনাবিস্কৃত ও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। আর ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।[২৯] গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের সাথে সাথেই সর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব হয় । ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেই জমিনদার শ্রেনীর উৎপত্তি জড়িত।[৩০] সামাজিক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই অবগত যে, গুপ্তযুগের পরে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয়। এই সময় দেখা যায় যে, রোমান বাণিজ্যের অবসান ঘটচ্ছে। বন্দর ধবংস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং শ্রেষ্ঠী ও করিগররা তাদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি হারাচ্ছে। শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির সাথে সাথে সামাজিক স্তরেও মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টম শতক থেকে এয়োদশ শতক পর্যন্ত বাণিজ্যিক বিপর্যয়ে স্বর্ণ মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পায় । বণিককুল তাঁদের প্রতিপত্তি হায়ায়, আন্তঃ বাণিজ্যের অবনতির সাথে সাথে বৌদ্ধ স্তূপগুলোও তাদের বাঁচার তাগিদে ক্রমশ ভূমিদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[৩১] এই সময়কার অর্থনৈতিক বিপর্যয় ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত পতন, অভ্যন্তরীন বিভিন্ন বন্দরের উত্থান পতন ইত্যাদি ঘটনা পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপিতে লক্ষ্য করা যায় যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে বনিকদের স্থলে ক্রমে ভু-স্বামীরা উঠে আসছে। কারিগর ও বণিকশ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি হারানো এবং ভূমিজ গোষ্ঠীর উদ্ভব ক্রমশঃ সমাজকে কৃষি নির্ভর করেছে।[৩২] এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সংযোজিত হয়ে জমিনদার শ্রেণীর উত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে । কারণ, গুপ্তযুগের পতনের পর কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। ;পাল', 'রাষ্ট্রকুট', 'প্রতিহার' ইত্যাদি উদীয়মান শক্তি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের শক্তিকে স্থাপন করে। কালক্রমে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলো আরও ক্ষুদ্র স্থানিক শক্তিতে পরিণত হয়ে পড়ে। পাল আমলেই বাংলায় 'চন্দ্র' ও 'বর্ম' বংশ রাঢ় ও বঙ্গে স্বতন্ত্ররাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে প্রতিহার রাজ্য ভেঙ্গে 'চান্দল' ও 'হিন্দশাহী' রাজ বংশ এবং চালুক্য সাম্রাজ্য থেকে হোয়সল, কালচুরী ও কাকাতীয় রাজত্বের উদ্ভব হয় । আর স্থানীয় ও সীমিত আঞ্চলিক কর্তৃত্বের আর্দশে নিমগ্ন এই রাজ্যগুলো এলাকার সীমিত দ্বন্দ্ব সংঘাতে সর্বদাই লিপ্ত ছিল। সীমিত এলাকায় সীমিত আয়ের আধিকার এই সকল রাজ্যগুলোর পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসন বজায় রাখা ছিল দুস্কর । ফলে প্রাথমিক উৎপাদকের কাছ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্তে এক মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।[৩৩] ফলে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে এই সব শ্রেণীর সাথে বুঝাপড়ায় আসতে হতো। গৌতম ভদ্র মনে করেন, "'মন্ডলিক' প্রভৃতি গ্রামীন নেতৃত্ব এই সময়েই নিজেদের শিকড় অনেক গভীরে প্রসারিত করেছিল এবং এদের উৎপাটিত করা সকলের পক্ষেই শক্ত হয়ে উঠেছিল।"[৩৪] বারানী এদেরকে 'খুৎ' ও 'মুকাদ্দাম' বলে অভিহিত করেছেন, যাদের সম্বন্ধে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী কঠোর মনোভাব পোষন করতেন।[৩৫] জমিনদারী ব্যবস্থার বিচিত্র প্রকৃতি, অবস্থান ও স্বরূপ নিয়ে গবেষক মহলে ব্যাপক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ইরফান হাবিব অধ্যাবসায় ও গভীর ধীশক্তির সাহায্যে প্রাপ্ত উপাত্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে এই জমিনদার শ্রেণীর বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন ,জমিনদারী স্বত্ব যেভাবে এসেছিল তারই ফলে নানা জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে জমিনদারী অধিকারের আঞ্চলিক বিভাগ দেখা দেয়।[৩৬] ক্রমে জমিনদারী ব্যবস্থা স্থায়ী বংশানুক্রমিক রূপদান এবং জমির বেচা-কেনা শুরু হয়। গোটা মুঘল শাসনেই জমিনদারী স্বত্ব হস্তান্তরের ঘটনা প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে যেমন গতিশীলতা সৃষ্টি করে, সেই সাথে এতে অধিক অব্যবস্থাও দেখা দেয়। ইরফান হাবিব মনে করেন পরবর্তীকালে টাকার বদৌলতে "কওম" ভিত্তিতে গড়ে ওঠা "জমিনদারী" স্বত্ব অর্থশালী উদীয়মান নতুন অভিজাতদের দুয়ার খুলে দেয়।[৩৭] ফলে জমিনদারী স্বত্বে নতুন এক শ্রেণীর লোকের আগমন ঘটে, যারা ক্রয়সুত্রে জমিনদারী স্বত্বের অধিকারী হয়। জমিনদারী স্বত্ব কিভাবে বিক্রেতার কাছ থেকে অন্য "কওম" এর, এমনকি বহু ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের লোকের কাছে চলে যেত, এমনকি, এলাহাবাদে রক্ষিত বিক্রয় কবলাগুলোতে, আইনের অন্যান্য নথিতে তার প্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে।[৩৮] বস্তুতঃ জমিনদারী শ্রেণী ছিল নীচুতলা থেকে উত্থিত গ্রাম ও ভূমিকেন্দ্রীক একটি স্থানীয় শক্তি। সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই ঐতিহাসিকভাবে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ফলে দিল্লীর সুলতানরা "ইকতা" ব্যবস্থার পাশাপাশি এই সামাজিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কেননা, উপর থেকে যত শক্তিই আসুক না কেন, নীচুতলার এই শক্তিকে অস্বীকার করার কোন উপায় ছিলনা। সম্ভবত দিল্লীর সুলতানী শাসনের ঐতিহ্য থেকে মুঘলরা এই সত্যকে ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই সব স্থানীয় বিক্ষিপ্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্থানীয় শক্তিকে প্রশাসনযন্ত্রে স্থান দেয়ার উদ্দ্যেশেই মুঘলরা 'মনসব' বিতরণ, জমিনদারদের অধিকারকে নানাভাবে স্বীকার করে নেযার চেষ্টা করেছিলেন[৩৯] ইরফান হাবিব বাদশাহী প্রশাসন সূত্রে প্রদত্ত জমিনদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও তিনি ঐতিহাসিক ও প্রথাগত পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুতারোপ করেননি। আলোচনার ঘাটতির এই দিকটি এখন পূরন করা যেতে পারে। আমরা গ্রামীন সমাজ ও কৃষক সম্পর্কিত অধ্যায়ে বলেছি যে, মুঘল ভারতে আবাদি ভূমির প্রাচুর্য চাষীর অভাবে সংকট সৃষ্টি করত। এমতাবস্থায় বিশেষ যোগ্যতা ও কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপও জমিনদারীর উদ্ভব হতো যেমন, বহু সময় বহু পরিবার বন কেটে বসত গড়ে তুলে যে আবাদি ভূমির জন্ম দিত রাষ্ট্রশক্তি উক্ত আবাদি ভূমির উপর তাঁদের স্বতন্ত্র অধিকার ও বিশেষ দাবী স্বীকার করে নিত। আনুমানিক ষোড়শ শতকে 'কোংকনের' রত্নগিরি অঞ্চলে 'মারুদা'' গ্রামের এই জাতীয় আবাদ হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়।[৪০] আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র মনে করেন, "প্রসারিত বর্ণ সমাজ কখনো কখনো তাঁদের অধিকতর বিস্তারিত করে সেই অঞ্চলের পুরানো গোষ্ঠীদের উপর নিজেদের স্বতন্ত্র দাবী স্থাপন করে -নিজেদের জমিনদার শ্রেণী ভুক্তকরে।"[৪১] ষোড়শ শতকে 'ফরাস্কাবাদ' অঞ্চলে প্রাপ্ত দলিল থেকে দেখা যায় যে 'কাচ্চি' ও 'চামাররা' গ্রামের প্রাচীন অর্ধিকর্তা ছিল। পরবর্তীকালে তাঁদের অধিকার 'শেখজাদা' ও হিন্দু উচ্চ বর্নের কাছে হস্তান্তরিত হয়।[৪২] এলাহাবাদের পরগনা 'বারায়' 'ভার' উপজাতিকে রাজপুতরা বিতাড়িত করে নিজেদের "জমিনদারী"কায়েম করে । 'উনাওতে' 'কোয়েরী' ও 'লোধদের' তাড়িয়ে 'ওহিলোট' ও 'চান্দেল্লরা' তাঁদের অধিকার কায়েম করে।[৪৩] আবার, মুঘল বাদশাকে সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য সহযোগিতা করেও অনেকে জমিনদারী অধিকার লাভ করে, ফলে নব বিজিত অঞ্চলে জমিনদারী অধিকার বিস্তৃতি লাভ করে।'সুসঙ্গ' জমিনদাররা শাহ্জাহানের শাসনামলে আসামের গোয়াল পাড়ার জমিনদারী এই প্রক্রিয়ায় শুরু হয়। 'বর্ধমান' জমিনদারের আদিপুরুষরা মহাজনী ব্যবসা করতেন। 'আবুরায়' এক সংকটাপন্ন অবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামরত মুঘল সৈন্যকে খাদ্য সমবরাহ করে কানুনগোগিরি মানকৃষ্ণ নগরের রাজপরিবার স্থাপন করেন।[৪৪] ১৬৮০ সনে রাজস্থানে প্রাপ্ত ফরমানে জানা যায় পরগনা মলপুরের জমিনদারী হরি সিংকে দেয়া হচ্ছে, কারণ ঐ অঞ্চলে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁকে জমিনদার হিসাবে ঐ অঞ্চলের 'মুকাদ্দামরা'ও স্বীকার করেছে।[৪৫] শ্রেণী হিসাবে জমিনদারদের মধ্যে নানা রকমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইরফান হাবিব এই শ্রেণীর অধিকারের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে গ্রহনযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মনে করেন, "জমিনদারী চাষীদের উপর গ্রামের উচ্চকোট মানুষের স্বত্ব। স্বাভাবিকভাবেই জমিনদারী স্বত্বের অধিকারীর একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়াই ছিল এই স্বত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । যেহেতু এটি ছিল মূলত জমি সংক্রান্ত অধিকার, তাই এর অধিকারী জমির উৎপন্নের একটা ভাগ পেত।"[৪৬] বস্তুতঃ জমিনদারী ছিল এক ধরনের বিশেষ অধিকার, যা জমিনদারী এলাকার জমির উৎপন্নের উপর কোন স্বত্বাধিকার বুঝাত না। জমিনদারী প্রতিষ্ঠানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা মুঘল প্রশাসনে এই শ্রেণীর সত্যিকার অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে। ইরফান হাবিব জমিনদারীর বংশানুক্রমিক স্বত্বাধিকারের কথা উল্লেখ করে জমিনদারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জমি ভাগাভাগি ও এই স্বত্ব বিক্রয়ের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। বস্তুতঃ জমিনদারী অধিকার বিক্রয়ের যোগ্য ছিল এবং বংশানুক্রমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্ত লক্ষনই এর মধ্যে নিহিত ছিল।[৪৭] এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেই নানা জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে জমিনদারী অধিকারের আঞ্চলিক বিভাগ দেখা দেয়। জমিনদারী রক্ষায় 'কওম' এর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, সশস্ত্র বাহিনীই জমিনদারী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষনাবেক্ষনে প্রথম ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হিসাবে দেখা দেয়। বস্তুতঃ জমিনদারীর আসল ক্ষমতা নিহিত ছিল লক্ষ লক্ষ আপন "কওমের" সশস্ত্র অনুচরের মধ্যে।[৪৮] জমিনদারী স্বত্বের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল একদিকে জমির উপর জমিনদারদের এক ধরনের বিশেষ অধিকার আছে। অন্যদিকে বহু জায়গায় জমিনদাররা গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ করে। আবার, তাঁরাই কৃষকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ রক্ষার অন্যতম প্রধান সূত্র । এই অধিকার স্বীকৃত ও স্বতন্ত্র। কখনো যদি কোন জমিনদার কোন গ্রামের বা অঞ্চলের নির্দিষ্ট রাজস্ব রাষ্ট্রের পক্ষে সংগ্রহ না করে, তবুও সে তাঁর বিশেষ মালিকানা অধিকারের আয় থেকে বঞ্চিত হয় না। তখন রাষ্ট্র নিজে রাজস্ব সংগ্রহ করলেও জমিনদারকে কোন না কোন উদ্বৃত্ত শ্রমজাত সম্পদের কিছু অংশ প্রদান করে। সুতরাং, আমরা জমিতে জমিনদারের যৌথ অধিকার লক্ষ্য করি।[৪৯] ইরফান হাবিব জমিনদারী অধিকার বংশানুক্রমিক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হত বলে যে মত প্রকাশ করেছেন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নথিপত্রে প্রাপ্ত প্রামাণিকতায় তা উপস্থিত করা হয়েছে। জমিনদারী স্বত্বে ব্যাক্তিগত সম্পত্তির লক্ষন সম্পর্কে সন্দিহান হলেও গৌতম ভদ্র মন্তব্য করেছেন যে, "জমিনদারী অধিকার বিক্রয়ের যোগ্য ছিল এবং বংশানুক্রমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্ত লক্ষনই এর মধ্যে ছিল" ।[৫০] কিন্ত গৌতম ভদ্রের এই মন্তব্যও নির্বিচারের গ্রহন করা যায় না। একথা সত্যি যে, জমিনদারী স্বত্ব ও অধিকারের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রায় সকল লক্ষনই লক্ষ্য করা যায়। তবে ব্যতিক্রমও অসংখ্য। বস্তুতঃ জমিনদারী স্বত্বের ও অধিকারের প্রশ্নে আধুনিক "প্রাইভেট প্রোপার্টি " ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা আরোপ না করে একে তৎকালীন বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করলে ঐতিহাসিক মূল্যায়নে যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইরফান হাবিব মুঘল ভারতে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত "জমিনদারী" ব্যবস্থার বিবরণ ও পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে একটি জটিল পন্থা অবলম্বন করেছেন। অবশ্য এই ব্যবস্থার ব্যাপক তথ্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এর বিকল্পও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি আলোচনার শুরুতেই জমিনদারী "স্বত্বের স্বরূপ" এই শিরোনামের-অধ্যায়ে জমিনদারী ব্যবস্থার প্রকৃতি, এই স্বত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অধিকারের ধরন ও সীমা, মুঘল বাদশাহের সাথে এই সংস্থার সম্পর্ক, জমিনদারী স্বত্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের অধিকার, এর সীমা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়েই যথাসম্ভবব তিনি জমিনদারী ব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন। এর পরের উপাধ্যায়ে তিনি "জমিনদার শ্রেণীর উদ্ভব, গঠন ও শক্তি এই শিরোনামে উদ্ভব ও বিকাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে এর উপর

Dhaka University Institutional Repository

আলোকপাত করলেও, এই বিষয়ের উপর পরিস্কার ধারণা গড়ে ওঠেনি। এর পরেই ইরফান হাবিব "বাদশাহী প্রশাসন ও জমিনদার" এই শিরোনামে এক উপাধ্যায়ে সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর জমিনদারী স্বত্বের প্রকৃতি, পরিধি ও কর্মতৎপরতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে আলোচনায় তিনি বেশ স্পষ্ট হতে পেরেছেন। সর্বশেষ উপাধ্যায়ে প্রশাসন বহির্ভূত বাদশাহী প্রশাসনের সীমায় বিদ্যমান বিভিন্ন রাজা, রাও, রানা, সর্দার,ছোটরাজা, রানী,'রাওয়া' ইত্যাদির মত কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাঁদের পরিচয় দিচ্ছে। তবে, জমিনদার ও এই সমস্ত প্রধানদের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কতিপয় স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রধানরা সাধারণত জমিনদারদের চেয়ে বড় সামরিক ক্ষমতা ও অঞ্চল ভোগ করত,-তফাৎ দেখা যেত বাদশাহী শক্তির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে । প্রাধানদের দেয়া হয়েছিল স্বায়ত্ব শাসন, কিন্ত সাধারণ জমিনদাররা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাদশাহের সম্পন্ন প্রজামাত্র।[৫২] এ পর্যায়ে এই সকল প্রধানদের কিভাবে মনসব, জয়গীর পেশকাশের বিনিময়ে বিশেষ স্বীকৃতি,"ওয়াতন" ইত্যাদি পদ ও স্বীকৃতির বিনিময়ে বাদশাহী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়েছিল তার বিবরণ দিয়ে এই ব্যবস্থাকে জমিনদারী ব্যবস্থার সমার্থক বিবেচনা করে আলোচনা করেছেন। জমিনদারী ব্যবস্থার সাথে মনসবদারী ও জায়গীরদারী ব্যবস্থার সম্পর্ক আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যেতে পারে। এপর্যায়ে একটু ভিন্নভাবে সরল আলোচনায় জমিনদারের শ্রেণী বিন্যাসের বৈচিত্র আলোচনায় স্থান পেয়েছে। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে ইরফান হাবিব সরাসরি 'বাদশাহী' প্রশাসন' ও "স্বয়ং শাসিত প্রধান" এই দুই পর্যায়ে জমিনদারদের এক ব্যাপক স্তর বিন্যাস নির্দেশ করেছেন । তিনি তথ্য ও উপাত্তের এক ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়ে শ্রেণীবিন্যাস ও স্তরক্রমে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছেন তাতে এক নজরে শ্রেনী হিসাবে জমিনদারদের পরিচয় আবিস্কার করা কঠিন। তবে, কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এক নজরে জমিনদার শ্রেণীর একটি পরিচয় দেয়া যেতে পারে।

স্বাভাবিক কারণেই জমিনদার শ্রেণীর মধ্যে স্তর বিন্যাস ছিল। একদিকে ছিল ভূম্যধিকারীরা। তাঁরা স্থানীয়ভাবে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিল, অপর দিকে ছিল প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদে জমিনদাররা, যারা একদিকে কৃষক ও অন্যদিকে বড় জমিনদার। আর এদের মধ্যে আরেক জাতীয় অর্ন্তবর্তী জমিনদারদের অস্তিত্ব ছিল। বহুক্ষেত্রে এই তিনটি স্তরের মধ্যে সংমিশ্রন ও সংযোগ ছিল। কিন্ত তা সত্ত্বেও জমিনদার শ্রেণীর মধ্যে এই তিন স্তরের অবস্থিতি সুস্পষ্ট।[৫৩] সাধারণত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন নানা ধরনের সামন্ত মহারাজারা। ইরফান হাবিবের মতে, "এরা 'রাজা' 'রানা' রায় ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।" এই সকল সামন্ত রাজারা নিজেদের রাজ্যে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। কারণ, অভ্যন্তরীন ব্যাপার তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত চালাতে পারতেন। কোন প্রধানের প্রজারা বাদশাহী দরবারে প্রধানের বিরুদ্ধে বা অন্য কোন বিষয়ে নালিশ জানিয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই ।[৫৪] এরূপ ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটরা জায়গীর বা মনসব বিতরণের মাধ্যমে এদের মুঘল শাসনে অঙ্গীভূত করতেন। [৫৫] দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় উওরাধিকার সূত্রে হস্তক্ষেপ করে মুঘল সম্রাট নিজের অধিকার বজায় রাখতে চাইতেন। জাহাঙ্গীর বিকানীর রাজার মৃত্যুর পর কঠিন হস্তে নানা দাবীকে নাকচ করে বড় ছেলেকে রাজা বলে স্বীকার করে ছিলেন।[৫৬] আবার মাড়য়ারের ক্ষেত্রে উল্টা নীতি অনুসরন করে যশোবন্ত সিংহকে স্বীকার করলেন। একই ঘটনায় আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের দাবীর বিপক্ষে ইন্দর সিংহের অনুকূলে স্বীকার করে নেন।[৫৭] বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও দরবারে সামন্ত রাজাদের একজন প্রতিনিধি হাজির থাকার নিয়ম সামন্ত নৃপতিদের উপর মুঘলদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তৃতীয়তঃ অনেক সময় মুঘলরা সরাসরিভাবে বহু সামন্ত রাজার অধিনস্ত সর্দারদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত। মাড়য়ারের দুর্গাদাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ্যযোগ্য। চতুর্থতঃ বেশীর ভাগ সামন্ত রাজাই ছিল পেশকাশী। যে সকল সামন্ত বা জমিনদার মুঘল সম্রাটকে পেশকাশ অথবা কর প্রদান করে জমিনদারী স্বত্বের অধিকারী হতেন; অন্য কথায় যারা নিজেদের বিশেষ অধিকার পেশকাশ প্রদান করার মাধ্যমে বজায় রাখতেন তাঁদের পেশকাশী জমিনদারদের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তৎকালে তিন প্রকারের পেশকাশী জমিনদারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যথা-একটি সরকারের জমিনদার; একটি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ পরগনা অথবা কিছু সংখ্যক গ্রাম সমষ্টির জমিনদার (ইজমি জমিনদার) এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক গ্রামের ক্ষুদ্র জমিনদার। এই তিন শ্রেণীর জমিনদারদের আপাতঃ দৃষ্টিতে সম-পর্যায়ভুক্ত মনে হলেও বাস্তবে এর ভিন্ন অবস্থা বর্তমান ছিল। কারণ, সরকারের জমিনদারের তুলনায় পরগনা জমিনদারের উপর সরকারের প্রভাব ও আধিপত্য অনেক বেশী ছিল।[৫৮] সম্ভবতঃ সরকার স্তরের জমিনদারদের স্বায়ত্বশাসন ছিল এবং মুঘল সরকার সাধারণত তাঁদের অভ্যন্তরীন শাসন পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করত না। তবে পরগনা জমিনদারের বাদশাহী প্রশাসনের বেশ নিয়ন্ত্রন ছিল।

সব পেশকাশী জমিনদারই যে রাজা উপাধী ধারণ করতেন অথবা সকলেই হিন্দু ছিলেন তা নিশ্চিত করা যায় না।[৫৯] স্বাভাবিকভাবেই একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, প্রতিটি পেশকারী জমিনদারী বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ইরফান হাবিব মনে করেন, "জমিনদারী ছিল বিক্রয়, হস্তান্তর ও একটি বন্টন যোগ্য অধিকার যা স্বত্বাধীকারী ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারত।"[৬০] সুতরাং, দেখা যায় যে, একদিকে কিছু অথবা অধিকাংশ জমিনদারী অক্ষত অবস্থায় একই রাজ্য হিসাবে বংশ পরম্পরায় একই পরিবারের কর্তৃত্বে থেকে যেত, আবার অনেক জমিনদারী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বিভাজ্য বলে গন্য হত। দৃশ্যতঃ বুঝা যায় যে সকল জমিনদারী পেশকাশ প্রমাণ করত তাঁদেরও একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং জমিনদার বিশেষের উৎপত্তি ও তার ঐতিহাসিক পরিণতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[৬১] এই শ্রেণীর জমিনদারীর কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ এখানে রাজস্ব ধার্য করার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী গ্রামের কৃষি ভূমি জরিপ করত না। দ্বিতীয়ত, জমিনদার রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল-পত্র স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ কর্মচারীর হাতে অর্পন করত না। দ্বিতীয়ত, জমিনদারের দেয় পেশকাশ কখনো নির্দিষ্ট পরিমাণে ধার্য করা হত, আবার কখনো তা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী ও জমিনদারের মধ্যে দর কষাকষির ভিত্তিতে নির্ধারিত হত।

এই পর্যায়ের আলোচনাতেই জমিনদারী শব্দের বিকল্প 'তালুকদার' এই প্রতিষ্ঠান এবং এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। কারণ, এক্ষেত্রে ইরফান হাবিবের মতামতের সাথে পরবর্তীকালের গবেষকদের বেশ কিছু নতুন ধারণা যুক্ত হয়েছে, যদিও সেগুলো কোন মোড় পরিবর্তনকারী চিন্তার ফসল নয়। ইরফান হাবিব মনে করেন যে,"১৭ শতকের শেষ ভাগে ভূমি রাজস্ব দাতা হিসাবে জমিনদারকে বুঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল। আর শব্দটি হল "তালুকদার"।[৬২] 'তাল্লুক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সংযোগ; কিন্ত ব্যবহারিক অর্থ দাড়িয়ে ছিল যে জমি বা এলাকার উপর কোন ধরনের স্বত্ব দাবী করা হয়। ইরফান হাবিব বলেন, "১৮শতকে 'তাল্লুকদার' এর সংজ্ঞায় দুটি আলাদা বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তালুকদার তিনি নেহাৎ এক ধরনের ইজারাদার, আর দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন ক্ষুদে জমিনদার।" বস্তুতঃ তাল্লুকদার মানে সেই জমিনদার যে শুধু নিজের জমিনদারীই নয়, অন্য লোকের জমিনদারীর রাজস্ব দিতে চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং, এমন কোন কথা নেই যে "তালুকদার "যে এলাকার রাজস্ব দেয় সে নিজেই পুরোটার জমিনদার হবে, সে ছিল তার একটি অংশের জমিনদার। বাকী অংশের জন্য সে নেহাৎই মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যব্যক্তি। সুতরাং, "তাল্লুকদার" হওয়া মানে সে এলাকার একজন ক্ষুদে জমিনদার হওয়া। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারত।[৬৩]

পরবর্তীকালের গবেষণায় বিষয়টি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ 'তাল্লুকদার বলতে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সৃষ্ট কোন প্রশাসনিক মন্ডলী, অথবা সাম্প্রতিককালে ক্রীত জমিনদারী অথবা এমন এক জমির স্বত্ব, যার অধিকারী অন্যান্য জমিনদারের তরফ হতে ভূমি রাজস্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন।[৬৪] সমকালীন প্রাপ্ত বিভিন্ন ফারসী উপাত্তের ভিত্তিতে এন, এ, সিদ্দিকী বলেন যে, "গুজরাটে 'তাল্লুক' বলতে বুঝাত সেই সব গ্রামের সীমানা যে সব গ্রাম কোলি ও রাজপুত প্রধানরা তাদের 'বানথ' জমি হিসাবে রাখতেন। বাংলায় 'তাল্লুক'বলতে ক্ষুদ্র

Dhaka University Institutional Repository

জমিনদারী ও তালুকদার বলতে ক্ষুদ্র জমিনদারকে বুঝাত। মধ্য প্রদেশে সরকার সৃষ্ট প্রশাসনিক বিভাগকে 'তালুক' বলা হত।" [৬৫] অযোধ্যায় তালুকদার হল সেই সমস্ত জমিনদার, যারা অন্য জমিনদারের হয়ে সরকারকে খাজনা দিত। তালুকদারী ব্যবস্থাকে অনেকটা ইজারদারী ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হলেও এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, ইজারাদার জমিনদার নয় এবং তাঁর অধিকার বংশানুক্রমিক নয়। ইজারাদার যেখানে সরকারের প্রতিনিধি এবং অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের বাইরের লোক, তালুকদার সেখানে জমিনদারের প্রতিনিধি। সাধারণতঃ জমিনদারী হিসাবে বিভিন্ন অংশের ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয় থেকে এই মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উদ্ভব হয়।[৬৬] বস্তুতঃ তালুকদার ও জমিনদারের অধিকারের ধরন ছিল একই, কেবল তালুকদারের সব সময় রাষ্ট্রীয় অনুমোদন বা সনদের দরকার পড়ত না । তালুকদারী সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-'হুজুরী' ও 'মাজকুরী'।'হুজুরী' তালুকের রাজস্ব সরাসরি সরকারকে প্রদান করা হত এবং 'মাজকুরী' তালুকের রাজস্ব জমিনদারী বা ভূ-স্বামী এই ধরণের কোন উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদান করা হত।[৬৭] যথা সময়ে রাজস্ব প্রদান করলে মাজকুরী তালুক হস্তান্তর করা বা বংশ পরম্পরায় ভোগ করা চলত, তবে উত্তরাধিকারী না থাকলে তা ভূ-স্বামীর দখলে চলে যেত।

স্বয়ংশাসিত প্রাধান বা সামন্ত রাজারা নিজেদের এলাকার অভ্যন্তরীন ব্যাপারে প্রায় স্বাধীনই ছিলেন। আইন শৃংখলা বজায় রেখে এবং মুঘল শাসনের কাছে সামরিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে আনুগত্য স্বীকার করলে নিজেদের 'ওয়াতন'জায়গীরে উদ্বৃত্ত সম্পদ বন্টনের নিরংকুশ অধিকার তাঁদের ছিল।[৬৮] সেই সম্পদের সিংহভাগ অন্যান্য-জমিনদারের তালুকের ন্যায় রাষ্ট্র দখল করত না। ফলে সামন্ত রাজাদের উদ্বৃত্ত বন্টন ও নিয়ন্ত্রনে "রাষ্ট্রদারী" 'ভাইয়াচারী" 'চিন্যাদারী' ইত্যাদি অংশীদারী স্বত্বের উদ্ভব হয়।

গৌতম ভদ্র দ্বিতীয় শ্রেণীর বা মধ্যবর্তী জমিনদার শ্রেনী সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করেছেন যে, "এরা হচ্ছে প্রাথমিক জমিনদার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র বিশেষ।"[৬৯] ইরফান হাবিব এ শ্রেণীর জমিনদারদের "বাদশাহী প্রশাসন ও জমিনদার" এ শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করলেও মুঘল কৃষি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে এ শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে যথাথ স্পষ্ট হতে পারেননি। রাজস্ব বিষয়ক পুস্তিকাতে অবচেতনভাবে ঢুকে পড়া তথ্য ও অন্যান্য নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি মনে করেন যে, "জমিনদারী স্বত্বের দাবীদার জমিনদারের এলাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে দাখিল করার জন্য জমিনদারকেই ডাকা হত।"[৭০] আকবরের তৈরী 'জবৎ' ব্যবস্থার আওতাধীন প্রদেশ (মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যভাগের বেশীর ভাগ এলাকা) থেকেও জমিনদারের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত। ইতিমধ্যেই তালুকদারী সম্বন্ধে আলোচনাতে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, জমিনদার বা তালুকদারদের বাদশাহী প্রশাসনের রাজস্ব দাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরফান হাবিব বলেন, "কোন জমিনদার বা তালুকদার তাঁর জমিনদারীর অন্তর্গত জমির রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকলে তাঁর ক্ষেত্রে "রাজস্বদাতা" শব্দটি প্রায়াগ করা হয়েছে।"[৭১] পেশকাশ প্রদানকারী জমিনদার ও 'মালওয়াজিব' প্রদানকারী জমিনদারদের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ ছিল। 'মাল-ওয়াজিব' শব্দটির অতি পরিচিত অর্থ রয়েছে। কৃষিকার্যে নিয়োজিত মোট জমির প্রকৃত পরিমাণ অথবা প্রতিটি গ্রামে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হত তাঁর পূবর্তন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হত, তারই নাম 'মালওয়াজিব' ।[৭২] এদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এই অধিকারের সঙ্গে জমির উপরে কোন স্বতন্ত্র অধিকার বা স্বত্বের সম্পর্ক জড়িত ছিল না; বরং এর সঙ্গে জড়িত ছিল সেবার সম্পর্ক। মধ্যযুগীয় দলিলে যাকে বলা হয় 'খিদমৎ'। [৭৩] রাজস্ব সংগ্রহ ও আইন শৃংখলা রক্ষায় এই জমিনদাররা রাষ্ট্রকে সাহায্য করত এবং এর বিনিময়ে তারা নানা রকম সুযোগ সুবিধা পেত এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ ভোগ করত। 'চৌধূরী', 'মুখিয়া', 'মুকদ্দম', 'কানুনগো', 'দেশমুখ', 'দেশাই', 'দেশপান্ডে', 'তালুকদার' ইত্যাদি নামে এই শ্রেণীকে অভিহিত করা হত। সাধারণত, পরগণার ভিত্তিতেই চৌধুরী নির্বাচন করা হত।[৭৪] এন,এ, সিদ্দিকী আজাদ লাইব্রেরীতে রক্ষিত একটি পান্ডুলিপিতে সুবা সম্পর্কীত যে সব পরিসংখ্যান পেয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

তা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "উক্ত পাণ্ডুলিপিতে বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র কলাম আছে, যথা জরিপ, জমি, ভূমি, সিয়ারখুল, যামী ও জমিনদার। বিভিন্ন মহালের জাতগুলোকে জমিনদার শিরোনামায় অন্তভুক্ত করা হয়েছে। এতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আবুল ফজল শুধুমাত্র সেই সব জাতের কথাই উল্লেখ করেছেন, যারা নিজ নিজ মহালে জমিনদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন।"[৭৫] সুতরাং, একথা সহজেই বলা যায় যে, সাম্রাজ্যের সকল মহালেই এমন কি কেন্দ্রের নিকটস্থ মহাল্লা গুলোতেও এই শ্রেণীর জমিনদারের অস্তিত্ব ছিল। কারণ, আকবরের রাজত্বের প্রশাসনিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই সময় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলের 'খালিশা' ভূমিতে রূপান্তর, পরগনার রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি সরকারী আদেশ এবং গ্রামকে একক ধরে রাজস্ব নিরূপন এবং এর সংগ্রহ সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশ হতে অনায়াসেই অনুমান করা যায়, এই সকল মহালে পেশকাশী জমিনদারের বাইরে অন্য এক বিশাল জমিনদার শ্রেণী ছিল, যারা সরকারকে রাজস্ব সংগ্রহে সর্বতোভাবে সাহায্যে করত এবং জমির উপর এদের ভিন্ন রকমের অধিকার ছিল। সরকারের সাথে এদের সম্পর্ক ছিল সেবা বা খেদমতের। এই শ্রেণীর জমিনদারের নানা রকম অধিকারের মধ্যে ছিল: তাঁরা তাঁদের সেবার পরিবর্তে নিজেদের প্রদেয় রাজস্ব থেকে ছাড়, 'আবওয়াব' অংশতঃ নিষ্কর বা লাখেরাজ জমি ইত্যাদি লাভ করত।[৭৬] এই সমস্ত কারণেই ইরফান হাবিব মনে করেন যে, "বাদশাহী প্রশাসনে জমিনদাররা চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে কর্তৃপক্ষের খেদমতে লাগায়। জমিনদারকে তাই প্রধানত দেখা যায় কর্মচারী বা কর আদায়কারীর ভূমিকায়, করতদাতা হিসাবে নয়।"[৭৭] জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর শাসনের এয়োদশ বর্ষে জারি করা এক ফরমানে মুঘল 'সরকার' (বিহার) এর কয়েকটি 'টপ্পায়' জমিনদারী ও 'চৌধুরী' সংক্রান্ত বিষয়ে 'খিদমতে-এ-জমিনদারী' সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জমিনদারী স্বত্ব ছিল মুঘল প্রশাসনে চাকুরী, একট 'পদ' বা 'খিদমত'। কারণ, রাজস্ব আদায় ও দাখিল করার খিদমত বাবদ জমিনদারদের 'নানকার' বলে একটি ভাতা দেয়া হত, হয় দাখিলী রাজস্বেরই একটি অংশ হিসাবে বা জমিনদারদের দেয়া লাখেরাজ জমি হিসাবে।[৭৮] ইরফান হাবিব মনে করেন, "জমিনদারী মানে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে 'এক ধরনের খিদমত' এমন ধারণা করলে পদটি মুলত 'চৌধুরী' পদের খুব কাছাকাছি চলে আসে। রাজস্ব সংগ্রহ যন্ত্রের এক গুরুত্বর্পূন স্থান দখল করে থাকত 'চৌধুরী'। সাধারণতঃ সে নিজেই হত জমিনদার।"[৭৯] সুতরাং, বাদশাহী প্রশাসনে নিযুক্ত জমিনদারদের চরিত্রে একই সাথে জমিনদারী স্বত্ব, রাজকর্মচারীর বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান ছিল। বাদশাহী প্রশাসনে সরকারের খেদমতদার হিসাবে একদিকে সে ছিল রাজকর্মচারী, অন্যদিকে সমাজের উচ্চস্তরের সুবিধাভোগী শ্রেণীর সদস্য হিসাবে সে বিশেষ অধিকারের দাবীদার ছিল, যা এই সকল জমিনদাররা বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করত। আর বাদশাহী প্রশাসনের খিদমতের জন্য সে যে ভাতা পেত, তাকেও বলা হত 'নানকর'।

এই সকল বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ইরফান হাবিব সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনে জমিনদার ও রায়তের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও এই শ্রেণীর উপর বাদশাহী প্রশাসনের গৃহীত নীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, "ভূমি রাজস্ব বসানো হত সরাসরি চাষীদের উপর; যদিও বা জমিনদার সেই রাজস্ব বাদশাহী কোষাগার জমা দিত, তাসত্ত্বেও চাষীই ছিল আসল রাজস্ব দাতা।"[৮০] সুতরাং, জমিনদার ছিল কখনো চাষীদের প্রতিনিধি কখনো বাদশাহী প্রশাসনের স্থানীয় প্রতিনিধি। কিন্ত শ্রেণী হিসাবে এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল; এরা ছিল বিভিন্ন স্বত্বভোগী মধ্যবর্তী শ্রেণী। ফলে 'জমিনদারী'ও 'রাইয়তী' গ্রাম নির্বিশেষে কোন এলাকার মধ্যে রাজস্ব দাবীর মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতি একই হতে পারতো। তবে বাদশাহী কর্তৃপক্ষের গোটা জমিনদারী ব্যবস্থার উপর এক বিশেষ ক্ষমতা স্বীকৃত ছিল। আর সেই ক্ষমতা বা অধিকার বলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে জমিনদারী জমিকে 'সীর' এ পরিণত করতে পারতেন। অর্থাৎ, জমিনদারকে এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি চাষীদের উপর রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করা যেত, যদিও জমি ও জমিনদারের স্বত্বাধিকারে ভাগ বা মালিকানায় হাত পড়ত না।

Dhaka University Institutional Repository

তাসত্ত্বেও বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক জমিনদারী স্বত্ব কেড়ে নেয়ার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। অন্য দিকে জমিনদারী স্বত্বকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচনা করলেও কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হলে এই স্বত্বের ফয়সালা করা হত প্রচলিত আইনের মাধ্যমে। আর জমিনদারী স্বত্বের আইনগত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্যকর হত সরকারী আমলা, ফৌজদার বা সেনা নায়কের মাধ্যমে।[৮১] বস্তুতঃ জমিনদারী স্বত্বের স্বাভাবিক প্রবনতা লক্ষ্য করে মুঘল প্রশাসন এই স্বত্বের ব্যক্তিগত রূপটির প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধা দেখাত। তাসত্ত্বেও জমিনদার শ্রেণীর বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্য বাদশাহী প্রশাসনকে এই শ্রেণীর সার্বিক নিয়ন্ত্রনে কখনো কঠোর, আবার কখনো বেশ নমনীয় হতে বাধ্য করেছে। প্রথমত, সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনে জমিনদার ছিল কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র বিশেষ; অর্থাৎ রাজস্ব আদায়কারী। ইরফান হাবিব বলেন, "সরকারী দলিল পত্রের পোষাকী ভাষায় জমিনদারী স্বত্বকে তাই বলা হয়েছে 'খেদমত', সে যদি ঠিক মত কাজ না করে ও ভূমি রাজস্ব না দেয়, তবে তাকে ছাড়িয়ে তাঁর জায়গায় অন্য লোক বসানো যেত। এই ধরনের হস্তক্ষেপ দরকার পড়ত বলেই একটি নীতি গড়ে উঠেছিল, বাদশাহী সরকার খুশীমত জমিনদারী দিতে ও ফিরিয়ে নিতে পারবে।"[৮২] 'মিরাত-ই আহমদী', 'দস্তর -উল-ই মেহদী' 'ইনশা- নামা', 'দস্তর-উল-লশন'-ই-বেকাশ' ইত্যাদি ফারসী নথিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরফান হাবিব বাদশাহী সরাসরি প্রশাসনে প্রচুর জমিনদারী হস্তান্তরের সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছেন।[৮৩] সুতরাং, একটি বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর জমিনদার ছিল প্রাথমিক জমিনদার; এদের শ্রেণী চরিত্র এই যে, তাঁদের অধিকারের সাথে জমির উপর কোন প্রকার বিশেষ অধিকার বা স্বত্বের সম্পর্ক জড়িত ছিল না; বরং এই অধিকারের সাথে জড়িত ছিল সেবার সম্পর্ক,-যা মুঘল প্রশাসনে একটি পদ হিসাবে বিবেচিত ছিল, যেখানে কাজের সম্পর্ক ছিল। এই জমিনদাররা রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ও বাদশাহী প্রশাসনে আইন-শৃংখলা রক্ষায় সহায়তা করে সেবার বিনিময়ে বিভিন্ন প্রকার অধিকার ও সুবিধা ভোগ করত।

জমিনদার শ্রেণীর উপর আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে 'মালগুজারী' বা 'মালওয়াজিব' জমিনদারদের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। ইরফান হাবিব সম্ভবত অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই "হুজুরী"ও 'মালগুজারী"জমিনদার শ্রেণীর মধ্যকার তফাৎটা স্পষ্ট করেননি। ইরফান হাবিবের সীমাবদ্ধতার এই দিকটির প্রতি এখন একটু নজর দেয়া যেতে পারে। আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র এই শ্রেণীর জমিনদারদের সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন "মধ্যবর্তী স্তরের নিচেই থাকত 'মালগুজারী" জমিনদাররা। জমির উপর এদেরই একটি স্বতন্ত্র ধরনের স্বত্ব থাকত। এরা শুধুমাত্র নিজেরা বা অন্যের সাহায্যে চাষই করত না, গ্রামের উপর মালিকানার অধিকারও তাঁদের ছিল। এদের মাধ্যমেই কৃষকের উপর রাজস্ব ধার্য হত এবং নিজেদের স্বত্বের পরিবর্তে এরা রাজস্বের একটা অংশ লাভ করত। এর সঙ্গে সেবার কোন সম্পর্ক নেই, বরং স্বত্বের সম্পর্ক জড়িত ছিল।"[৮৪] সাধারণত কৃষিকার্যে নিয়োজিত মোট জমির প্রকৃত পরিমাণ অথবা প্রতিটি গ্রামে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হত এবং ঐ গ্রাম হতে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হত তার পূর্ববর্তী রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে "মালগুজারী" জমিনদারীতে ভূমি রাজস্ব ধার্য করা হত। এইরূপ স্বত্বের ভিত্তিতেই ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাসহ তিনটি গ্রামের জমিনদারী ক্রয় করে এবং ১১৯৪ টাকার 'মালওয়াজিব' বা তালুকদার বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।[৮৫] আবার এই বিশেষ শ্রেণীর জমিনদাররা আবার কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রথমতঃ কোন কোন 'মালওয়াজীব' জমিনদার একাধিক অংশীদারের ভিত্তিতে এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। এবং প্রায়ই তাঁরা একই বংশ-ভুত হত। দ্বিতীয়তঃ একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত জমিনদারীর অধিকার একক ব্যক্তি বা পরিবার ভোগ করত। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অধিকারকে 'তালুক' বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।[৮৬] সরকার 'মোরাদাবাদের' অন্তর্ভুক্ত কাঙ্গরের জমিনদার শোভা সিং একাধিক গ্রামের জমিনদারী স্বত্ব ভোগ করতেন। তৃতীয়তঃ বহু সংখ্যক তালুক এবং এক বা একাধিক পরগনা নিয়ে অন্য এক ধরনের বৃহৎ জমিনদারী গঠিত হত, যার প্রচুর দৃষ্টান্ত বঙ্গ ও বিহারে দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ এই সকল "মালগুজারী" বা "মালওয়াজিব" জমিনদারী স্বত্ব বাদশাহী সরাসরি প্রশাসনে বিদ্যমান মধ্যবর্তী জমিনদার বা প্রাথমিক জমিনদার ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে সরাসরি বাদশাহী প্রশাসন বহির্ভূত অঞ্চলের সামন্ত প্রধানদের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী কৃষক ও বাদশাহী প্রশাসনের মধ্যে ঐতিহ্যগত এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রেখে চলছিল । সুতরাং, একথা বলা যায় 'মালওয়াজিব' জমিনদারী অধিকারের মধ্যে একই সাথে বাদশাহী প্রশাসনের ক্ষমতা ও দ্বন্দ্ব এবং প্রথাগত লোকায়ত জমিনদারী অধিকারের যুগপৎ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল ।

এই পর্যায়ে মুঘল ভারতে উদ্বৃত্ত সম্পদের বন্টনের প্রশ্নে জমিনদার শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হল । অধিকন্তু উদ্বৃত্ত উৎপাদনে জমিনদার শ্রেণীর বিভিন্ন তৎপরতার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে, যাতে করে শ্রেণী হিসাবে মুঘল সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশ ধারায় জমিনদার শ্রেণীর সত্যিকার পরিচয় উদ্ভাসিত হয় ।

ইরফান হাবিব স্পষ্টতই মত প্রকাশ করেছেন যে, "স্বাভাবিকভাবেই 'জমিনদারী' স্বত্বের অধিকারীর একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়াই ছিল এই স্বত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । যেহেতু এটা ছিল মূলতঃ জমি সংক্রান্ত অধিকার, তাই আশা করা যায় যে, এর অধিকারী জমির উৎপন্নের একটা ভাগ পেত । সম্ভবত এলাকা অনুযায়ী এই ভাগের পরিমাণও যথেষ্ট হেরফের হত ।"[৮৭] ইরফান হাবিবের এই সরল মন্তব্যে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, জমিনদাররা ছিল বাদশাহী প্রশাসনের সহযোগী উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগী শ্রেণী, তাসত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, এরাই ছিল কৃষকদের কাছের মানুষ এবং কৃষকরা কখনোই শ্রেণী সচেতন হয়ে জমিনদারদের বাদশাহী প্রশাসন ও আমলাদের সমশ্রেণীভুক্ত করে শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত হয়নি; এই অবস্থা চলছিল গোটা মুঘল শাসনের পূর্বযুগে, বিশেষ করে 'মনসব' ও জায়গীরদারী সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষি সংকটের পূর্ব পর্যন্ত । কাজেই উদ্বৃত্ত সম্পদে জমিনদারের প্রাপ্ত অংশ ও শোষনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে । প্রথমেই সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনে নিয়োজিত প্রাথমিক জমিনদারদের বিভিন্ন প্রকার দাবীর প্রকৃতি ও পরিমাণ তুলে ধরা হল । ইতিমধ্যেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, গ্রামীন জমিনদারের প্রধান কর্তব্য ছিল দুটি; নিজস্ব জমিনদারীর সমস্ত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা ও নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা । বাদশাহের প্রতি তাঁর এই খেদমতের প্রতিদান স্বরূপ 'নানকার' (খোরপোশ বাবদ কিছু চাষের জমি ভোগ করার স্বত্ব) জমি দেয়া হত ।[৮৮] বস্তুতঃ এই ব্যবস্থাকে মোট সংগ্রহকৃত রাজস্বের উপর দালালী বাবদ পাওয়া বলে গন্য করা যেতে পারে এবং এই পাওনা দালালীর বিনিময়ে নগদে বা জমির মাধ্যমে মিটানো যেত ।[৮৯] অবশ্য এই অবস্থাটাকে ইরফান হাবিব ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে "জমিনদার যখন নিজেই রাজস্ব দেয় তখন সে 'মালিকানা' পায় না, পায় শুধু 'নানকার' (কাজের জন্য একটা ভাতা)" ।[৯০] সুতরাং, 'নানকার' বিভিন্ন চরিত্র ও পরিমাণ নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে । এন.এ. সিদ্দিকী তাঁর গবেষণায় মত প্রকাশ করেছেন যে, "কোথাও কোথাও কৃষি কাজের সুষ্ঠু প্রতিপালনের প্রতিদানে বিঘা প্রতি দুই 'বিশা' জমি প্রদানকে "নানকার' বলা হয়েছে এবং কোন কোন প্রদেশে মোট সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ উপরি পাওনা নানকার বলে ধার্য করা হত, যে জমিতে তার স্বত্বাধিকার ছিল, সেই জমি কৃষি কাজে নিয়োজিত হলেও জমিনদার "নানকার" বাদেও কিছু পাওয়ার অধিকারী হতেন ।"[৯১] কাজেই এ ক্ষেত্রে আমরা একটি বিষয়ে স্পষ্ট হতে পারি যে, জমিনদার 'নানকার' বাবদ যা পেতেন, তা মুলতঃ বাদশাহী প্রশাসনের প্রতি তাঁর 'খেদমত' বা পারিশ্রমিকের পুরস্কার; কিন্তু তাঁর মালিকানা স্বত্বের জন্য জমিনদারের স্বতন্ত্র দাবী ছিল । এই প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব বলেন যে, "যখন বাদশাহী প্রশাসন সরাসরি রাজস্ব ধার্য ও আদায় করে তখন 'মালিক' হিসাবে জমিনদারকে প্রতি একশ বিঘা বা প্রতি একশ মন পিছু কিছু ধরে দেয় ।"[৯২] তবে এই অবস্থার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায় । যেমন অনেক ক্ষেত্রেই মালিকানার স্বাভাবিক হার ছিল কোন অঞ্চলে মোট আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা দশ ভাগ । আবার 'লাখেরাজ' জমি রূপেও মালিকানা দেয়া হত । আবার রাজস্ব সংগ্রহ ও তা সরকারকে দেয়ার কাজে নিযুক্ত থাকতে রাজি না থাকলেও জমিনদারের বরাদ্দ মালিকানায় অধিকার থাকত । বিভিন্ন কারণেই মালিকানা প্রদানের ধারা এবং মালিকানা হিসাবে মোট আয়ের অংশ বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ছিল । জমিনদারের মালিকানা কিভাবে এবং কি হারে ধার্য

Dhaka University Institutional Repository

হত এই প্রশ্নের জবাবে ইরফান হাবিব ব্যাপক তথ্য ও উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ব্যবস্থার ভিন্ন ও বিচিত্র চিত্র তুলে ধরেছেন।[৯৩] যার মূল কথা হল; কৃষিতে নিয়োজিত মোট জমি অথবা সর্বমোট সংগৃহীত রাজস্বের অথবা মোট উৎপন্ন ফসলের কোন নির্দিষ্ট অনুপাতে এই মালিকানা দাবী ধার্য হত।

বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত "খেদমতের" পারিতোষক বাবদ পাওনা ও মালিকানা স্বত্ব বাবদ পাওনার বাইরে জমিনদারের বহু রকমের উপরিদাবী ছিল- যেগুলোর কোনটা প্রথাগতভাবে স্বীকৃত হলেও অধিকাংশই ছিল অন্যায় দাবী। এই প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব বলেন, "জমির উৎপন্নের একটা অংশের উপর জমিনদারের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকত দু'ভাবে" প্রথমতঃ চলতি প্রথা দিয়ে ,দ্বিতীয়ত, বাদশাহী বা সরকারী নিয়ম কানুন দিয়ে। বস্তুতঃ জমিনদারদের স্বাভাবিক পাওনা ও উপরি যোগ করলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে এই শ্রেণীর প্রাপ্ত মোট অংশের পরিমাণ সম্পর্কে ইরফান হাবিব যে যথার্থ স্পষ্ট হতে পারেননি তা তিনি তাঁর বাংলা সংস্করনের ভূমিকার স্বীকার করে নিয়েছেন, শুধু তাই নয়, তিনি পরবর্তী কালের গবেষক শিরীন মুসভীর উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, "উদ্বৃত্তের উপর জমিনদারদের ভাগকে গড়ে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৩}$ ধরা উচিত; কার্যত যদিও এটা ছিল আরও বেশী।"[৯৪] জমিনদারদের উপরিপাওনার ধরণ সম্বন্ধে ইরফান হাবিব বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। অযোধ্যায় "বুসূম" এ জমিনদারী'(জমিনদাররা প্রথাগত ভাবে জোর করে যা আদায় করত) এবং "হুকুক- এ জমিনদারী" (জমিনদারের আর্থিক অধিকার) এই দুটি শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং, বুঝা যায় যে, জমিনদাররা প্রথার বাইরেও নিজস্ব শক্তি প্রয়োগেও অনেক সময় অন্যায় দাবী পূরণ করত। অযোধ্যায় একটি দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, জমিনদাররা নিজেদের অনুমোদিত ভূমি রাজস্ব থেকে আলাদা ও বাড়তি এক ধরনের উপকর বা শুল্ক দাবী করতে পারত। এখানকার এই বাড়তি দাবী 'সতারহীর' (জমিনদারের স্থানীয় নাম) পরিমাণ ছিল বিঘা প্রতি ১০সের শস্য ও বিঘা পিছু একটি করে তামার পয়সা (ফুলুস) যা 'দাশী' নামে পরিচিত ছিল। বাংলায় এক ভিন্ন অবস্থা বিরাজ করছিল। এখানে জমিনদার কর্তৃপক্ষ গ্রামের রাজস্ব বাবদ একটি নির্দিষ্ট হারে চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। সেক্ষেত্রে তাঁর আয় দাঁড়াত শুধু এই, যা সে সংগ্রহ করেছে এবং তার থেকে কর্তৃপক্ষকে যা দিয়েছে এর বিয়োগ ফল।[৯৫] এটা ছিল চিত্রের একদিক কিন্তু যে সব এলাকায় বাদশাহী প্রশাসন সরাসরি রাজস্ব হার বেঁধে দেয়ার ব্যাপারে জোর করত, সেখানে জমিনদার নিজের সুবিধার জন্য আলাদা উপকর বসাত। বাদশাহী প্রশাসন বার বার বিভিন্ন নিশান ও ফরমানের মাধ্যমে এই সকল বাড়তি দাবী নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। ফলে মুঘল প্রশাসনে উদ্বৃত্ত সম্পদের ভাগীদার হয়ে দাঁড়ায় প্রধানত দুজন, জমিনদার ও জায়গীরদার।[৯৬] সুতরাং, কৃষকের উদ্বৃত্ত উৎপাদনে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বই ছিল না, বরং এর সাথে নানা রকম 'আবওয়াব' ও বেআইনী কর যুক্ত হয়েছিল। কৃষক তাঁর সংবৎসরের উৎপাদনের এক বিপুল অংশ জমিনদারদের 'আবওয়াব' মিটাতে দিয়ে দিত। ইরফান হাবিব অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর প্রদত্ত মত পরিবর্তন করে বলেন যে, "জমিনদাররা যে সব অধিকার ও উপরি পাওনা দাবী করতেন তার সঙ্গে ভূমি রাজস্বের কোন সম্পর্ক ছিল না, ভূমি রাজস্ব থেকে এগুলো ছিল আলাদা।" কিন্তু ইরফান হাবিবের এই সদ্য গৃহীত মতও নিদ্বির্ধায় গ্রহন করা যায় না, এর কারণ জমিনদারী ব্যবস্থার বিচিত্র শ্রেণী বিন্যাস, নানা জাত ও বর্ণে বিভক্ত এর অভ্যন্তরীন 'কওম' চেতনা (চেতনা ও বিচ্ছিন্নতা)। সামন্ত প্রধান ও 'ঘয়েল আসলি', ও স্বয়ংশাসিত জমিনদারের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য বলে গৃহিত হলেও "আসলি জমিনদার" বা মধ্যবর্তী জমিনদার ও বাদশাহী সরাসরি প্রশাসনে নিযুক্ত প্রাথমিক জমিনদারদের ক্ষেত্রে এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। স্বাভাবিক কারনেই এন. এ. সিদ্দিকী 'রিসালা-ই সিয়াত' নামা ফারসী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, "জমিনদারের পাওয়া নির্ধারিত রাজস্ব বা জমা হতে মিটিয়ে দেয়া হত।"[৯৭] কারণ, রাজস্ব দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন হিসাবে দেখা যায় যে, আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ দুটি খাতে দেখানো হয়েছে। এক 'ফতাদারের' তহবিলে যে অংশ জমা পড়ত এবং দুই, রাজস্ব নিরূপন ও তা আদায় করার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

পারিশ্রমিক বাবদ যা ব্যয় হত। শেষোক্ত অংশ 'মাজকুরাত' বলে পরিচিত এবং অন্যান্য খরচের মধ্যে জমিনদারের প্রাপ্য বা যে পরিমাণ জমিনদার ব্যয় করেছে তার হিসাবও ধরা হত। এইভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে এন.এ. সিদ্দিকী মন্তব্য করেছেন যে "বাংলায় জমিনদারের অংশ মোট রাজস্বের প্রায় ৩৩%থেকে ২০%।" শিরীন মুসভির সাম্প্রতিক গবেষনা দেখিয়েছে যে, মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রেই উদ্বৃত্ত সম্পদে জমিনদারদের অংশ প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা জমিনদারান উমদার ক্ষেত্রে এই অংশ আরও বেশী হওয়া স্বভাবিক।[৯৮] জমিনদারীতে বংশানুক্রমিক অধিকার ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। বস্তুতঃ জমির উৎপন্নের অন্যান্য অধিকার ও দাবীর সঙ্গে জমিনদারের উপরি পাওনাও থাকত। উল্লিখিত উপরি পাওনাগুলোর সাথে সাথে জমিনদারীর স্বত্বাধিকারে বংশগত অধিকার স্বীকৃত ছিল এবং জমিনদারের অবর্তমানে এই অধিকার তার বৈধ উত্তোরাধিকারদের হাতে হস্তান্তরিত হত।

এই পর্যায়ে জমিনদারদের শ্রেণী চারিত্র নির্দিষ্ট করে মুঘল সমাজ বিকাশে এই শ্রেণীর সত্যিকার অবদানের বিভিন্ন দিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যায়। ইরফান হাবিব তাঁর গবেষনার জমিনদারদের শ্রেণী চরিত্র চিহ্নিত করেছেন নিম্নোক্তভাবে, প্রথমতঃ চাষীদের উৎপন্নের উদ্বৃত্তে তাঁরা ভাগ বসাত এই অর্থে তাঁরা ছিল শোষক শ্রেণী। দ্বিতীয়তঃ জমিনদাররা ছিল নানভাবে স্বৈরতন্ত্রের বা একেবারেই স্থানীয় কোন শক্তির প্রতিভু। কেননা, বিশেষ জমির উপর তাঁদের অধিকার ছিল 'মৌরুসী', গোষ্ঠীর জায়গা বদল বা জমি বিভক্তির কারণে জমিনদারী অধিকারে হাত পড়লেও সাধারণত বহুপুরুষের জমিতে বংশ পরম্পরায় তাঁদের স্বত্বের শেকড় বহু গভীরে প্রোথিত ছিল। স্বভাবিক কারনেই জমির উৎপাদন ক্ষমতা, জমিনদারদের প্রথা, ঐতিহ্য ও পরম্পরার কথা তাঁর খুব ঘনিষ্টভাবে জানা ছিল। এই সমস্ত কারণে স্থানীয় চাষী বা উৎপাদক শ্রেণীর সাথে জমিনদারের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ট এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও আস্থার ভিত্তিতে মুঘল উৎপাদন প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত ছিল। তৃতীয়তঃ জমিনদার শ্রেণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রেণী হিসাবে এর সামাজিক ও ভৌগোলিক বিভাজন। আর এর কারণ হিসাবে ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন, "'রায়তী' ও চাষী অধিকৃত গ্রামের ক্রমবর্ধমান অস্তিত্ব ও জোট।"[৯৯] বাদশাহী প্রশাসন মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থেই "ঘয়ের আসলি" বা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারী জমিনদারদের ধীরে ধীরে 'আসলি জমিনদার' বা মধ্যবর্তী জমিনদারে রুপান্তর করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। এ ছাড়াও জমিনদারী স্বত্ব অবাধে ক্রয় বিক্রয় ও সরকারী হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে জমিনদারীর সামাজিক ও ভৌগোলিক বিভাজন অব্যাহত ছিল। চতুর্থতঃ জমিনদার যুগপৎ জমির মালিক ও আধা সরকারী কর্মচারী হিসাবে গন্য হতেন। এক্ষেত্রে জমিনদারের চরিত্রে একই সাথে 'মিলকিয়াৎ' ও 'আমলার' বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। বাদশাহী প্রশাসন বা বাদশাহী প্রশাসনের বাইরে কখনো স্বতন্ত্রভাবে, আবার কখনো যুগপৎভাবে জমিনদারীর এই দ্বৈত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘল জমিনদারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর নিজস্ব সশস্ত্র শক্তির। ইরফান হাবিব আইন-ই আকবরীর উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন যে, "(সাম্রাজ্যের) জমিনদারদের সৈন্য ছিল চুয়াল্লিশ লক্ষের ও বেশী।"[১০০] জমিনদারের সশস্ত্র শক্তির কেন্দ্র ছিল নিজেদের এলাকার বিভিন্ন 'কেল্লা' 'আস্তানা' বা ঘাটিতে। আর তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতা নিহিত ছিল লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র অনুচরের মধ্যে, যারা ছিল জমিনদারের নিজস্ব "গোষ্ঠী" বা 'কওমের' লোক। বস্তুতঃ জমিনদার শ্রেণীর অবধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীর ধরণ ধারনেই তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার প্রতিফলন দেখা যেত। পিতৃপুরুষের জমি রক্ষা করতে যে, বদ্ধপরিকর এবং প্রচুর সংখ্যায় চাষী থাকায় পদাতিক সৈন্যের কখনোই ঘাটতি হত না। তবে বিক্রয় বা অন্যকোনভাবে জমিনদারী স্বত্বের হস্তান্তর ও জমিনদারীর বিভাজ্যতা এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছিল। কেননা বিক্রয় ও হস্তান্তরের মাধ্যমে অনেক সময়েই বিশাল জমিনদারী ভেঙ্গে ঠুকরো টুকরো হয়েছে, বা ছোট ছোট জমিনদারী থেকে বড় জমিনদারীর সৃষ্টি হয়েছে।[১০১] কিন্তু শ্রেণী হিসাবে কখনোই জমিনদাররা মধ্যস্বত্বভোগী - চেতনার বাইরে বেড়িয়ে এসে স্বতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি; ফলে ব্যক্তি,গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদে জমিনদারী স্বত্ব হস্তান্তর হলেও প্রচলিত ব্যবস্থা ও নিশ্চল শ্রেণী স্বার্থের আবরন তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

মুঘল কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা শান্তি শৃংখলা রক্ষায় জমিনদার শ্রেণীর বিরাট ভূমিকা ছিল। ইরফান হাবিব "জমিনদারদের" আলোচনা করতে গিয়ে এর বিভিন্ন দিক সতর্কতার সাথে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর আলোচনায় এই শ্রেণীর সফলতা ও ব্যর্থতার ঐতিহাসিক পেক্ষাপট উঠে এসেছে। এ কথা সত্য যে স্থানীয় রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিনদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং বহুবিদ দায় দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিল। প্রথমতঃ জমিনদারীর আওতাভুক্ত সমস্ত আবাদী জমিতে চাষ করা হচ্ছে কিনা তাঁর উপর নজর রাখা জমিনদারের দায়িত্বের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে জমিতে নতুন কৃষক বসানোর ক্ষমতা না থাকলেও তার চাষের জমির বন্দোবস্ত করা জমিনদারের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। আমরা গ্রাম 'সমাজ' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি, গ্রামে নতুন কৃষক বসানো (বিশেষ করে "পাহিকাস্তা) এবং যাকে খুশী জমি দেয়ার ক্ষমতা জমিনদারের বিশেষ অধিকারের মধ্যে বজায় ছিল।[১০২] কাজেই কৃষককে স্বেচ্ছায় অথবা প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে কৃষিকাজে নিয়োগ করার ক্ষমতা জমিনদারের ছিল। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে বিভিন্ন কারণেই কৃষকের সাথে মুঘল প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না; ফলে স্থানীয় শক্তি হিসাবে জমিনদারের মাধ্যমে বাদশাহী প্রশাসন কৃষিতে সরকারের ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়ন করতে চাইত। কাজেই একজন অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে সরকারী কর্মচারীর চেয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী বিভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ জমিনদারের পক্ষে কৃষকের সাথে সহজেই সখ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল; কারণ তিনি ছিলেন গ্রামীন নিবিড় জীবনের অংশীদার, সঙ্গত কারণেই জমি ও গ্রামের সমৃদ্ধির সাথে জমিনদারের স্বার্থ ও অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। গ্রামের সমৃদ্ধি তাঁর জীবনে আনত প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ। সুতরাং, স্থানীয় বাদশাহী প্রশাসনে জমিনদারের স্থান অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। জমিনদারের বহুমুখী ভূমিকা ও অবদান সর্ম্পকে সরকার সর্বদাই সচেতন ছিলেন। আর তাই চাষযোগ্য জমি অধিক হারে আবাদের আওতায় আনা, বিভিন্ন বিষয়ে চাষীদের কৃষিকার্যে সাহায্য করা, উৎসাহিত করা জমিনদারের কতর্ব্য বলে বাদশাহী প্রশাসন মনে করত এবং এই বিষয়টি বহুবার বিভিন্ন ফরমানে সরকার কর্তৃক জমিনদারদের অবহিত করানো হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আবাদী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুঘল সরকার জমিনদারের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমিনদারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসাবে নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং তা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া। অনেক সময় জমিনদাররা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব জমা না দিয়ে বাদশাহী প্রশাসনের প্রতি এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। এমতাবস্থায় এরা বিভিন্ন নথিপত্রে "জমিনদারান জোরতলব" এবং 'রাইয়তী' সরকশই' বলে উল্লেখিত হয়েছে। মুঘল সরকার শক্তি প্রয়োগে এদের স্বীয় বশে রাখতেন। বাদশাহী প্রশাসনে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর জমিনদারের প্রধান কর্তব্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ ও আইন শৃংখলা রক্ষায় রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা প্রদান করা। কোন দুষ্কৃতিকারী বা তস্কর তাঁর জমিনদারীতে আশ্রয় নিলে বা এইরূপ সন্দেহ হলে এদের সর্ম্পকে তাঁকে খোজ খবর নিতে হত। জমিনদারকে আবার সরকার সামরিক কর্মেও নিযুক্ত করত; প্রতিবেশী কোন জমিনদার রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হলে অথবা অন্য কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করলে, বিদ্রোহী হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হত।[১০৩] জমিনদারকেও সেই অভিযানে যোগ দিতে হত।

এত সব সত্ত্বেও ঐতিহসিকদের নিকট বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কেন জমিনদাররা একটি সংঠিত সামাজিক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি? কেনই বা তাঁরা ভারতে উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তরে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি ? কেনই বা তাঁরা মুঘল সরকারের বিকল্প শক্তি হিসাবে প্রকাশ করতে পারেনি? এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

কোন উত্তর এখন পর্যন্ত আবিস্কার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি; অবশ্য এই সকল বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির বিচার বিশ্লেষনের কাজ বেশ সাড়া জাগিয়েছে। আমরা আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে এই সকল প্রশ্নের সঠিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞান সম্মত জবাব পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও ইরফান হাবিবের তৈরী ভিতে দাঁড়িয়ে এই বিষয়ে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। ইরফান হাবিব বলেন যে, "জমিনদারী স্বত্ব যেভাবে এসেছিল তারই ফলে নানান জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে জমিনদারী অধিকারের আঞ্চলিক বিভাগ দেখা দেয়"। বস্তুতঃ বিভিন্ন 'কওম' বিভিন্ন এলাকায় জমিন্দারী জোত, জমি একচেটিয়াভাবে দখলে রেখেছিল, আর তাঁদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল বিশাল জমিনদার শ্রেণী।[১০৪] ফলে স্থানীয় শক্তির প্রতিভূ গোষ্ঠী ভিত্তিক 'কওম' চেতনায় উদ্ভাসিত এই জমিনদার শ্রেণী স্থানীয় প্রথা, ভূমির উৎপাদন, বাসিন্দাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে এক ধরনের স্থানিক সংকীর্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। জমিনদারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় কখনোই তাঁর 'কওমের' গন্ডি পেরোত না। ইরফান হাবিব স্পষ্টতই বলেছেন যে, "শ্রেণী হিসাবে জমিনদাররা অনেকটাই গড়ে উঠেছিল 'কয়েকটি 'কওম' নিয়ে। যারা অনেক দিন ধরে পরস্পরকে উৎখাত বা পদানত করে চলছিল। জমিনদারী কেনা-বেচার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সামাজিক ও ভৌগোলিক বিভাজন কখনোই জমিনদার শ্রেণীকে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হতে প্রধান প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করেছে।"[১০৫] আবার জমিনদারের সশস্ত্র বাহিনী যেমন তাঁর শক্তির উৎস ছিল, তেমনি, প্রায় সময় তা তাঁর দূর্বলতার কারণ হয়েও দাঁড়াত। কিন্তু ইরফান হাবিবের এই মত কোনভাবেই সমর্থন যোগ্য নয় যে, "ব্যবসা বাণিজ্যের বড় কেন্দ্রগুলো থেকে অনেক দূরের এলাকাতেও টাকার খেলা যেভাবে শুরু হয়েছিল, তাতে করে জমিনদারী স্বত্বের উপর 'কওম' অধিকারের সীমানা ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"[১০৬] কারণ, ইরফান হাবিব স্বয়ং পরবর্তী পর্যায়ে নিজেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, জমিনদার শ্রেণী এত মারাত্মক রকমে বিভক্ত ছিল, জাত পাঁত এবং স্থানীয় বন্ধনে এত সংকীর্ন ভাবে বাঁধা পড়েছিল যে কখনো তাঁরা একটি ঐক্যবদ্ধ শোষক শ্রেণীর রূপ নিয়ে আত্ম প্রকাশ করতে পারেনি।

বর্ণ বা 'কওম' চেতনায় রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাম গঠিত হওয়ার ফলে জমিনদাররা নিজেদের জাতি বন্ধনের মধ্যে সেই সামরিক শক্তি গড়ে তুলত। অনেক সময় জমিনদারের নিকটবর্তী ভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বকেও বিভিন্ন প্রকার সুবিধা , যেমন 'পাইকান' 'চাকরান' (নিস্কর ভূমি) ইত্যাদি দিয়ে নিজের অনুগত করে রাখত। কাজেই জমিনদারী শক্তির উৎস ছিল দুটি, প্রথমতঃ সশস্ত্র বাহিনী ও দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় অবস্থার সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। জমিনদারী এলাকার বাসিন্দাদের সাথে বর্ণ ও জাতিগত ঘনিষ্ঠতা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর অগাধ ধারণা, সর্বোপরি স্থানীয় ঐতিহ্য বা লোকাচারের সঙ্গে জমিনদারের গভীর সংস্পৃক্ততা তাঁর শক্তির ভরকেন্দ্র হিসাবে শক্তি যুগিয়েছে। সুতরাং জমিনদারী ক্ষমতার উৎসমূলেই ছিল স্থানীয় সংকীর্নতা; ফলে তাঁদের এই ক্ষমতা কখনোই বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারেনি। উপরন্ত, নানা বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত আত্মকেন্দ্রীক বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ জমিনদার শ্রেণী সব সময়ই নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধকে জাগিয়ে রাখত। ফলে মুঘল প্রশাসনের ব্যাপক ও কেন্দ্রীভূত শক্তির কাছে তাঁদের অবস্থান দুর্বল বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য বিচ্ছিন্ন ও বিস্তৃত স্থানীয় শক্তি বলেই জমিনদারদের বিদ্রোহ দমন করা বা তাদের চূড়ান্তভাবে অবহেলা করা কখনোই মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তথ্য নিদের্শ

১. Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India* (1556-1707) First edi, Bombay, 1963,p.136

২. *Ibid*, p. 136

৩. *Ibid*, p. 136

Dhaka University Institutional Repository

৪. W.H. Moreland, *The Agrarian system of Moslem India*, Delhi, 1968,pp. 122,191,279
৫. P. Saran, *The provincial Government of the Mughals* (1526-1658), Allahabad, 1941, p. 111
৬. Irfan Habib, *op. cit.* p. 137
৭. *Ibid*, p. 137
৮. *Ibid*, p. 138
৯. Moreland W. H. *op. cit.* p. 18
১০. Irfan Habib, *op. cit. p.* 139
১১. *Ibid*, p, 140
১২. Keyamuddin Ahmed. *"Meaning & Usages of some term of land Revenue Administration*, Medieval India, A Miscelleny, ed. K. A. Nisami, vol. 2,287
১৩. Irfan Habib, *op. cit.* p. 140
১৪. Satish Chandra, *The parties & politics at the Mughal court*, 3ard edi, Delhi, 1972, introduction, pp. 14-16
১৫. Irfan Habib, *op. cit. p.*140
১৬. Keyamuddin Ahmed, *op. cit.* p,29
১৭. গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতিও কৃষক বিদ্রোহ*, কলিকাতা, ১৯৯১,পৃ. ২২
১৮. Irfan Habib, *op, cit.* p. 141
১৯. *Ibid*, p. 141
২০. *Ibid*, p. 142
২১. James, Tod, *Annals and Aniquites of Rajasthan or the central and western Rajpoot states*, vol, 1&2 , calcutta, 1894,pp. 132-138
২২. Irfan Habib, *op, cit.* p. 143
২৩. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩,Tapan Raychaudhuri & Irfan Habib edi. *Cambridge Economic History of India* (1200-1750), Cambridge, 1982, p. 243
২৪. N. A. Siddiqi, *The land Revenue Administration under the Mughals*, Bombay, 1970, p. 21
২৫. N. A. Siddiqi, *Ibid*, p. 30
২৬. See For detail, Irfan Habib, *op. cit.* pp. 158-60
২৭. *Ibid*, p. 160
২৮. *Ibid*, p. 160
২৯. গৌতম ভদ্র *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৩১. Irfan Habib, *"Distribution of Landed property in pre British India,* Enquiry, 1965, Winter.
৩২. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৪
৩৩. Vijay Kumar Thkur, *"The Beginning of the Feudalism in Bengal,* See, Social Scientist, 1978, Jan-Feb.
৩৪. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৪
৩৫. জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই- ফিরুজ শাহী,* অনুঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭৫,৪৩৯
৩৬. Irfan Habib, *op. cit.*, p. 161
৩৭. *Ibid,* p. 162
৩৮. Abul Fazl, *Ain- I -Akbari.* Tr. Jarrett & Sarkar, vol, 1,ii,iii,Caleutta, ১৯৩9, vol, ii, p. 175
৩৯. Irfan Hbib, *op.cit* 163
৪০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ.২৫
৪১. গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬
৪২. Irfan Habib, *Agrarian Relation and Economi in a Reign of U.P.,* IESHR, vol.4, No. 3, 1967, p. 238
৪৩ Satish Chandra, *A Few Document From Thikaro Records,* PIHC, 1967, Patiala, p. 247
৪৪. Muzaffar Alam, *Zamindar uprisings and Emergence of Rogilla power in Moradabad,* PIHC, গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৭
৪৫. Satish Chandra, *op. cit.* 249
৪৬. Irfan Habib, *op. cit.* p. 144
৪৭. *Ibid,* p. 161
৪৮. *Ibid,* p. 165
৪৯. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. 28,George Blyn, *The Revenue Administration in the first Half of the 18th Century,* IESHR, 1964, Ap- jun.
৫০. S. Nurul Hasan, *"The Position of Zamindari in the Mughal Empire,* IESHR, Vol. I, No, 4, 1964
৫১. Irfan Habib, *op. cit.* p. 182
৫২. *Ibid,* p. 184
৫৩. See, For detail , S. Nural Hasan, *op. cit.* pp.387-97
৫৪. Irfan Habib, *op, cit.* p. 185
৫৫. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩০
৫৬. N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 30
৫৭. Irfan Habib, *op. cit.* p. 153

Dhaka University Institutional Repository

৫৮ N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 23 M. L. Khan, *History of Midnapur,* calcutta, 1889, p. 24

৫৯. Tapan Roy Chaudhuri, *Bengal under Akbar & Jahangir,* Delhi, 1969, p. 67

৬০. Irfan Habib, *op. cit.* p. 155

৬১. N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 24

৬২. Irfan Habib, *op. cit.* p. 171

৬৩. *Ibid,* p. 172

৬৪. N, A. Siddiqi, *op. cit.* p. 25

৬৫. *Ibid,* p. 25

৬৬. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩২

৬৭. N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 27

৬৮. G. D. Sharma, *pattadari System in Morwar under Maharajah Jaswant singh,* (1638-1678), PIHC, 1972, pp. 243-55

৬৯. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩১

৭০. Irfan Habib, *op. cit.* p. 170

৭১. *Ibid,* p. 172

৭২. N. A. Siddiqi, *op. cit.* pp. 21-22

৭৩. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৩

৭৪. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৩

৭৫. N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 28

৭৬. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩২

৭৭. Irfan Habib, *op. cit.* p. 177

৭৮. *Ibid,* p. 174

৭৯. *Ibid,* p. 174

৮০. *Ibid,* p. 175

৮১. *Ibid,* p. 179

৮২. *Ibid,* p. 100

৮৩. *Ibid,* pp. 180-81

৮৪. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩২

৮৫. Irfan Habib, *op. cit.* p. 151, N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 30

৮৬. *Ibid,* p. 25

৮৭. Irfan Habib, *op. cit.* p. 144

৮৮. B. D. Grover, *'The Nature of Dehat -I-Taaluqa,* IESHR,1965,July, Vol,2, no.3, p. 259

৮৯. N. A. Siddiqi, *op.cit.* pp. 31-32

৯০. Irfan Habib, *op. cit.* p. 146

৯১. N. A. Siddiqi, *op. cit.* p.32

Dhaka University Institutional Repository

৯২. Irfan Habib, *op. cit.* p. 146
৯৩. *Ibid,* p. 1489
৯৪. *Ibid,* p. 145
৯৫. Shireen Moosvi, *The Magnitude of land Revenue Demand & The income of the Mughal rulling class under Akbar,* ed. Irfan Habib, Medic vol. India -a-Miscellany, vol. iv, 1977 pp. 224-256
৯৬. A Jan Qaisar, *"Distribution of Revenue Resources of the Mughal Empre among the nobilty",* PICH, Allahabad, 1965. pp. 237-243
৯৭. N . A, Siddiqi, *op. cit.* p. 35
৯৮. *Ibid,* p. 35
৯৯. Irfan Habib, *op. cit.* p. 168
১০০. Abul Fazl, *op. cit.* p. 175
১০১. গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৯
১০২. B. R. Grover, *'The nature of land Rights in Mughal India'*, IESHR, vol.1,no,1, pp. 264-66
১০৩. N. A, Siddiqi, *op. cit.* p. 35
১০৪. Irfan Habib, *op. cit.* p. 161
১০৫. George Blyn, *op. cit.* p.
১০৬. Irfan Habib, *op. cit.* p. 162

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি-রাজস্ব : জায়গীর ও মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

এতক্ষন গ্রামীন সমাজ ও মুঘল প্রশাসনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী জমিনদারদের দীর্ঘ আলোচনা করা হল। অবশ্য আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে ইতিমধ্যেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, জমিনদার শ্রেণী ছিল কৃষকদের নিকটজন। মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহযোগে। মুঘল রাজস্ব প্রশাসনের এই সকল ব্যক্তিরা 'জায়গীরদার','মনসবদার' 'তুয়ুলদার' ইত্যাদি অভিধায় পরিচিত ছিলেন। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই পরবর্তী অধ্যায়ে মুঘল ভুমিরাজস্ব, রাজস্ব-রবাত ও রাজস্ব অনুদান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ইরফান হাবিবের মতামতের পুনর্মূল্যায়ন করার যথাসাধ্য প্রয়াস চালানো হল। মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর্থিক ভিত ছিল ভূমি-রাজস্ব। স্বাভাবিক কারণেই ভূমিজ-সমাজ হিসাবে কৃষকরা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ,-রাজস্ব-দাবী, রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী, রাজস্ব-বরাত, রাজস্ব অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান ব্যতিত মুঘল ভারতের কৃষি- ব্যবস্থার সত্যিকার চিত্রটি আবিস্কার করা সম্ভব না।

ইরফান হাবিব তাঁর গবেষণাকর্মে এই বিষয়গুলোর উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তাঁর পুস্তকের 'ষষ্ঠ অধ্যায়ে "ভূমি-রাজস্ব' এই শিরোনামে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা কতগুলো উপ-শিরোনামে যথাঃ (১) রাজস্ব দাবির পরিমাণ, (২) ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি, (৩) বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি (৪) নির্ধারণের মূল একক, কৃষকের ব্যক্তিগত জোত ও গ্রাম, (৫) রাজস্ব দাখিলের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব আদায় (৬) ভূমি রাজস্ব বাদে অন্যান্য গ্রামীন কর ও জবরদস্তি আদায় ও (৭) ত্রান ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি শিরোনামে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা সেই সাথে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্তের ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলো ভারতীয় সমাজ ও আর্থিক ইতিহাসের মৌলিক আবিস্কার। আর তাই তত্ত্ব হিসাবে ইরফান হাবিবের প্রদত্ত মতামত ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্যদিকে সমকালীন ও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যবলীর উপর ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা, টিকা, টিপ্পনি সহযোগে তিনি তথ্য সাম্রাজ্যের যে বিশাল ইমারত গড়ে তুলেছেন ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের পাঠক ও গবেষকদের কাছে সঙ্গত কারণেই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আকর গ্রন্থ হিসাবে গ্রহনযোগ্য। এ পর্যায়ে তাঁর গবেষণাকর্মের গভীরতাকে উপলব্ধি করার জন্য বিষয়গুলোর উপর মোটা দাগে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

ইরফান হাবিব আলোচনার শুরুতেই মন্তব্য করেছেন-যে, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, উদ্বৃত্ত উৎপন্নের (অথাৎ বেঁচে থাকার জন্য যে টুকু থাকা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত উৎপাদনের) সঙ্গে কৃষকের কোন যোগ থাকত না।" কেননা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের তরফে আদায় করা ভূমি-রাজস্ব('মাল') এ রূপান্তরিত হত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাজস্ব দাবীর সত্যিকার পরিমাণ কি তা নিয়ে গুরুতর জটিলতার কারণ অন্বেষন করতে গিয়ে ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, "ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপন্নকে এক করে দেখাটা প্রশাসনিক নথিপত্রে ব্যক্ত সরকারী নীতির অঙ্গ ছিলনা"।[১] সুতরাং, কেন্দ্র থেকে আরাম্ভ করে বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রাপ্ত নথিপত্রে ভূমি রাজস্বহার সুনির্দিষ্টভাবে নিধার্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাসত্ত্বেও ইরফান হাবিব তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকর্মের দ্বারা রাজস্ব দাবীর বিভিন্ন পর্যায় ও পরিমাণ সম্পর্কে সত্যের কাছাকাছি পৌছার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছেন। ইরফান হাবিব মনে করেন,"ধার্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেত না, কারণ ঐ ধরনের ব্যবস্থা নিলে রাজস্ব দাতারাই এক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যেত।"

মুঘল ভারতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের গড় হার নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন, "যদিও উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের গড়হার কি ছিল (মোট উৎপাদনের নিরেখে) তা জানার কোন উপায় নেই। তাসত্ত্বেও কৃষকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নষ্ট না করে তার উৎপাদনের কতটা অংশ নেয়া যেতে পারে, প্রত্যেক এলাকার সকলেরই তা জানা ছিল।" বস্তুতঃ ভূমি-রাজস্ব সাধারণত উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বেশী হত না। তবে জমির উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য এবং জলহাওয়া ও সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী জীবন ধারণের নুন্যতম মাত্রা যা স্থির হয়, তার পার্থক্যের দরুন এক এক অঞ্চলে উৎপাদনের গড় হার এক এক রকম হত। এসকল কারণেই বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক ধার্য রাজস্ব হার অঞ্চল ভেদে, এমনকি পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেত। ইরফান হাবিব তাঁর আলোচনার দীর্ঘ গন্ডীতে এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ বিস্তারিত আলোচনা করেন, যা এক কথায় পর্যাপ্ত।

ইরফান হাবিব প্রাপ্ত নথিপত্রের সারণিকে নিজস্ব প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবন শক্তি বা সৃজনশীল প্রতিভার দ্বারা সত্যিকার অবস্থাটিকে পাঠকের সম্মুখে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং রাজস্ব দাবীর পরিমাণ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে মন্তব্য করেছেন যে, "আকবরের প্রশাসন কাগজে কলমে রাজস্ব দাবি ঠিক করেছিল উৎপন্নের একের তিন ভাগ, কিন্তু বাস্তবে তা গিয়ে দাঁড়াত দুই -এর তিন ভাগ।"

ইরফান হাবিব রাজস্ব দাবীর পরিমাণ নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির আলোকে তা তুলে ধরেছেন। যেমন, আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আবুল ফজলের উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, "শেরশাহ তিন রকমের শস্য হার বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রতি ফসলের জন্য প্রাপ্য রাজস্ব হিসাবে এই হারগুলোর গড়ের একের তিন ভাগ স্থির করার নীতি তখনই গ্রহন করা হয়।" এই পদ্ধতি 'জবৎ' নির্ধারণ ব্যবস্থার অঙ্গ। সুতরাং, এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজস্ব হার বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইরফান হাবিব রাজস্ব হার অনুসন্ধান করেছেন বিদ্যমান রাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোকেই। কাজেই, আলোচনার সুবিধার্থে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভূমি রাজস্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরফান হাবিব সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থাকে তিনি সুসংগঠিত কর ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছেন। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান দুটি অংশঃ প্রথমত, রাজস্ব নির্ধারণ ('তশখীশ') দ্বিতীয়ত, 'আসল আদায়' ('তহসীল') এদের আবার 'জমা' (রাজস্ব ধার্যের পরিমাণ) ও 'ওয়াসিল' (আদায়ের পরিমাণ) শব্দের দ্বারা বহুলাংশে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় কৃষিবর্ষের প্রধান মৌসুমী বিভাগ অনুযায়ী 'খারিফ' (শরৎ) এবং 'রবি' (বসন্ত) ফসলের জন্য রাজস্ব ধার্য হত আলাদাভাবে। রাজস্ব বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধার্য হত। ইরফান হাবিব রাজস্ব ধার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে খুটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এ পর্যায়ে এ বিষয়ে একটি রেখাচিত্র অংকন করে আলোচনার মূল পর্বে প্রবেশ করা যেতে পারে।

'গল্লা বখশি'ঃ এটা আদৌ কোন নির্ধারণ পদ্ধতি না হলেও এ পদ্ধতিতেও অনেক অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। এটা আসলে ভাগ বা শস্য বন্টন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে চুক্তি অনুযায়ী মাঠেই শস্য দুই ভাগে বা প্রয়োজনে একাধিক ভাগে বন্টন করে দিয়ে দেয়া হত। এ ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন রূপ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'হস্ত-বুদ':ঃ নির্ধারণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি ছিল সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় নির্ধারক গ্রাম পরিদর্শন করতেন, ভালো মন্দ, দু ধরণের জমিই দেখে মোট উৎপাদনের একটা আনুমানিক হিসাব করতেন এবং তার উপরই রাজস্ব বেঁধে দিতেন। ঐ রকমেই আরেকটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হচ্ছে 'লাঙ্গল গুনতি' করে এলাকা অনুযায়ী নিদিষ্ট হার প্রয়োগ করে রাজস্ব ঠিক করা। এই সকল ব্যবস্থার ব্যাপক ত্রুটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে,"এটা আদর্শ ব্যবস্থা ছিল না।"

রাজস্ব ধার্য ব্যবহার ক্রমবিকাশে 'হস্ত-ও বুদ', পদ্ধতির পরেই 'কনকূত' পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা ও মুঘল রাষ্ট্রের সঠিক বিকাশে 'কনকূত' পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ছিল ব্যাপক। ইরফান হাবিব এ পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন,"ভাগ চাষেরই অনুরূপ এক পদ্ধতি হিসাবে এই ব্যবস্থার ভিত্তি হল প্রকৃত ফলন।"এ পর্যায়ে দুটি পদ্ধতির সাথে তুলনা করলে 'কনকূত' পদ্ধতি ছিল আপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ ও অধিক বাস্তবসম্মত।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এক সময় 'জবৎ' আদর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয় এবং সুদীর্ঘ দিন ব্যাপী বলবৎ ছিল। ' জবৎ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ আবিস্কার করতে না পারলেও ইরফান হাবিব এটিকে বোধগম্য করে তুলেছেন। এটিকে 'জরিপ' (আমল-এ -জরিপ) এর সাথে সমার্থক মনে করা হয়। পরিমাণ ও তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

পরবর্তীকালে শেরশাহ 'জবৎ' ব্যবস্থার আওতায় 'রাই' বা শস্য হার চালু করেন। ভালো, মাঝারি ও খারাপ জাতের ফসল-এ তিনহার ছিল 'রাই' এর ভিত্তি। উৎপাদনের সাধারণ হার পাওয়ার জন্য ওগুলোর গড় নেয়া হত, আর সেই গুলোর একের তিন ভাগকে বলা হত "রাজার প্রাপ্য' বা রাজস্ব দাবী বোঝাত । সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে অর্থাৎ জায়গীরদারের জন্য একে নগদে পরিণত করতে হত। আবুল ফজল বলেছেন আকবরের আমলের গোড়া থেকেই এ রীতি প্রচলিত ছিল।

তবে আকবরের শাসনামলে রাজস্ব ব্যবস্থা পদ্ধতিগতভাবে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে একটি বিশেষ রূপ লাভ করে, যা মুঘল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সামরিক ও প্রশাসনিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আকবর 'রাই' গুলোকে নগদ হারে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বছর সাম্রাজ্যের প্রতিটি এলাকা থেকে দামের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে হত। পরে বাদশাহী দরবারে সেগুলো পরীক্ষা করে অনুমোদন করা হত, আর অনুমোদিত মূল্য অনুযায়ী 'রাই'গুলোকে পরিণত করা হত নগদ হারে। এই নগদ হারকে বলা হত 'দস্তুর আল -আমল' বা শুধু 'দস্তুর'। মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূল সূত্রটিই নিহিত ছিল দস্তুরের সঠিক হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার মাঝে। অবশ্য 'দস্তুর' ও 'জমা'র মধ্যকার পারস্পারিক সম্বন্ধ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট বির্তক থাকলেও ইরফান হাবিব এই প্রসঙ্গে মোরল্যান্ডের মূল্যায়নকে নির্ভুল বলে মেনে নিয়েছেন। মোরল্যান্ড 'দস্তুর' ও 'জমার' মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করেননি।

কার্যকর করা চলে এমন রাজস্ব হারের অনুপস্থিতির দরুন এবং জমির পরিমাণ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন পরিসংখ্যান না থাকায় আকবরের রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। রাজত্বের ১১তম বছরে মুজাফ্ফর খান এবং টোডরমলের নির্দেশে রাজস্বের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে রাজস্ব নির্ধারণ ও আনুমানিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন 'জমা' খাড়া করা হয়েছিল। এই নতুন 'জমা' ও ওয়াসিলের' (প্রকৃত সংগৃহীত রাজস্ব) মধ্যকার পার্থক্য ছিল ব্যাপক। আর মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার এই দুষ্ট চক্রকে কেন্দ্র করেই মুঘল আর্থিক ব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

টানাপোড়নের সাথে সাথে প্রশাসনিক ও সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছিল। আলোচনার পরবর্তি স্তরেই রাজস্ব বরাত ব্যবস্থার সাথে রাজস্ব দাবী ও প্রকৃত আদায়ের পারস্পরিক টানাপোড়নে কিভাবে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানা মুখী সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা তুলে ধরা সম্ভব হবে।

মুঘল রাজস্ব প্রশাসনে রাজস্ব দাবী, প্রকৃত আদায় ও এর ভিত্তিতে উৎপাদক (কৃষক) ও ভোক্তার (মধ্যস্বত্বভোগী 'জমিনদার' 'চৌধুরী' 'পাটেল' ও পরবর্তিকালে জায়গীরদার) পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, শোষক শ্রেণীর বিত্ত, বৈভব, বিলাসিতার পিছনে কৃষকের অনাহার নির্যাতন ও নিপীড়নের গভীর সম্পর্ক ছিল ।

সুতরাং, প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে বাদশাহী প্রশাসন কৃষকের উৎপাদনের কতভাগ বা কি পরিমাণ দাবী করত। ইরফান হাবিব এ বিষয়ে ব্যাপক তথ্য ও উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়ে টিকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে যতটুকু পান্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা এক কথায় অসাধারণ এবং পরবর্তীকালের গবেষকদের জন্য অবশ্যই ব্যবহার যোগ্য একটি আকর গ্রন্থ। আকবর আদেশ দিয়েছিলেন যে, অর্ধেকই দাবী করতে হবে। বস্তুতঃ রাজস্ব নির্ধারণ করা হত টাকায়, ফলে জায়গীরদাররা কাগজে-কলমে অর্ধেক দাবী করলেও কার্যতঃ তা দাড়িয়ে যেত মোট উৎপন্নের অর্ধেকেরও বেশী। কিন্তু রাজস্বের এ হারকে সঠিক বলে চূড়ান্ত রায় দেয়ার পূর্বে বিভিন্ন আঞ্চলিক দাবী ও রাজস্ব আদায়ের বিচিত্র মুখী ব্যবহারের দিকটি বিবেচনা করে তিন-এর-এক ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ভূমি রাজস্ব আলোচনা করতে গিয়ে "নির্ধারণের মূল একক কৃষকের ব্যক্তিগত 'জোত' ও গ্রাম"এ শিরোনামে ইরফান হাবিব ভূমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মালিকানার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাজস্ব দাবীর বিচিত্র চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'গ্রাম সমাজ ঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা' শিরোনামে ব্যাপক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। রাজস্ব বরাত এবং রাজস্ব অনুদান প্রসঙ্গে আলোচনায় বস্তুতঃ রাজস্ব দাখিলের মাধ্যমটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উত্তর ভারত বা তার মধ্য অঞ্চলের চাষীরা নগদে তাদের রাজস্ব দিত প্রায় ১৩শতক থেকে। আইনের উল্লেখ অনুযায়ী ভারতের 'গড়'এর চাষীরা রাজস্ব জমা দিত সোনার মোহরে আর তামার পয়সায়। এই সকল কারণে ইরফান হাবিব বলেন যে, "সম্ভবত 'নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কাশ্মীর ও উড়িষ্যার মত কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বা রাজপুতনার জনহীন অংশ বিশেষ বাদ দিলে, সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশেই 'নগদ' সর্ম্পক বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।" এর প্রচলন থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে, রাজস্ব দাবী মিটানোর জন্য চাষীদের সাধারণত তার উৎপন্নের বেশ বড় একটা অংশ,-অনেক ক্ষেত্রেই বৃহত্তর অংশ বেচে দিতে হত। আর নগদ দাবীর ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপর গ্রামীন মহাজন ও ব্যবসায়ীর ভাগ তৈরী হল বা বাড়ল।

ইরফান হাবিব ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর মূলের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ফলে, কৃষি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। মুঘল ভারতের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল নিহিত ছিল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উপর। ইরফান হাবিব ধরেই নিয়েছেন যে, বাদশাহী প্রশাসনে নগদ সম্পর্ক চালু ছিল যা উন্নত ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমাজের সৃষ্টি। আবার এই সম্পর্কই ছিল মুঘল 'সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার' কাঠমোর আসল ভিত্তি। এই ব্যবস্থায় জমির অধিকারের উপর জোর দেয়া হতনা, জোর দেয়া হত শাসক শ্রেণীর সদস্যদের ভূমি-রাজস্ব আদায় করার অধিকারের উপর। সুতরাং, ষষ্ঠ অধ্যয়ে 'ভূমিরাজস্ব' শিরোনামে তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন তার উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত তৎকালীন দলিল দস্তাবেজ। পরবর্তিকালের গবেষণার উপর আনুপাতিক বিচার বিশ্লেষন,তথ্য বা উপাত্তের ত্রুটি বিচ্যুতির বিভিন্ন দিক আবিস্কার করা। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রাপ্ত নথিপত্রের বিশদ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষন করতে গিয়ে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন গুরূত্বপূর্ণ মোড়গুলোর প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, তিনি মুঘল কৃষি ব্যবস্থার জটিল গ্রন্থিগুলো 'রাজস্ব বরাত' অধ্যায়ে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন।

সপ্তম অধ্যয়ের রাজস্ব বরাত প্রশ্নে ব্যাপক আলোচনার বিভিন্ন পর্বে কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট মুঘল বাদশা, প্রশাসক, জায়গীরদার, মনসবদার, তালুকদার, জমিনদার, চৌধুরী, প্যাটেল, ভূমিয়া ইত্যাদি ভোক্তাশ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভূমি রাজস্বের দাবীদার বিভিন্ন শ্রেণী, মধ্য স্বত্বভোগী শ্রেণীগুলোর অভ্যন্তরীন পারস্পারিক টানাপোড়নে বা দ্বন্দ্ব সংঘাতে, সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী স্বার্থের স্বরূপ, কৃষির বিকাশ, কৃষি সমস্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ, কৃষক শোষন, শোষণের পরিমাণ ও পর্যায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন। অতপর ভূমি-রাজস্বে বিভিন্ন শ্রেণীর দাবীপূরণে মুঘল প্রশাসনের গৃহীত ব্যবস্থা, কৃষি সংকট ও কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তিনি অন্বেষন করেছেন। আর মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মুঘল কৃষি ব্যবস্থাপনা, তথা ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মুঘল কৃষি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি আবিস্কার করেছেন, যার পথ ধরে প্রথমে আর্থিক সংকট, পরে তা প্রশাসনিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংকটের রূপ নেয়।

কাজেই 'রাজস্ব বরাত' ও রাজস্ব 'অনুদান' এই শিরোনামদ্বয়ে ইরফান হাবিব যেসকল আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার মৌলিক দিকটি নিয়ে তেমন জুরালো কোন প্রশ্ন না তোলা গেলেও সম্প্রতি সতীশ চন্দ্র, দিলবাগ সিং, এন, এ, সিদ্দিকী, ইক্তিদার আলম, গৌতম ভদ্র, আত্হার আলী প্রমুখ পন্ডিতদের গবেষণাকর্মে চিন্তার অনেক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। সুতরাং, বর্তমান আলোচনায় ইরফান হাবিবের বিভিন্ন মতামত একটু বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক শ্রেণীর আয়ের প্রধান উৎস ছিল রাজস্ব বরাত। বিভিন্ন এলাকায় রাজস্ব বরাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বলা হত জায়গীরদার এবং প্রদত্ত রাজস্ব বরাতকে বলা হত "জায়গীর"। ইরফান হাবিব বলেন, 'জায়গীরদারগন' ছিলেন সাধারণত 'মনসবদার', বাদশা তাঁদের যে পদ (মনসব) দিয়েছেন তার অধিকারী। সুতরাং, জায়গীরদাররা ছিলেন সম্রাটের অধিনস্থ কর্মচারী মাত্র এবং তাঁদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর প্রদান করা হত। অথাৎ, জায়গীরদাররা ছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত রাজস্বের একাংশের অধিকারী। এর ফলে জমির উপর তাঁর কোন মালিকানা স্বত্ব জন্মাত না। আর মুঘল শাসন ব্যবস্থায় 'মনসব' বা পদের মাধ্যমে এই সমস্ত জায়গীরদারদের স্থান নির্ণয় হত। মনসব ব্যবস্থায় 'জাঠ' ও 'সওয়ার' এর প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। ঐ আলোচনার ভিত্তিতেই বলা যায় যে, জাত 'ও সওয়ারের' যৌথ ভিত্তিতেই মুঘল মনসবদারদের বেতন ঠিক হত। এই বেতন সে সময়ে সময়ে নগদে পেত, তখন এদের বলা হত 'নগদি'। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সরাসরি বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের ভূমি-রাজস্ব ও সম্রাটের অনুমোদিত অন্যান্য করের অধিকারী হত এই মনসবদাররা। এই জাতীয় মনসবদারদের নামই ছিল 'জায়গীরদার'।[১৮] মনসবদারের বেতন 'নগদ' দেয়া হবে, না জায়গীরের মাধ্যমে দেয়া হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব ছিল সম্রাটের। আবার জায়গীরের মধ্যেও দুটো ভাগ ছিল, বেতনের পরিবর্তে যে জায়গীর প্রদান কর হত, তাকে বলা হত 'তন্খা' আর হিন্দু সামন্ত রাজা ও দেশীয় প্রধানদের বংশানুক্রমিক দখলী স্বত্ব, যা আকবরের শাসনামলে মুঘল কোষাগারের আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায় তাকে বলা হত 'ওয়াতন' বা জমিনদারের নিজস্ব দখলী স্বত্ব।[১৯] 'ওয়াতন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বাস্তভিটা'। হিন্দু জমিনদার ও রাজাদের রাজ্যগুলো মুঘল শাসনের অর্ন্তভুক্ত হলেও এগুলো ছিল স্বয়ংশাসিত। ইরফান হাবিব জমিনদারী ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে একটি উপাধ্যায়ে 'স্বায়ত্তশাসিত প্রধান' শিরোনামে বিস্তরিত আলোচনা করেছেন যা অত্যন্ত ইতিবাচক ও পর্যাপ্ত । কাজেই প্রাসঙ্গিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে এই বিষয়টি আলোচনায় আসলে ইরফান হাবিবের আলোচনায়ই ছিল যথার্থ ঐতিহাসিক ভিত। এ ক্ষেত্রে 'ওয়াতন' জায়গীরের দু-একটি বৈশিষ্টের কথা ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন, যা আমাদেরকে জায়গীরদারী ব্যবস্থার প্রকৃতি ও স্বরূপ যথার্থভাবে বুঝতে সাহায্য করত। প্রথমতঃ মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার 'জমা' এবং তদানুযায়ী মনসব বিলি বন্টনের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ 'ওয়াতন' জায়গীর বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ দখল করা চলত এবং এতে মুঘল জায়গীরদারী ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম, (বদলী) ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল না। এই সকল কারণে বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা গেলেও অনুরূপভাবে 'ওয়াতন' জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা যেত না। পরবর্তীকালে শক্তিশালী জায়গীরদাররা এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের 'তন্‌খা' জায়গীরকে 'ওয়াতন' জায়গীরে পরিণত করতে চাইত। 'ওয়াতন' জায়গীরদারের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে অথবা পূর্ব হতে যদি তাঁরা এরূপ পদ ভোগ করত, যে গুলির বেতন পুরোপুরিভাবে তাঁদের 'ওয়াতন' জায়গীরের 'জমাদানী' হতে পূরণ করা যেত না, তাহলে 'ওয়াতন' জায়গীরের সহিত তাঁরা অতিরিক্ত 'তন্‌খা' জায়গীর লাভ করত। [২০]

ইরফান হাবিব জায়গীরদারী সংস্থার প্রকৃতি ও স্বরুপ সর্ম্পকে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, "সাধারণত জায়গীর দেয়া হত বেতনের বদলে, তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন একটি এলাকা ঠিক করা দরকার পড়ত যেখানকার রাজস্ব অনুমোদত বেতনের সমান হবে।"[২১] কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল, তার সত্যিকার অবস্থান বুঝতে পারা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে জায়গীরদারী ব্যবস্থা কিভাবে মুঘল প্রশাসনের অপরিহার্য সংস্থায় পরিণত হয় এবং এই সংস্থার চূড়ান্ত প্রাধান্য জনিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা দেয় না। সুতরাং, ও পর্যায়ে জায়গীরদারী সংস্থার প্রকৃতি ও স্বরূপ উৎঘাটন, পরবর্তী মুঘল শাসনে এই সংস্থাকে ঘিরে সৃষ্ট সমস্যা ও মুঘল প্রশাসনের উপর গভীর ধবংসাত্বক প্রভাব, যা মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে টেনে নেয় তা তুলে ধরা যেতে পারে।

জায়গীরদারী সংস্থার প্রকৃতি তুলে ধরতে গিয়ে এন. এ. সিদ্দিকী বলেন, "পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতকে জায়গীরদারী সংস্থা যথেষ্ট জটিলতা অর্জন করে এবং বহুবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ ঘটে। কারণ জায়গীর হিসাবে বন্টিত জমির উপর রাষ্ট্রের ও জায়গীরদারের যুগ্ম কতৃত্ব থাকত। একদিকে জায়গীরের আয় নিরূপনের হিসাব করত রাজস্ব মন্ত্রক, অপরদিকে বাস্তবে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ করত জায়গীরদার অথবা তাঁর গোমস্তা।"[২২] ফলে জায়গীর ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় 'জমা' ও হাসিলের মধ্যকার পার্থক্য। এই সমস্যার মূলে মুঘলদের গৃহীত প্রশাসনিক নীতি দায়ী ছিল, অবশ্য ঐ সময়ে বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে উন্নত কোন ব্যবস্থার প্রয়োগও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, আবুল ফজল সন্দেহাতীতভাবে বলেছেন যে,"জায়গীরগুলো বাদশাহী আদেশ দ্বারা শাসিত ছিল এবং রাজস্ব কিভাবে নিরূপন ও আদায় করতে হয়ে তা যথার্থ ভাবে উল্লেখ থাকত"[২৩] এই ব্যবস্থা পুরোপুরি অটুট না থাকলেও তার নীতি গুলো বাস্তবায়নে প্রায় সমর্থ ছিল বলে ইরফান হাবিব মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে এই সংস্থায় নানা রকমের সমস্যা চতুরদিক থেকে আক্রমন করে বসে। কাজেই সে এক ভিন্ন প্রেক্ষিত যা জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটে আলোচনায় আসতে পারে। রাজস্ব প্রশাসনে জায়গীরদাররা বাচনিকভাবে রাজস্ব আদায় ছাড়াও শুধুমাত্র সেই সকল কর ও শুল্ক আদায় করতে পারত যেগুলো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'আকবরের রাজত্বে এই অনুপম সংস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয় বটে। কিন্তু মৌলিক কাঠামো হতে এই সংস্থার পরবর্তী যৌগিক রূপান্তর সম্রাট শাহ্জাহানের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। আকবরের আমল হতেই এই সংস্থার নিয়মিত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং মুঘল শাসনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সহজেই একে প্রভাবিত করে। এই সংস্থার পরিবর্তন বা বিকাশের ক্ষেত্রে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসার, কেন্দ্রীয় শাসনের হ্রাস বৃদ্ধি, মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষক ও জমিনদারের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি ইত্যাদি কারণগুলো গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কতিপয় উপায় গবেষকরা উপস্থিত করেছেন, যা মুঘল প্রশাসনে আংশিক প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়ে, দ্বিতীয়তঃ কৃষির উন্নতি বা চাষবাদের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করে, তৃতীয়তঃ কৃষি পণ্যের বাইরে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, চতুর্থতঃ কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে।[২৪] সুতরাং, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটার সাথে সাথে একদিকে যেমন জায়গীরদারী ব্যবস্থার স্থিরতা আসার সম্ভবনা দেখা দিত, পক্ষান্তরে নতুন অবস্থার নিরিখে এতে জটিলতা উদ্ভবেরও সম্ভাবনা থেকে যেত। জায়গীরদারী ব্যবস্থার পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল। এখানে এ ব্যাপারে ইরফান হাবিব যর্থাথ স্পষ্ট হতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে কিছু বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ ভূমি-রাজস্ব স্বত্ব বিলির মাধ্যমে অর্থ প্রদান তথা সরকারী কর্মচারীর বেতন প্রদান করার প্রণালীকে জায়গীরদারী পদ্ধতি বলা হত। অর্থ প্রদানের এক বিশেষ প্রণালী হিসাবে জায়গীর বিলির অর্থই হল এই যে, জায়গীর গ্রহিতার অধিকার প্রদত্ত মহালের রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং বিলি ব্যবস্থার হুকুম নামায় তা বিশেষভাবে উল্লেখ থাকত।[২৫] এই প্রসঙ্গে ইরফান হাবিবের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি মনে করেন প্রতি একক এলাকার জন্য একটা স্থায়ী নির্ধারণী বা 'জমা' তৈরী করা হত। এই একক হত, গ্রাম আরও বিশেষভাবে 'পরগণা' বা'মহাল'। আবুল ফজলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "এই ধরনের 'জমা' বের করাই ছিল আকবরের রাজস্ব নীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।" আকবরের আমলের পূর্বে "জমা-ই-রকমীর" বর্ধিত রূপ তুলে ধরেছেন।[২৬] জায়গীরদারী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন সর্ম্পকে ইরফান হাবিব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "'বরাতিরা' যাতে তাঁদের দায় দায়িত্ব ঠিক মত পালন করে তার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে কঠোর ব্যবস্থা অনেকটা বোধ হয় ছিল শুধু কাগজে কলমে।"[২৭] তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, জায়গীরদার একটি বিশেষ মর্যাদার সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর পদমর্যাদার উপযুক্ত বেতনের পরিবর্তে নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যেই তাঁর অধিকার সীমিত ছিল। জায়গীরদার হিসাবে তিনি রাজকীয় আইন কানুন বিরোধী কোন কর্ম বা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। অন্যান্য ক্ষমতা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও সমকালীন প্রাপ্ত নথিপত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জায়গীরের অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক কার্য তাঁর আওতাভুক্ত ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্ম বাদশাহী নিয়ম কানুনেই চলত। এ ক্ষেত্রে জায়গীরদার বিশেষ কোন অধিকার ভোগ করত না । জায়গীরদারের প্রশাসনিক ক্ষমতাও ছিল না।[২৮] ভূমি রাজস্ব ব্যতিত অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের ব্যাপারে প্রচলিত বাদশাহী কানুনের বাইরে যাওয়ার কোন রকম সুযোগ ছিল না। ইরফান হাবিব অনড় ও জটিল নিয়ম কানুন সম্বলিত বরাত ব্যবস্থায় 'নকল নবীশ' ও হিসাব রক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তাঁদের কর্মকান্ডকে জায়গীরদারের স্বার্থের পরিপন্থি 'কেন্দ্রীয় সরকারের এক আপদ' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯] সুতরাং, জায়গীরদারের উপর বাদশাহী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতিগত দিকটি তিনি স্বীকার করলেন সত্য, তবে তিনি এই বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যাংশ হিসাবে প্রায় সর্বত্রই ঘুষের চল ছিল। ফলে বরাত ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভবের সম্ভাবনা এর নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতিগত কর্মকান্ডেই নিহিত ছিল।

মুঘল প্রশাসন প্রথম থেকেই জায়গীরদারের বাদশাহী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মুঘল প্রশাসনের গৃহীত এই সমস্ত ব্যবস্থাদি হতে জায়গীরদারী সংস্থার প্রকৃতি ও এর ক্রমবিকাশের পর্যায় সম্পর্কেই শুধুমাত্র ধারণা লাভ করা যায় না, বরং এই সংস্থার অর্ন্তনিহিত দুর্বলতা গুলো উন্মোচনের সাথে সাথে এর

Dhaka University Institutional Repository

সংকটেরও চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ইরফান হাবিব মনে করেন, বরাত ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল মূলত দুটি সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য। প্রথমটি বাদশাহী নিয়ন্ত্রণের সমস্যা ও দ্বিতীয়টি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জায়গীরদারের অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রনের সমস্যা।[৩০] আর এই দুটি প্রান্তিক সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনে বাদশাহী সরকার তাঁর নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে তিনটি সুর্নিদিষ্ট উপাদান গড়ে তুলে। প্রথমতঃ জায়গীরদারের কর্মচারী ও প্রতিনিধিরা, দ্বিতীয়তঃ স্থায়ী স্থানীয় কর্মচারী। এদের পদ নির্ভর করত কিছুটা জন্মসূত্রে এবং কিছুটা বাদশাহী কর্তৃপক্ষের উপর, তৃতীয়তঃ পুরোপুরি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কর্মচারী, যারা জায়গীরদারের সাহায্য ও নিয়ন্ত্রন দুটি কাজে লাগে। এই পর্যায়ে ইরফান হাবিব "রাজস্ব প্রশাসনের পরিচালন ব্যবস্থা" এই শিরোনামে এই সংস্থার বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মতৎপরতা, নিয়ন্ত্রন, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে জায়গীরদারী ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। তা সত্বেও তাঁর আলোচনায় কোন কোন বিষয় বেশ প্রাধান্য পেলেও কিছু কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এখন ইরফান হাবিবের আলোচনার এই ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জায়গীরের অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক কার্যকলাপ বাদশাহী নিয়ম কানুনেই চলত। জায়গীরদারকে দপ্তর অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব ধার্য করতে হত এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে শস্যের ক্ষতি হলে সম্রাট কর্তৃক মওকুফকৃত অংশের সাথে সাথে জায়গীরদারকেও তাঁর প্রাপ্য অংশের কিয়দংশ ছেড়ে দিতে হত। সম্রাটরা বকেয়া পাওনা পর্যন্ত মাফ করতে পারতেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে জায়গীরদার বাদশাহী আদেশ পালনে বাধ্য ছিলেন।[৩১] কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাদেশিক দেওয়ান বাদশাহী আদেশের মূল বক্তব্য বিষয়গুলো জায়গীরদার ও তাঁর গোমস্তাকে জানিয়ে দিতেন। কেন্দ্রীয় সরকার জায়গীরদারদের নিয়ন্ত্রনের একটি গুরুত্বপুর্ন সংস্থা গড়ে তুলেন, এর নাম ছিল "সাওয়ানিহ নিগর"। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে এর কাজ ছিল জায়গীরভুক্ত অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতির বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করা। যদি কখনো জায়গীরদারের বিরুদ্ধে প্রজা উৎপীড়ন বা রাজদ্রোহী মূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ পাওয়া যেত, তবে তাঁকে বরখাস্ত করা, বদলী করা ইত্যাদি দন্ডে দন্ডিত করা হত। ইরফান হাবিব এই ধরনের শাস্তিকে গুরু অপরাধে লঘু দন্ড বলে অভিহিত করেছেন। জায়গীরদারের বরাতকৃত সীমানায় তাঁর নিজস্ব কর্তৃত্ব বলতে কিছুই ছিলনা। তিনি বাদশাহের একজন কর্মচারী হিসাবে তাঁর বিশাল প্রশাসনের একটি অংশের রাজস্ব বরাত প্রাপ্তি সাপেক্ষে সামরিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং, জায়গীরদার তাঁর নিজস্ব প্রতিভা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রশাসনিক গতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে কখনোই যত্নশীল ছিলেন না। এর কারণ হিসাবে আমরা জায়গীরদারী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীন দুর্বলতাকে দায়ী করতে পারি। কারণ, জায়গীরদারের উপর বাদশাহী নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার লক্ষ্যে অথবা জায়গীরদাররা যাতে অত্যধিক ক্ষমতাশালী হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিতে না পারে সেজন্য তাঁদের জায়গীরকে ৩-৪ বছরের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী করা হত। বস্তুতঃ কৃষকের স্বার্থ বজায় রাখতে এবং জায়গীরদারদের সরকারের নির্দিষ্ট বিধি নিষেধের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে জায়গীর হস্তান্তর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ছিল অবশ্যম্ভাবী।[৩২] তাই প্রশাসনিক শান্তি ও স্থায়ীত্ব এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধিকতর নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার প্রয়োজনেই জায়গীরদারদের একই এলাকায় কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া অপরিহার্য ছিল।[৩৩] আকবরের এমন নীতি কালক্রমে মুঘল ভূমিরাজস্ব পরিচালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও মুঘল প্রশাসন তাঁর নিজস্ব কর্মচারীদের (কানুনগো, ওয়াকিয়ানবিশ, কাজী) ইত্যাদির মাধ্যমে জায়গীরদাররা আইনতঃ সরকারী নিদের্শের এক পাও বাইরে যেতে পারতো না। আর এভাবেই মুঘল জায়গীরদাররা সরকারী প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত ছিলেন।

জায়গীরদারীর আওতাধীন এলাকায় ভূমি-রাজস্ব পরিচালন কার্যাবলীর উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখার উদ্দেশ্যে বাদশাহী প্রশাসন স্থানীয় পর্যায়েও প্রয়োজনীয় প্রশাসন গড়ে তুলেছিল। রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের অধিকার জায়গীরদারের

Dhaka University Institutional Repository

হাতে থাকলেও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা ফৌজদারের হাতে থাকত এবং তিনি ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের সহিত সংশ্লিষ্ট থেকে জায়গীরের মধ্যে ঐ পরিচালনের সাধারণ তদারকিও করতেন।[৩৪] বাদশাহী দরবার হতে নিয়োগ প্রাপ্ত কয়েক জন স্থানীয় কর্মচারী (আহ্‌ল-ই- খিদমত) 'চৌধুরী' কানুনগো, কাজী ইত্যাদি জায়গীরদারের গোমস্তাগণের কার্য কলাপের উপর নজর রাখতেন। এই সকল কর্মচারীর দ্বিতীয় দায়ীত্ব ছিল রাজস্ব মন্ত্রকের নিকট প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট পেশ করা, যাতে করে রাজস্ব মন্ত্রক জায়গীরের অর্ন্তভুক্ত ভূমি-রাজস্ব পরিচালনে নজর রাখতে পারে। কাজী প্রকৃত পক্ষে বিচার বিভাগীয় কর্মচারী হলেও, স্থানীয় ভূমি পরিচালনের সহিত তিনি কোন না কোনভাবে জড়িত থাকতেন।[৩৫] ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল পত্রে তিনিই স্বাক্ষর করতেন। উপরন্ত স্থানীয় 'মহাফেজ' খানায় দলিল হিসাবে গচ্ছিত রাখার পূর্বে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব হিসাব নিকাশের কাগজ পত্র নিরীক্ষা করে তাঁকেই স্বাক্ষর করতে হত। অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একই স্থানে 'ফৌজদার' ও জায়গীরদার হিসাবে দাযিত্ব পালন করতেন।[৩৬] সে ক্ষেত্রে জায়গীরদারের বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ ছিল। তবে মুঘল প্রশাসন সর্বদাই এই ব্যাপারে কঠোর ছিল।

তবে জায়গীরদারী ব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর স্থানান্তর প্রক্রিয়া। এতক্ষন জায়গীরদারী ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রন বজায় রাখা ও এর সুষ্ঠু পরিচালনে কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বদলী ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে মুঘল প্রশাসনে বিশিষ্টতা অর্জন করে। 'বরাত স্বত্ব' মহলে জায়গীরদারের কোন প্রকার নিজস্ব দাবী বা স্বত্ব- না থাকলেও দীর্ঘকাল ধরে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকায় জমিতে স্থায়ী স্বত্ব অর্জন করা বা স্থানীয় যোগাযোগের মাধ্যমে যে কোন উপায়ে জমির মালিকানা স্বত্ব কায়েম করা জায়গীরদারের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এই সম্ভাবনা থেকে জায়গীরদার কর্তৃক বাদশাহী প্রশাসন যাতে কোন প্রকার ক্ষতির শিকার না হয় সে উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থায় নিয়মিত বদলীর ব্যবস্থা পাকাপোক্ত ছিল। জায়গীর স্থানান্তর বা বদলী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইরফান হাবিব বলেছেন যে, "খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার জায়গীর হস্তান্তরের ফলে কোন বিশেষ জায়গীর প্রায়ই একই লোকের হাতে তিন-চার বছরের বেশী থাকত না। আকবর এই রীতিকে পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হতে আলোচ্য পর্বের শেষাবধি এই রীতি কঠোর ভাবে মেনে চলা হত।" তিনি বদলী ব্যবস্থার কুফল, স্বরূপ, জায়গীরদারী ব্যবস্থায় সৃষ্ট বিভিন্ন জটিলতা তুলে ধরেছেন। যেমন প্রথমতঃ বরাতের সময় বিভিন্ন মৌসুমের (রবি ও খারিফ) শস্যের মূলমান সমান ধরা হত, যা বাস্তব সম্মত ছিল না দ্বিতীয়তঃ কখনো কখনো জায়গীর হস্তান্তরের ফলে জায়গীরদার ক্ষতির শিকার হতেন যে, তাঁকে নতুন ও পূর্বতন, দুই জায়গীরই রাজস্ব হারাতে হত-হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, না হয় প্রশাসনিক জটিলতার জন্যে। আবার কখনো কখনো বরাতিকে রাজস্ব আদায়ের পূর্বেই বদলী করা হলে সে সম্পূর্ন ক্ষতি গ্রস্থ হত।[৩৭] কিন্তু ইরফান হাবিব জায়গীর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার দিকটি স্পষ্ট করেননি। কেননা, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার উদ্দেশ্যই জায়গীর হস্তান্তর করা হত না, এর অন্য কারণও ছিল। কোন মনসরদারকে কোন প্রদেশে চাকুরী দেয়া হলে সেখানে তাঁকে জায়গীর বরাদ্ধ করতে হত। আবার কখনো কখনো বরাতিকে পুর্নরাহব্বান করা হলে তাঁকে অন্যত্র জায়গীর বরাদ্দ করতে হত। এই পর্যায়ে আত্হার আলী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, বাদশাহী প্রশাসন সবর্দাই চেষ্টা করত যাতে করে জায়গীরদাররা তাঁদের প্রাপ্ত অঞ্চল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে। আর তাই জায়গীর বরাদ্দের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হত। শাসকগণের ১-৪ অংশ জায়গীর উপদ্রুত অঞ্চলে (জোর তলব) এবং অবশিষ্টাংশ মাঝামাঝি অঞ্চলে (উসাৎ) থাকতে হবে, দিওয়ান, বক্সী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ মনসবদারদের অর্ধেক জায়গীর মাঝামাঝি অঞ্চলে এবং অবশিষ্টাংশ রাজস্ব প্রদায়ী (রায়তী) অঞ্চলে থাকতে হবে। সকল মনসবদারের জায়গীর সম্পূর্ণভাবে রায়তী অঞ্চলে প্রদান করতে হবে। এই ভাবে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য জায়গীর হস্তান্তর ছিল অপরিহার্য। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই আমত্য ও সমরনায়কগণকে ও সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বিস্তার এবং স্থানীয় রাজার মত হয়ে উঠতে নিবৃত্ত করা হত।[৩৮] এতক্ষন জায়গীরদারী ব্যবস্থায় বদলীর পিছনে যে সকল কারণ কার্যকর ছিল তা নিয়ে আলোচনা কর হল। কিন্তু এই বদলী ব্যবস্থার কারণে জায়গীরদারী পদ্ধতিতে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর পরণতি সম্পর্কে জায়গীরদারী ব্যবস্থায় সংকট আলোচনা করা অপরিহার্য।

ইরফান হাবিব মনে করেন, বরাত ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিতে শুরু করে আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে। একথা সত্য যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে জায়গীরদারী প্রথা এরূপ কয়েকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়, যা এই সংস্থার প্রবাহমানতার মূলে আঘাত হানে এবং স্থায়ীত্বে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়। জায়গীরদারী সংস্থার সংকটের কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'জমা' ও 'হাসিল' এর মধ্যকার পার্থক্য। 'জমা' ও 'হাল-ই হাসিল' হ্রাস করার চেষ্টায় আকবরের আমলেই দিল্লী প্রদেশের একটি জায়গীরের 'জমা' নিয়ে প্রশাসন ও ভাবী বরাতীর মধ্যে দর কষাকষি চলেছে।[৪০] হকিন্স অভিযোগ করেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত ও বেতনের চেয়ে তাঁর জায়গীর গুলোর রাজস্ব প্রদায়ী ক্ষমতা কম।[৪১] পেলসাটের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরফান হাবিব বলেন যে,"কাগজ পত্রে যে রাজস্ব নির্ধারণ করা থাকে বরাতি সাধারণত তার মাত্র অর্ধেক আদায় করতে পারে।"কাজেই বিভিন্ন জায়গীরের প্রকৃত আদায় ও 'জমা দামীর' মধ্যে ব্যবধানের কারণে যে অসুবিধা ও অবিচার হত তা দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত শাহ্জাহানের আমলে একটি নতুন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন আর 'ওয়াসিল' এর সঙ্গে 'জমা-দামীকে' পুরোপুরি মেলানোর চেষ্টা করা হয়নি, বরং তথ্য হিসাবে এ দুয়ের পার্থক্য স্বীকার করে নেয়া হয়। আর প্রতি 'মহালে' তার আদায় ও স্থায়ী নির্ধারনের মধ্যে বাষিক পরিবর্তনের হার হিসেব করে সেটিকে মাস অনুপাতের (মাসওয়ার) অংকে লিখা হয়। এইভাবে যে জায়গীরে চলতি ও ওয়াসিল 'জমার 'সমান, তার নাম দেয়া হয় 'বার মাসী' যেখানে অধের্ক তার নাম 'ছ মাসী'। এরই স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে নগদ বেতনের ক্ষেত্রেও মাস অনুপাত ব্যবস্থা চালু করা হয়।[৪২] ইরফান হাবিব উল্লিখিত তথ্যের সাহায্যে মুঘল প্রশাসনের অন্যতম প্রধান সমস্যা 'জমা'ও 'হাসিলের' মধ্যকার ব্যবধান থেকে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান কল্পে গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে মুঘল প্রশাসনিক সমস্যার গোড়ার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেননি। মূলতঃ শাহ্জাহান মনসবদারের মোট আয় ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা হ্রাস করেছিলেন এবং জায়গীর থেকে সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক তৃতীয়াংশ ও এক চর্তুথাংশ রাজস্ব নির্ধারণ ও নিয়মিত মাসিক আদায়ের (মসওয়ার) ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে খুব কম মনসবদারকেই আট মাসের বেশী সময়ের জন্য জায়গীর দেয়া হত,[৪৩] প্রায়ই এই সময় সীমা হত আরও কম, চার মাস। এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিকে মনসবদারের ('সওয়ায়') তাজা ঘোড়ার সংখ্যা হ্রাস পায়, অন্যদিকে তাঁর শক্তি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। জায়গীরদার নিজের শক্তির বাইরে কোন না কোন ভাবে অন্য শক্তির উপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। সতীশ চন্দ্র এটাকে জায়গীর ব্যবস্থায় একটি 'আবর্তচক্র' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যা পরবর্তীকালে ভাঙ্গা ছিল দুঃসাধ্য।

শাহ্জাহানের সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য ছিল জায়গীরদারের বেতন হার পুনর্নির্ধারণ। এতে কোন একজন মনসবদার 'সওয়ার' এ সূচিত সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যার প্রকৃত অশ্বারোহী রাখতে পারবে না। মাসিক রীতিতে বেতন হার পুনর্নির্ধারনের ফলে অধিকাংশ মনসবদার বৎসরে ছয় হতে আট মাসের বেতন পেত।[৪৪] এইভাবে বাহ্য আড়ম্বর রক্ষা করা হল,"আয়ত্তাধীন সম্পদকে আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করা হল।"সতীশ চন্দ্র মনে করেন যে, "শাহ্জাহানের এই সংস্কারের পরেও মনসবদারেদের নীট বেতন হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পেয়েছিল।"[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্জাহানের সংস্কারাবলী জায়গিরদারী ব্যবস্থায় বিরাজমান সংকটকে সাময়িক প্রশমিত করলেও এই সমস্যা সমাধানে কোন স্থায়ী ফল বয়ে আনেনি।কারণ রাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত সম্পদ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সংস্থান করতে সমর্থ ছিল না। ফলে রাজস্ব খাতে বিরাজমান ঘাটতি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মারাত্মক আকার ধারণ করে। অবশ্য আকবরের শাসনামলে 'খালসা' ও জায়গীরের আয়ের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয়ার চেষ্টা করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা আর বজায় রাখা সম্ভব হয়ে উঠেনি।[৪৬] যদিও সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ রাজস্বই জায়গীরদারের আওতায় থাকত, তাসত্ত্বেও 'খালসা'র আয় কেন্দ্রীয় সরকারের চাহিদার বিরাট- অংশ পূরণ করত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে 'খালসা' থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল সাম্রাজ্যের মোট আয়ের ২৩ ভাগের এক ভাগ । শাহ্জাহানের সময় 'খালসা' থেকে আয় হয় ১২০ কোট দাম-যেখানে মোট 'জমা' ছিল ৮৮০ দাম। অথাৎ গোটা সাম্রাজ্যের ৭ ভাগের এক ভাগ ছিল 'খালিসা' ভূমি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দশ বছরে রাজস্বের মোট ৯২৪ কোটি দামের মধ্যে ৭২৫ কোটি দামই জায়গীরদারদের ভাগে যেত। অর্থাৎ রাজস্বের ৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র 'খালিসার' আওতায় পড়ে।[৪৭] সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খালিসার আয় যা ছিল তা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে শাহ্জাহানের সময় তা ছিল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তুলনামূলক সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে।

ইরফান হাবিব যদিও মনে করেন যে, জায়গীরদারী ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিতে শুরু করে আওরঙ্গজেবের আমলের শেষ দিকে; তাসত্ত্বেও এই কথা বলা যায় যে, এই সংস্থার সংকটের বীজ উপ্ত ছিল এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। কেননা, এই সংস্থার অবনতির কারণ এর নিজস্ব দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত ছিল। এবং প্রারম্ভকাল থেকেই এই অবনতির লক্ষনগুলো অংকুরিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। মুঘল জায়গিরদারী ব্যবস্থা শুরু থেকেই 'জমা' ও 'হাল-ই-হাসিলের' বিরাট ব্যবধান সর্বদাই দুশ্চিন্তার উদ্রেক করত। আকবর রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে এই সমস্যার মূলরূপটি আবিস্কার করে 'জমা' ও 'হাসিলে'র মধ্যকার পার্থক্য হ্রাস করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা আকবরের রাজত্বকালে বহুলাংশে সফল হয়েছিল কতিপয় কারণে, যেমন এই সময় ক্রমাগত নতুন সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। আকবর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও দক্ষ কিছু লোকের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছিলেন, যারা সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা পালন করেছিলেন। আকবর মুঘল শাসনকে সার্বিক কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মনসবদারদের উপর বাদশাহী প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রন আকবরের গৃহীত সংস্কারের সফলতার পিছনে বহুলাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু-আকবরের অর্জিত সফলতা জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বজায় থাকেনি। আর এর পিছনে পরবর্তীকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিই বহুলাংশে দায়ী হলেও এ কথা বলা যায় যে, আকবর জায়গীরদারী ব্যবস্থার অন্তনর্হিত দুর্বলতাগুলো নিরাময় করতে সমর্থ ছিলেন না। আর এই প্রেক্ষিতে শাহ্জাহানের গৃহীত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইরফান হাবিব জায়গীরদারী ব্যবস্থায় বদলীজনিত সমস্যার জটিলতা তুলে ধরে প্রতিক্রিয়ার উপর মোটা দাগে আলোকপাত করেছেন। এই পর্যায়ে একথা অনেকটা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, জায়গীরদারী পদ্ধতির স্থিতিশীলতা বিলোপে জায়গীর হস্তান্তর প্রথা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে।[৪৮] কারণ, এই ব্যবস্থার ফলেই জায়গীরদার, জমিনদার ও কৃষকের উপর উচ্চ হারে করের বোঝা চাপিয়ে জমিনদার ও কৃষক শ্রেণীর বিনাস করে, বাদশাহী প্রশাসন, জমিনদার ও কৃষক এই তিনের মধ্যে গড়ে উঠা ভারসাম্যের নীতি অনেকটা খর্ব করে দেয়। অধিকন্তু এই ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে মনসবদারের সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছিল। কেননা একটি জায়গীরের পুনর্গ্রহন এবং তার স্থলে বিকল্প জায়গীরের রাজস্ব বিলি ব্যবস্থা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ছিল। এই মধ্যকালীন সময়ের জন্য "মহল-ই পায়বাকী" দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পুণ গৃহীত জায়গীরের তদারকি করতেন। যে কোন সময় এরূপ বহু মনসবদারের খোঁজ পাওয়া যেত, যাদের নাম সরকারের বেতন তালিকায় থাকলেও জায়গীরবিহীন অবস্থায় তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

দিন কাটাতে হত। যথার্থ সময়ে তাঁদের দাবীর মিমাংসা করা হলেও হিসাব নিকাশের নিষ্পতিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হত। আর সে সময়ের জন্য সরকার মনসবদারদের বেতন স্থগিত রাখত। সুতরাং, জায়গীর হস্তান্তর প্রথার সুযোগ নিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকা সত্ত্বেও মনসবদারদের আর্থিক দাবী কোন এক অনির্দিষ্টকালের মধ্যে পূরণ করা হবে, এই মর্মে সরকার ওয়াদাবদ্ধ থাকলেও যেকোন সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক বেতন ভোগী মনসবদার নিয়োগ করতে সক্ষম হতেন।[৪৯] এমনি পরিস্থিতিতে সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেত এবং মনসবদারীর আর্থিক অনিশ্চয়তা রাজকীয় সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা খর্ব করত।

মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত মনসব ব্যবস্থার বিকাশ সম্মন্ধে ইরফান হাবিব যর্থাথ স্পষ্ট হতে না পারলেও এন. এ. সিদ্দিকী তাঁর গবেষণায় এর একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে, এই প্রশ্নের উত্তর ইরান তুরান হতে আগত বহিরাগতদের অবিশ্রান্ত স্রোতে এবং মনসবদারী পদ্ধতির অর্ন্তনিহিত সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার ধ্যে নিহিত।[৫০] সাম্রাজ্যে বিস্তার ও প্রতিনিয়ত বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত সামরিক বাহিনীর পক্ষে মনসবদার ও অশ্বারোহীর সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব ছিলনা। অধিকন্ত মনসবদারী পদ্ধতির অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র মনসবদারের অনিয়ন্ত্রিত বিকাশের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। মনসবদারী ব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন মনসবদার নিয়োগ পদ্ধতিতে চূড়ান্তভাবে যোগ্যতা যাচাই, তাঁর প্রাপ্ত অধিকার ও কর্তব্য, যা সম্পূর্ণভাবেই বাদশাহী প্রশাসনের ইচ্ছাধীন ও নিয়ন্ত্রনে ছিল। বরাত ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রশ্নের অনুপস্থিতি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাত বাজেয়াপ্ত করার নিরংকুশ অধিকার, নিয়মিত জায়গীর স্থানান্তরের প্রতিষ্ঠিত নীতি ইত্যাদি থেকে এই সংস্থার আমলাতান্ত্রিক চরিত্র ফুটে উঠে। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই শ্রেণীর সাথে আধুনিক আমলাদের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এতে অনেকটা প্রতীয়মান হয় যে, মুঘল প্রশাসন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততান্ত্রিক চিরায়ত অভিজাততন্ত্রকে ভেঙ্গে দিয়ে বাদশাহী প্রশাসনকে গতিশীল যুগোপযুগী একটি আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে পরিণত করতে চেয়েছিল। তত্ত্বগতভাবে যা কিছু হউক না কেন, বাস্তবে মুঘল মনসব তথা জায়গিরদারী ব্যবস্থায় প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের দিকটির খুব একটা ইতরভেদ ঘটেনি। ইরফান হাবিব তাঁর আলোচনায় মুঘল অভিজাততন্ত্রের রূপান্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তেমন উন্মোচন করেননি। অথচ জায়গিরদারী সংকটকে বুঝার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ কার্যকর ছিল, যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

মুঘল সম্রাটগণ কখনো জাতি বা গোষ্ঠী স্বাতন্ত্রের প্রতি খুব বেশী পক্ষপাত দেখাননি একথা সত্য, তা সত্ত্বেও মুঘল সম্রাটগণের আভিজাত্যের নীতির উপর গভীর আস্থা ছিল।[৫১] অন্যান্য সামন্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় মুঘল শাসনেও অভিজাত শ্রেণী বহুলাংশে বংশ পরম্পরায় ক্ষমতা ও মর্যাদার উচ্চাআসনে সমাসীন ছিল। তাই বলে এটা চূড়ান্ত রুদ্ধদ্বার প্রতিষ্ঠান ছিল না।[৫২] কারণ, মুঘলরা বংশ মর্যাদাকে বিশেষ গুন মনে করলেও যোগ্যতা ও বিদ্যাবত্তাকে আরও উচ্চে স্থান দিতেন। ফলে অ-সম্ভান্ত সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক মুঘল অভিজাত শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত হতে পারত। এমন কি লেখক, পেশাদার শিল্পী এবং নিম্নতম প্রশাসনিক কর্মচারীদেরও কখনো কখনো 'মনসব' প্রদান করা হত। তা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আভিজাত্যের নীতির উপর আস্থাশীল মুঘলরা যখনই ইরান বা তুরানের অভিজাত বশংবদ কিংবা সন্নিহিত রাজ্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি মুঘল দরবারে সমাগত হলে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের ফলে বা ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় উৎপীড়ন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুঘলরা তাঁদের স্বাগত জানাতে উচ্চ পদে নিয়োগ করত।[৫৩] মুঘলরা ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের যর্থাথ কদর দিতে কার্পন্য করত না। ফলে ভারতীয় মুসলমান ও প্রাচীন মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের সদস্যদেরও 'মনসব' দিয়ে সম্মানিত করা হত। এই ব্যবস্থার সাথে ব্রিটিশ সামন্ত প্রথার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ লর্ড সভার সদস্যরা আভিজাত্যের তিলকেই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে মুঘল মনসব ব্যবস্থায় নিয়োগের প্রাথমিক পর্যায়ে আভিজ্যত্যের যোগ্যতা বিবেচনায় মূল্য পেলেও

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী পদোন্নতি বহুলাংশে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করত, যদিও ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যোগাযোগ প্রভৃতির অনিবার্য ভূমিকা ছিল।[৫৪]

সমকালীন লেখকরা ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক ভৌগোলিক এবং কিছুটা পরিমাণ সাংস্কৃতিক উপঞ্চলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। এ জন্য 'গুজরাট', 'কাশ্মীর', 'দক্ষিনী' এবং 'হিন্দু' প্রভৃতি নামে অভিজাত সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে বসবাসকারী সম্প্রদায় ও উপজাতি, যাদের স্পষ্টতই স্বতন্ত্র পরিচয় ও অস্তিত্ব বজায় ছিল। এ ক্ষেত্রে আকবর থেকে আওরঙ্গজের পর্যন্ত সকল মুঘল সম্রাটই এই বিভিন্ন জাতিস্বত্বা, জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে উৎসাহ দিতেন, যাতে করে এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য গোষ্ঠীর লোকদের কাজে লাগানো যায়। কারণ, আঞ্চলিক চেতনা তখনো সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্রবোধ অতিক্রম করার মত যথেষ্ট প্রসার লাভ করেনি। এ জন্য সমসাময়িক লেখকরা আভিজাতদের (মনসবদারদের) চিহ্নিত করতেন তাঁদের পূর্বাধ্যুষিত কিংবা বর্তমান অধ্যুষিত ভিত্তিতে।[৫৫] এই সকল আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা জাত অথবা উপজাতির মধ্য হতেই মুঘলরা তাঁদের মিত্রের সন্ধান করতেন। আকবর থেকে আওরঙ্গজেব মিত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং যখনি দেখতেন যে কতগুলো ঐতিহাসিক কারণে কোন গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষ ক্ষমতাশালী হচ্ছে তখনি তাঁদের 'মনসব' দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আনায় চেষ্টা করতেন।[৫৬] আকবরের 'রাজপুতনীতি' বা আরওঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে 'মারাঠা' মনসবদারের অত্যন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি এই নীতির উদাহারণ। মুঘল অনুসৃত এই নীতির পিছনেও কতগুলো কারণ কার্যকর ছিল। প্রথমতঃ বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার জন্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক শক্তির উপর মুঘলদের বহুলাংশে নির্ভর করতে হত। ফলে স্থানীয় শক্তিগুলোকে মুঘল প্রশাসনের অর্ন্তভুক্ত করার প্রচেষ্টা আকবরের আমল থেকে আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সকল স্থানীয় শক্তি বিশেষ কোন সম্প্রদায়, উপজাতি, গোষ্ঠী, এমনকি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। প্রাক-মুঘল শাসনামলের বহু ক্ষমতাশালী জমিদার ও স্বাধীন হিন্দু রাজা এভাবে মুঘল শাসকদের দলে ভিড়ে পড়েছিলেন।[৫৭] দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শক্তিমান পরিবার বা গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক আনুগত্য যাতে করে পাওয়া যায় এবং এর ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের প্রতি একটি আনুগত্যের ধারা সৃষ্টি করার লক্ষ্য সামনে রেখে মুঘলরা এই সকল ক্ষমতাশালীদের প্রশাসনের অন্তভুক্ত করে নেন। ইরফান হাবিব মনে করেন রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবার 'ওয়াতন' জায়গীরের মাধ্যমে মুঘল শাসকদের কাছে বাঁধা পড়ে ছিলেন, মনসবদারদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন 'খান জাদারা'। তাঁরা ছিলেন বংশানুক্রমিকভাবে 'মনসবদার' বা মনসবদারদের সঙ্গে রক্ত সম্পকিত। ১৬৫৮-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৪৮৬ জন এক হাজার বা তদুর্ধ্ব মনসবদারের মধ্যে ২১৩ জনকেই 'খানজাদা' বলে আভিহিত করা হয়েছিল।[৫৮] তবে গবেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে, আভিজাত্যের প্রভাব বলয়ে অনেক মনসব বিলি বন্টন হত সত্যি, তবে তাঁকে উচ্চ মনসব দেয়া হত না। কারণ, সেখানে যোগ্যতার প্রশ্ন জড়িত ছিল।[৫৯]

ইরফান হাবিব 'মনসবদার বা 'জায়গীরদার'দের অভ্যন্তরীন বিন্যাস ও শ্রেণী চরিত্র সর্ম্পকে যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা না দিলেও পরবর্তীকালের গবেষক গৌতম ভদ্র এই বিষয়ে অনেকটা পরিস্কার ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত গবেষক সতীশ চন্দ্র কিছুটা ভিন্ন মত পোষন করলেও মৌলিক ধারণায় তাঁদের দু জনের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। "মনসবদাররা" কতগুলো নিদির্ষ্ট জাতি ভিত্তিক গোষ্ঠী থেকেই নির্বাচিত হত। হিন্দুদের মধ্যে 'মারাঠা' ও 'রাজপুত' ব্যতীত অন্যদের উপস্থিতি প্রায় ছিল না, এবং মারাঠারাও আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বিপুল হারে মনসব লাভ করে। আবার এই সব মনসবদারদের নির্বাচনে ক্ষমতা ও উচ্চ বংশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলিম বা রাজপুত মনসবদারদের নির্বাচনে পরিবার বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক মনসব প্রদানের সময় প্রধানত বিবোচিত হত। নীল রক্তের ভূমিকা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং সেদিক থেকে মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

সামন্তশ্রেণীর সদস্য হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার, অন্যদিক থেকে যদি কোন বিশেষ গোষ্ঠী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন হত তবে সব সময় তাঁদের তোয়াজ করার চেষ্টা চলত। আভিজাত্য অথবা তরবারী এই দুই নীতির উপর ভর করেই মুঘল সামন্ত শ্রেণী সংগঠিত হত। অন্যদিকে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রত্যেক গোষ্ঠীই চাইত তার দলের লোকেরাই বেশী করে 'মনসব' এর অধিকারী হউক, অথবা যে প্রদেশে আপাতঃ শান্তি রয়েছে সেই প্রদেশে জায়গীর লাভ করুক। আপন স্বার্থ রক্ষার দরুন এই গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম প্রকাশ ঘটত সিংহাসন নিয়ে দাবীদারদের মধ্যে লড়াইয়ের সময়। সুদক্ষ যোগ্য সম্রাট সুকৌশলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিয়ন্ত্রন করতেন। নিয়ন্ত্রন করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থই ছিল শাসক শ্রেণীর মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির ফলজাত সম্পদ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বের সূচনা ও প্রসার। অবস্থান ও ঐতিহ্যগত কারণে এই সামন্তশ্রেণীর একটা উদ্দেশ্য ছিল প্রায়ই ভূমি কেন্দ্রীক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। রাজপুত ও মারাঠারা, যারা 'ওয়াতন', জায়গীরের অধিকারী ছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই চরিত্র খুবই স্পষ্ট। অন্যদিকে তথাকথিত বিদেশী[৬০] মুসলিম সামন্তরা, যাদের এদেশে ভূমিকেন্দ্রীক স্বার্থ ছিল না, তাঁরা ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে এদেশের শাসন ব্যবস্থায় একটা 'মৌরুসী' স্বত্বের বন্দোবস্তে সচেষ্ট ছিলেন। ইরানীরা আরও বেশী পরিবার কেন্দ্রিক ছিল এবং তাঁরা ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। তুরানীরা অনেক বেশী জাতিগত ভিত্তির উপর গুরুত্বারোপ করে এবং তাঁদের গোষ্ঠী মূলতঃ অনেক বেশী সংগবদ্ধ ছিল, অন্য জাতির লোকেরা তাতে স্থান পেত না।[৬১] বস্তুতঃ মুঘল অভিজাত শ্রেণী জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে দলীয় সংঘাত সৃষ্টির সুযোগ ছিল যথেষ্ট। শাসনকার্যের অতিরিক্ত কেন্দ্র প্রবনতা, মনসবদারী ব্যবস্থা, জায়গীর পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলো দলীয় মনোভাব দমন বা রোধ করার জন্যেই ব্যবহৃত হত।

সুতরাং, শাসন ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ও চেতনার উপর গুরুতারোপ করে এবং নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আয়ের জায়গীর বন্টন করে একটি বংশানুক্রমিক 'আমলা' শ্রেণী মুঘল সামন্ত শ্রেণীর অন্য একটি ভিত্তি ছিল। এরা স্থানীয়দের মত স্থায়ীভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল বা স্বতন্ত্র দেশীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলনা। অবশ্য পতনের যুগে এদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয়ভাবে স্থায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। যেমন, তুরানী দলের নেতা 'চিন কিলিচ খান' ওরফে প্রথম 'আসফ খাঁ' 'নিজাম-উল-মূলক' এর নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬২]

উপরের অংশে মনসবদারী বা জায়গিরদারী ব্যবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ এর সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করতে গিয়ে আধুনিক গবেষকদের গবেষণাকর্মের আলোকে মূলতঃ জায়গিরদারী ও মনসবদারী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীন বিন্যাস ও শ্রেণী চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। এখন জায়গিরদারী ব্যবস্থার সংকটের যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। অবশ্য জায়গিরদারী ব্যবস্থার বদলী জনিত সমস্যা ও অনিয়ন্ত্রিত মনসব প্রদানের ফলে মুঘল জায়গিরদারী সংস্থায় আরও একটি বিশেষ ব্যবস্থা জন্ম নিতে দেখা যায়, যা শুধুমাত্র জায়গিরদারী সংস্থার সংকটের সাথেই জড়িত ছিল না বরং পরবর্তীকালের মুঘল কৃষি সংকট ও মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক ভারসাম্য ধবংস করে সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বে আঘাত হানার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটি হল 'ইজারাদারী' ব্যবস্থা। ইরফান হাবিব জায়গীরদার কর্তৃক কখনো কখনো তাঁর প্রাপ্ত বরাদ্দের কোন কোন অংশ নিজেদের লোক অথবা অধিনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ার কথা বলেছেন। তিনি এর আইনগত দিকটির উপর প্রশ্ন তুলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি 'ইজারাদারী' প্রথার উদ্ভব, বিকাশ ও এর ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার উপর স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষন উপস্থিত করেননি। তিনি 'মুঘল সাম্রাজ্যের 'কৃষি সংকট" এই শিরোনামে আলোচিত অধ্যায়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সংকটের বিভিন্ন প্রসঙ্গে 'ইজারাদারী' ব্যবস্থার উপস্থিতি, কৃষক ও

সমাজবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর উপর এর প্রতিক্রিয়া এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ে এই ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু ইরফান হাবিব রাজস্ব প্রশাসন ও জায়গীর ব্যবস্থার অভ্যন্তরীন বিন্যাসে পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা হিসাবে ইজারাদারী ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন না করে কৃষক নিপীড়নে ইজারাদারদের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। অথচ জায়গিরদারী ব্যবস্থার অনিয়নন্ত্রিত বিকাশ ও সংকটের সঙ্গে 'ইজারাদারী' ব্যবস্থা গভীরভাবে জড়িত। ইরফান হাবিবের আলোচনার এই অসম্পূর্ণ দিকটির উপর এখন আলোচনা করা যেতে পারে, যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়।

ইতিমধ্যেই মুঘল জায়গীর ব্যবস্থায় বদলী জনিত বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে মুঘল প্রশাসনের অভিব্যক্তিও তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নিয়মিত জায়গীর হস্তান্তর স্বীকৃত হলেও তা জায়গীরদারের রাজস্ব সংগ্রহের সাথে সঙ্গতি না রেখেই বাদশাহী প্রশাসনের মর্জিমত যেকোন সময় স্থানান্তরিত হতে পারত। ফলে জায়গীরদাররা বরাত প্রাপ্ত 'মহালের' রাজস্ব যত দ্রুত এবং যত বেশী সম্ভব আদায়ে তৎপরতা চালাত। এ পর্যায়ে তাঁদেরকে প্রায়ই স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সহিত কোন একটি বন্দোবস্তে আসতে হত। এ ছাড়াও পরবর্তী মুঘল প্রশাসনে সরকারী কর্মচারীরা 'খালফ' ভূমি রাজস্ব আদায়েও ঝামেলা এড়াতে বাদশাহী প্রশাসনের শৈথিল্যের সুযোগে ইজারা প্রথাকে প্রাধান্য দিতে থাকে। মনসবদারী ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ ও সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে 'পায়-বাকীর স্বল্পতা, স্থানীয় জমিনদারদের রাজস্ব প্রদানে অনিহা, জায়গীরদার ও জমিনদারের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দিল্লীর সুলতানী প্রশাসন রাজস্ব ব্যবস্থায় ইজারা প্রথাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহন করেছিল। পরবর্তীকালে শেরশাহ্ ও আকবর এই ব্যবস্থার কুফল উপলব্ধি করেই এর স্থলে জায়গিরদারী ব্যবস্থার সুষ্ঠ বিকাশে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালেই 'ইজারা' প্রথা পুনরুজীবিত হয় এবং সপ্তদশ শতকে এর সুদূর বিস্তৃতি ঘটে।[৬৪] সাদিক খানের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, শাহ্জাহানের রাজত্বকালে ইজারা প্রথার বহুল প্রচলন হয়। এই সময় পর্তুগীজরা বাংলাদেশের কয়েকটি মহাল ইজারা প্রথায় অর্জন করে। বস্তুতঃ এর ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক অংশ ধবংসে পরিনত হয়।[৬৫] আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ও এই প্রথা অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে চলছিল। সমকালীন বহু নথিপত্রে এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রসিক দাস করোরীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ফরমানে দেখা যায় যে, একটি নির্দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর প্রতিটি গ্রামে কতজন 'ইজারাদার' ও কৃষিজীবি আছে তার হিসাব রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।[৬৬] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সাম্রাজ্যের প্রতিটি পরগনায় ইজারাদারের অস্তিত্ব ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইজারাদারী ব্যবস্থাটি কী? এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যই বা কি ছিল? ইজারা প্রথা বলত সরকার বা জায়গীরদারের তরফ হতে নির্ধারিত সময়ের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করে তা থেকে চুক্তির শর্তানুয়ায়ী নির্দিষ্ট অংকের পরিমাণ সরকারী কর্মচারী অথবা জায়গীরদারে হস্তে সমর্পন বুঝাত।[৬৭] বস্তুতঃ ইজারা হল এক ধরনের চুক্তি, যার দ্বারা এক বা একাধিক মহালের রাজস্ব বিলি বন্দোবস্ত বুঝাত। এই প্রথার কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিলঃ ইজারা প্রথা সরকারী কমচার্রী বা জায়গীরদারের সহিত ইজারাদারের পারস্পরিক দর কষাকষির ভিত্তিতে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হত। ফলে এর সাথে বাদশাহী প্রশাসনের অনুসৃত রাজস্ব ধার্য ও আদায় ব্যবস্থার প্রায়ই সামঞ্জস্য থাকত না। কখনো কখনো 'খালিসার' ইজারা রাজস্ব বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীরা গ্রহন করত। ইজারদার যে মহালের ইজারা গ্রহন করত, তাতে ঐ মহালের ভূমির উপর তাঁর কোন প্রকার স্বত্ব জন্মাত না, বরং সে শুধু রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমেই তাঁর অধিকার সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হত। সূতরাং, এ কথা বলা যায় যে, চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ইজারাদার প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন। এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষতি বৃদ্ধির সহিত উক্ত পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকত না। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে চুক্তিতে রাজস্ব প্রদানের যে অংশ স্বীকৃত হয়েছে, ইজারাদার তা নির্ধারিত কিস্তিতে পাঠাতেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং দেয় পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কোন আবেদন করার অধিকার তাঁর থাকত না।[৬৮] তবে চুক্তিতে অনুরূপ কোন শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকলে ইজারাদার প্রয়োজনে দেয় পরিমান হ্রাসের জন্য আবেদন করতে পারতেন। বস্তুতঃ ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইজারাদার একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে কার্যপালন করতেন। এ পর্যায়ে জমিনদার ও ইজারাদারদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, জমিনদার ছিলেন স্থানীয় স্বত্বাধিকারী, রাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়াও তিনি ভূমিতে এক প্রকার মালিকানা স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করতেন। রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে সে এক প্রকার আর্থিক সুবিধা বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত চুক্তিতে ভোগ করতেন। জমিনদারের কার্যাবলি কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হত। কিন্তু ইজারাদারের উল্লিখিত কোন প্রকার অধিকার ছিলনা। ইজারাদার ছিলেন জায়গীরদার বা সরকারী কর্মচারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ মধ্যস্বত্বভোগী, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তার কোন দায়িত্ব ছিল না। এখন প্রশ্ন হয়ে দাড়াচ্ছে যে, ইজারাদারের ভূমি-রাজস্বের প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ অথবা তা সংগ্রহ করতে তাঁকে যে সকল ক্ষায় দায়ীত্ব বহন করতে হত, অথবা অনেক সময় ক্ষতির স্বীকার হতে হত তাঁর বিনিময় বা প্রতিকার কিভাবে করা হত? সমকালীন প্রাপ্ত নথিপত্রে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও বিদ্যমান অবস্থা দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, প্রদত্ত ইজারা পরগনার নির্ধারিত 'জমা' অংকের চেয়ে কিঞ্চিৎ অল্পে ইজারাদারের সহিত বন্দোবস্ত করা হত। এতে করে ইজারাদারের আয়ের ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছিল। এ ছাড়াও ইজারাদার বিভিন্নভাবে তাঁর আয়ের উৎস খুজেঁ বের করতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। যেমন ইজারা রাজস্ব নির্ধারণকালে অধ্যুষিত অথাৎ মুল 'জমার' বহির্ভূত আবাদী জমি আবিস্কার এবং সেই শর্তানুযায়ী রাজস্ব পূনর্নিধারন করতে ইজারাদার সদাতৎপর থাকতেন। ব্যক্তিগত প্রয়াস ও সঠিক দৃষ্টির ফলে ইজারাদার নির্ধারিত 'জমা' হতে অধিক আদায় করতে পারতেন এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রথম পক্ষ ইজারাদরের কাছে বর্ধিত সংগ্রহের উপর কোনরূপ দাবী উপস্থিত করতে পারত না। পতিত জমি আবিস্কার করে তার উপর রাজস্ব ধার্য করা এবং 'বালাদস্তি' প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে কর সংগ্রহ ইজারা দারীর উপস্বত্বের মূল উৎস ছিল।[৬৯] এই সকল আয় বৃদ্ধির চেষ্টা সর্বদাই করত। এই পর্যায়ে পরিমাণের ভিত্তিতে আবাদী জমির উপর রাজস্ব ধার্য করে নতুন জমা তৈরীর ভিত্তিতে সে তাঁর আয় বাড়াত। কিন্তু এতে জমিনদার ও কৃষকের উপর অত্যাধিক আর্থিক চাপ পড়ত এবং কৃষিজীবি ও কৃষিকর্মের বিনাশ ঘটত। সুতরাং, ইজারা প্রথাকে কোনক্রমেই সুষ্ঠ রাজস্ব পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।[৭০] এই প্রথায় জমিনদার ও কৃষকের ক্ষতির উপর ভিত্তি করেই ইজারাদারের মুনাফা সৌধ গড়ে উঠত। এই ব্যবস্থায় ক্রমেই কৃষির অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে সাম্রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়।

ইজারা ব্যবস্থা রাজস্ব ব্যবস্থার স্বীকৃত কাঠামোয় না থাকলেও বিভিন্নভাবে সর্বদাই তা কম বেশী প্রচলিত ছিল। মুঘল প্রশাসন প্রায়ই এ বিষয়ে জেগে ঘুমাতো। তবে, ইজারা ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বাদশাহী প্রশাসন সচেতন ছিল। তাই বিভিন্ন সময় ইজারা প্রথার বিলোপ সাধন এবং এর প্রচলন এরূপভাবে হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল যাতে করে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এন. এ. সিদ্দিকী তাঁর গবেষণা কর্মে "মিরাত-ই- আহ্‌মদী" এ 'নিগার-নামা-ই-মুন্সী' গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন "হুকুম"'হাসবুল' ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে ইজারাদারী ব্যবস্থার আইনসঙ্গত দিকটি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে ইরফান হাবিব তাঁর কর্মে বেশীদূর অগ্রসর হননি বলে বিষয়টি ততটা স্পষ্ট হয়নি, যতটা স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল, পরবর্তীকালের জায়গিরদারী সংকটকে উপলব্ধি করার জন্য। আতহার আলী তাঁর গবেষনা কর্মে 'ইজারা ' প্রথার আইনসঙ্গত দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,"এটা মনে করা ভুল হবে যে, "ইজারা" ব্যবস্থা আইনত নিষিদ্ধ হয়েছিল; কারণ, তা না হলে এলাহাবাদে সংরক্ষিত ইজারা পত্রগুলো লিখিত হত না।"[৭১] পক্ষান্তরে ইরফান হাবিব মনে করেন যে, ইজারা রীতি দরবারে অনুমোদন পায়নি।[৭২] প্রমাণ হিসাবে তিনি আওরঙ্গজেবের আমলে কাশ্মীরের দিওয়ানকে দেয়া এক ফরমানের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ইজারা প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করার এবং রাজস্বের জন্য তার আমিলদের পাঠানোর ব্যাপারে চাপ দেয়ার কথা উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। অথচ একই তথ্যসূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আতহার আলী বলেছেন যে,"ইজারাদারী ব্যবস্থা দরবারে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। কাশ্মীরে রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই প্রথা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব সমগ্র জায়গীরকে খলিসাভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।"[৭৩] সুতরাং, ইরফান হাবিব ও আতহার আলীর উপস্থাপিত তথ্যসুত্রের ব্যাখ্যার আলোকে এ কথা বহুলাংশে প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত ইজারা প্রথাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা না হলেও বাদশাহী প্রশাসন এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তা হলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইজারাদারী ব্যবস্থা কিভাবে বহুল প্রচলিত হয়ে সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করল? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হলে আমদের দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে প্রথমতঃ জায়গীরদারের উপর বাদশাহী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন কতটুকু ছিল; দ্বিতীয়তঃ মুঘল সম্রাট ইচ্ছা করলে জায়গীরদারের নিয়ম বর্হিভূত কার্যকলাপ বন্ধ করতে সমর্থ ছিলেন কিনা। এ কথা নিৎসন্দেহে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অধিকাংশ সময়েই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন ছিল প্রকৃত, নামে নয়।[৭৪] তবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যসহ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। বিভিন্ন কারণেই ঐ সকল অঞ্চলে বাদশাহী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ সম্রাটের অর্থ, শক্তি ও মনোযোগের ক্ষতি সাধন করেছিল। ফলে জায়গীদারদের উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। এন.এ. সিদ্দিকী 'নিগার-নামা-ই-মুন্সী' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আওরঙ্গজেবের আমলে ইজারা প্রথার বাস্তব রূপায়নে বাদশাহী প্রশাসন কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল, তাঁর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দুই বা তিনটি গ্রামের ইজারা স্বত্ব প্রার্থনা করে একটি আবেদনের উপর জারি করা বাদশাহী হুকুম নামায় নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে সকল গ্রাম পরিত্যক্ত অথবা যে সকল গ্রামে কৃষিকার্য পরিত্যাগ করা হয়েছে, সে সকল গ্রামের সন্ধান করে নির্দিষ্ট জমার ভিত্তিতে যেন ইজারা দেয়া হয়।[৭৫] সুতরাং, আমরা উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আইনতঃ জটিলতা যাই থাকুক না কেন, মুঘল প্রশাসনে বিভিন্নভাবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তাই তো মহারাজা যশোবন্ত সিং এর বিধবা স্ত্রী রানী হাদী 'যোদপুর পরগনার' জায়গীর প্রার্থনা করে এই অনুরোধ জানান যে, কোন কারণে এই আবেদন না মঞ্জুর হলে উক্ত পরগনার ইজারা স্বত্ব যেন তাঁকে মঞ্জুর করা হয়।[৭৬]

ইজারা প্রথার প্রতিক্রিয়া মুঘল প্রশাসনে কৃষক, জমিনদার, জায়গীরদারসহ স্থানীয় কর্মচারী , সর্বোপরি ভবিষ্যত সাম্রাজ্যের উপর মারাত্বক হয়ে দেখা দিয়েছিল। উপরন্ত এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্বার্থ সামনে রেখে গড়ে ওঠা এক নতুন সামাজিক পরগাছা শ্রেণীর উত্থান সূচিত করে, যারা মুঘল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি ধরে না রেখে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন সামন্ত শ্রেণীর সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় । ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যমান সামাজিক শক্তিগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্যে আঘাত হানে, যা পরিণতিতে বাদশাহী প্রশাসন, জমিনদার ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যকার বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কে ফাঁটল ধরে। এই বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে জায়গীরদারী তথা মনসবদারী ব্যবস্থার সংকট সম্পর্কীত আলোচনায় ইজারাদারী প্রথার প্রভাব, এই প্রথার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভুত বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর একটি রূপরেখা অংকন করা যুক্তিযুক্ত হবে।

ইরফান হাবিব বলেন যে, "ইজারার রাজস্ব আদায়কারীরা (এর অধিকার পাওয়ার জন্য) দরবারে গিয়ে যথেষ্ট খরচপত্র করে 'মহাল' এ গমন করে এবং কর ও রাজস্ব প্রদায়ী চাষীদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু পরের বছর বা এমনকি চলতি বছরের পুরোটাই তাদের পদ বহাল থাকবে কিনা সেটুকু ভরসাও তাদের নেই, তারা তাই উৎপন্নের দুটি ভাগই (সরকারের সেই সঙ্গে চাষীদের ভাগ) দখল করে ও বিক্রি করে দেয়।এমনি পরিস্থিতিতে দেশের বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ মানুষ বুঝে নিয়েছেন, সুনিশ্চিত ও সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনা, কি কৃষক কুলের সুরক্ষার ব্যবস্থা, বা দেশের সমৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি-এসব কালের হাওয়ায় বিদায় নিয়েছে।"[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ ইজারা প্রথার অভূতপূর্ব ব্যাপক প্রচলনে পতনের যুগে মুঘল ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই শাসন ব্যবস্থার ভারসাম্য অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সরকারী কোষাগার ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতদিন যাবত মুঘল রাজস্ব প্রশাসনে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী, যারা রাজস্বের বিশদ নিরূপন ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল, এই ব্যবস্থার ফলে তাঁদের প্রয়োজন ফুরালো। সাথে সাথে এমন এক শ্রেণীর কর্মচারী শ্রেণী কর্মহীন হলো, যারা তাঁদের কর্মের দ্বারা বাদশাহী প্রশাসনের ভারসাম্যের নীতিতে নিয়োজিত থেকে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিল। সমৃদ্ধির যুগে বিভিন্ন মুঘল সম্রাটরা অক্লান্ত পরিশ্রমে পরগণা স্তরে যে প্রশাসন গড়ে তুলেছিল তা ভেঙ্গে পড়ল। সরকারী কোষাগারের আয় হ্রাস পেল। কৃষকদের উপর প্রচন্ড শোষনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা দেখা দিল, কৃষকের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটল এবং গ্রামগুলো পরিত্যক্ত হয়ে পড়ল।[৭৮] উৎপীড়িত কৃষক পার্শ্ববর্তী কোন 'তলবী' জমিনদারের এলাকায় পালিয়ে আশ্রয় খুজঁল। এই সকল জমিনদাররা রাষ্ট্রের ক্ষমতা হয় সরসরি অস্বীকার করত এবং শক্তি প্রয়োগ ব্যতিত রাজস্ব প্রদানে অবহেলা করত।

ইজারা প্রথা এক শ্রেণীর 'মহাজন' ও 'ফটকাবাজ' শ্রেণীর জন্ম দেয়। যারা ইজারা ব্যবস্থায় তাঁদের অর্থ লগ্নি করে বংশানুক্রমিক জমিনদার হতে স্বতন্ত্র সম্পুর্ন ভিন্ন এক মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত শহর থেকে আসত এবং বংশানুক্রমিক জমিনদার শ্রেণীর সাথে বিরামহীন সংঘাতে লিপ্ত হত। উপর হতে চালানকৃত এই নতুন ইজারাদার শ্রেণীর অভ্যুদয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, স্বাভাবিক 'জমা' হতে অধিক হারে রাজস্ব প্রদান করার প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে। সর্বাধিক উচ্চ হারে যিনি রাজস্ব প্রদান করতে সম্মত হতেন, রাজস্ব সংক্রান্ত চুক্তি তাঁরই সাথে করা হত। এর ফলে রাজস্ব বন্দোবস্তে 'জমা'র পরিমাণ বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, বংশানুক্রমিক জমিনদার এক বিরাট সমস্যার সন্মুখীন হয়। কারণ, এসকল বংশানুক্রমিক জমিনদারশ্রেণী বংশ পরম্পরায় গ্রামীন সমাজের উচ্চতর স্তরের প্রতিনিধি হিসাবে মুঘল প্রশাসনের পক্ষে দীর্ঘদিন যাবত রাজস্ব সংগ্রহ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা উভয় সংকটে পতিত হল, অধিকতর 'জমা'য় নিলামের প্রতিযোগিতায় ইজারাদারকে পরাজিত করে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করতে হয়, তা না হলে প্রতিযোগিতা থেকে সরে পড়ে তাঁদেরকে বংশানুক্রমিক অধিকার হারাতে হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের ধবংসের বিভীষিকা হতে মুক্তি লাভ অসম্ভব ছিল। অত্যধিক হারে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে রাজী হলে জমিনদারের হাতে উদ্বৃত্ত থাকার একবারেই সম্ভাবনা ছিলনা, সেক্ষেত্রে জমিনদার কৃষক শ্রেণীর উপর অধিক করের বোঝা চাপিয়ে দিত। এই পন্থা অবলম্বন করলে কৃষকের সর্বনাশ হত এবং গ্রামগুলো পরিত্যক্ত হত। আবার প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসলে জমিনদারের আশু জীবিকার অবসান ঘটত। সুতরাং, ইজারা প্রথার ব্যাপক প্রচলনে বহু সংখ্যক প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক জমিনদার ধবংস প্রাপ্ত হয়। এরূপ কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাচীন জমিনদার শ্রেণীর ধবংসের মধ্য দিয়ে এক নতুন জমিনদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।[৮০] ইজারাদাররা যে সকল জমিনদারের রাজস্ব স্বত্ব নিলামে রাজস্ব হারের বিনিময়ে ক্রয় করত, সেই সকল জমিনদারের অনেকে চরম আর্থিক সংকটে পড়ে তাঁদের জমিনদারী স্বত্ব যারা ক্রয় করতে উচ্ছুক, তাঁদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হল। স্বভাবতই, প্রতিবেশী বড় জমিনদার ও শহরবাসী মহাজন শ্রেণী এই সুযোগ গ্রহন করতে কার্পন্য করত না। এভাবে গৌরবের যুগে মুঘল প্রশাসনে যে ন্যায় পরায়নতা ও কৃষক প্রতিপালনের নীতি বিদ্যমান ছিল তা পতনের যুগে আন্তর্নিহিত হল এবং গ্রামীন সমাজের অভ্যন্তরে যে ভারসাম্যের নীতি গড়ে উঠেছিল (যা মুঘল গ্রামীন সমাজের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা) তা ভেঙ্গে পড়ল। পরিণতিতে মুঘল সম্রাটদের 'জাহানদারী' বা প্রজা প্রতিপালনের নীতির অবলুপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকদের উপর ইজারাদারী ব্যবস্থার পরিণতি সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল। ইজারাদারের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে শোভা সিং কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির যে চিত্র অংকন করেছেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সুতরাং, এ কথা বলা যায় যে, ধার্য ভূমি রাজস্বের পরিমাণ কৃষিজীবি শ্রেণীর চূড়ান্ত দুঃখ দারিদ্রের মূল কারণ নয়, বরং এর কারণ অনুসন্ধান করতে হয় ইজারাদারী প্রথার প্রচলনে।[৮১] কারণ, এই প্রথা ইজারাদার ও বংশানুক্রমিক জমিনদারের মধ্যে এক অবাস্তব প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত রাজস্ব প্রদায়ী কৃষকদের উপর ধার্য রাজস্বের হার এত উচ্চে বেঁধে দেয় যে, বাস্তব অবস্থানের প্রেক্ষিতে তা প্রদান করা কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে কৃষি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরিণতিতে পরবর্তিকালে প্রচন্ড রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়। এই সকল দিক বিবেচনা করে এন. এ. সিদ্দীকী মন্তব্য করেছেন যে, "ইজারা প্রথা সম্বন্ধে বড় জোর বলা যায় যে, এটা ছিল এক শ্রেণীর অন্যায় অধিকার ও লুন্ঠনের সহায় স্বরূপ। জমিতে কোনরূপ মমত্ববোধ অথবা দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার হিতার্থে এই শ্রেণীর কোন অবদান ছিল না।"[৮২] পরবর্তীকালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ভূমি বিষয়ক প্রশাসনিক অবস্থার সহিত জায়গীরদারী সংস্থা তাল বজায় রেখে চলতে অসর্মথ হয়ে পড়ে। ফলে বাদশাহী প্রশাসনের সুষ্ঠ পরিচালন ব্যাহত হতে থাকল এবং আর্থিক সংকটের চাপে জায়গীরদারদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। উপরন্ত নব নিযুক্ত মনসবদারদের জায়গীর বিলির ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক সংস্থানের পথ সংকোচিত হয়ে গেল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জায়গিরদারী ব্যবস্থা এরূপ কয়েকটি সমস্যার সন্মুখীন হয়, যা এই সংস্থার স্থায়ীত্বে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়। তবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে জায়গীরদারী ব্যবস্থার ধ্বংশের সকল লক্ষন স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যায় পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত জায়গীরদারদের জায়গীর লাভ, সেই সাথে জায়গীর হস্তান্তর ও জায়গীর বিলি ব্যবস্থায় দীর্ঘ সূত্রতা ও জটিলতা থেকে বিভিন্ন প্রকার আর্থিক ও প্রশাসনিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

অন্যদিকে 'পায়বাকী' ভূমির স্বল্পতা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান মনসবদারদের জন্য জায়গীর সংগ্রহের প্রচেষ্টা এই প্রথায় অধিকতর সংকট সৃষ্টি করেছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে এ অবস্থা এক ভিন্ন মাত্রা পরিগ্রহ করে, যা তাঁর মৃত্যুর পর ঘণীভূত হয়েছিল। আতৃহার আলী 'মামুরীর' উদ্ধৃতি দিয়ে এ সমস্যাকে 'বে জায়গীরি' নামে অভিহিত করেছেন, যা জায়গিরদারী সংস্থার মূল ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছিল।[৮৩] বিভিন্ন কারণে মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেখানে 'পায়বাকী' ভূমির সংখ্যা বাড়েনি, ফলে "বেতন প্রার্থীদের বেতন বইতে সম্রাট- প্রায়ই লিখতেন, একশত রোগীর জন্য মাত্র একটি 'দাড়িম্ব' রয়েছে।"[৮৪] মনে হয় আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অধিকাংশ সময় ক্রমবর্ধমান মনসবদারদের দাবী পূরণে "পায়বাকি" ভূমি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। "বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট পরগণার হিসাব তলব করতেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তির জায়গীর বাতিল করতেন, এটাও জনসাধারনের দুর্দশার কারণ হয়েছিল।"[৮৫] কিন্তু আতৃহার আলীর এই মন্তব্য নির্বিচার গ্রহন করার পূর্বে দুটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমতঃ এই সময় বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জায়গিরদারী ব্যবস্থা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রন বাদশাহী প্রশাসনের নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় কার্যকর করা সম্ভব ছিল কি না?

আতৃহার আলী মনে করেন,"আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অধিকাংশ সময়েই কেন্দ্রীয় নিয়ন্দ্রন ছিল প্রকৃত, নামে নয়।"[৮৬] যদিও তাঁর রাজত্বের শেষের কয়েক বছর দাক্ষিনাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ, বিশৃংখলা গোটা সাম্রাজ্যেকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। রাজধানী থেকে দীর্ঘ দুই দশক সম্রাটের অনুপস্থিতির ফলে দরবারে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যার স্বাভাবিক পরিণতি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই পর পর তিনটি উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক স্থবিরতা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকেই সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, আর্থিক ও প্রশাসনিক সংকট রূপে আর্বিভূত হয়-যার পরিণতিতে কৃষকদের দুরাবস্থা ও কৃষি কার্যের অবনতি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো নষ্ট করে এর ভিত্তিকে নাড়া দেয়। এর প্রমাণ পাওয়া য়ায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম ও এয়োদশ বর্ষে জরি করা দুটি ফরমানের মাধ্যমে। রসিক দাস করোরীকে লিখা প্রথম ফরমানে বক্তব্যে প্রতিয়মান হয় যে, সম্রাট রাজস্ব নির্ধারন (জমা) ও আদায়ের (হাসিল) পার্থক্য জনিত কারণে জায়গীরদার ও সরকারী কর্মচারীদের কৃষক নিপীড়ন রোধ করতে চেয়েছিলেন, এবং এই ফরমানের নিদের্শগুলো 'খালিসা' ও জায়গীর উভয় ভূমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। মুহাম্মদ হাসিমের প্রতি প্রদত্ত দ্বিতীয় ফরমানে কৃষকদের অধিকার বজায় রাখতে ও সাময়িকভাবে ভূমি ত্যাগ করলেও তাঁদের দখলী স্বত্ব স্বীকার করতে বলা হয়েছে।[৮৭] সুতরাং, বলা যায় যে, জায়গীরদারদের উপর বাদশাহী প্রশাসনের কর্তৃত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। এমতাবস্থায় আওরঙ্গজেব তাঁর কর্মচারীদের সংযত করার চেষ্টা ত্যাগ করে ছিলেন এবং গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে সম্রাট শুধুমাত্র সামান্য ভৎসনা করেই কর্তব্য শেষ করতেন। [৮৮] 'পায়বাকি' ভূমির স্বল্পতা হেতু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সমাধান কল্পে আওরঙ্গজেবের গৃহীত ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল এটাই চূড়ান্ত কথা, কারণ আওরঙ্গজেব প্রাথমিক ভাবে 'পায়বাকি' ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেন সত্যি, তবে এ থেকেও ভিন্ন রকমের সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এনায়েত জং এর সংগ্রহের উপর কাজ করে J.E. Richards যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, মনসবদার 'সওয়ার' অনুযায়ী অশ্বারোহী প্রতিপালন করতে ব্যর্থ বা অসর্মথ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে দাক্ষিনাত্যে বহু জায়গীর পুনর্গ্রহন করে 'পায়বাকি'র অন্তভুক্ত করা হয়, যা প্রায় দীর্ঘ দিন অবরাদ্দকৃত অবস্থায় পড়ে থাকত। ফলে এই অবস্থা সরকার ও জায়গীরদারসহ রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারীর বিশেষ করে মনসবদারদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করত। শুধু মাত্র এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া এখানেই থেমে থাকত না, এর ফলে দরবার ও রাজস্ব মন্ত্রক ব্যাপক দুর্নীতির পথ উম্মুক্ত করেছিল। [৮৯]

এ কথা বলা বোধ হয় খুব একটা বেশী অযৌক্তিক হবে না যে, 'বে-জায়গীরি' সমস্যা জায়গীরি সংস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট করে এর স্থায়ীত্বে বহুলাংশে আঘাত হেনেছিল। পরিণতিতে ক্রমবর্ধমান মনসবদারদের দাবী সীমিত 'পায়বাকির' ভিত্তিতে পূরণ করা সম্ভব ছিল না, এতে কাউকে না কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ হতেই হত। ফলে মনসবদারদের জায়গীর লাভের চেষ্টায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা এবং এতে ক্ষোভ ,দুর্নীতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ামক শক্তি হিসবে কাজ করতে থাকে। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে, একজন প্রভাবশালী দরবারী মন্তব্য করেছিলেন যে, "একজন নব নিযুক্ত বালক মনসববদার তাঁর জায়গীর প্রাপ্তির পূর্বে একজন বৃদ্ধে পরিণত হতে পারত।"[৯০] এমনকি জায়গীর প্রাপ্তির পরেও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে নতুন জায়গীর প্রদান না করে ঐ জায়গীর যে অপর ব্যক্তিকে দেয়া হবে না এরূপ নিশ্চয়তাও ছিল না। এরূপে বহু মনসবদার দীর্ঘদিন চাকুরীর পরেও জায়গীর বিহীন অবস্থায় থাকত।

কাজেই দরবারে জায়গীর প্রমাণের ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রভাব অপরিহার্যভাবেই কার্যকর হয়েছিল। কোন ব্যক্তিকে জায়গীর লাভ করতে হলে একজন পৃষ্টপোষক 'মুরব্বী' করিতকর্মা প্রতিনিধি (উকিল-ই দিলসোজ) ছিল অপরিহার্য।[৯১] ফলে জায়গীর লাভের জন্যই মুঘল সাম্রাজ্যের মনসবদারদের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। তবে উল্লেখ্য যে এই বিবাদ দরবারস্থ আমাত্যগনের মধ্যে উৎকোচ প্রদান, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেনি।[৯২] অনিয়ন্ত্রিত মনসব বিলিবন্টনের ফলে এক পর্যায়ে জায়গীর হিসাবে 'খলিসা' ভূমির বিলিবন্দোবস্ত সাম্রাজ্যের জন্য সবচেয়ে মারাত্বক হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে এটা একটা অসাধারণ পরিণতি, যার ফলে রাষ্ট্র তার স্বত্বধিকার প্রকৃতপক্ষে মনসবদারদের হাতে সমর্পন করল। এভাবে রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ও সেবক হিসাবে যে শ্রেণীর একদা সৃষ্টি হয়েছিল, কালক্রমে সেই শ্রেণী রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচন্ড ক্ষতিকর হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকার আত্মসাৎ করে নেয়।[৯৩] সপ্তদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে তদানীন্তন যুগের মনসব ও জায়গীর লাভের হীনবাসনা ও প্রতিযোগিতার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে আরও কতগুলো ঘটনা বেশ প্রভাবিত করেছিল। মারাঠা ও জাঠ শক্তির অভ্যুত্থান, বুন্দেলখন্ড ও রাজপুতনার অস্থিরতা ও নিয়মিত বিদ্রোহ এবং রাজদরবারের দলীয় চক্রান্ত আংশিকভাবে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রনোদিত হলেও মূল কারণ হিসাবে এর পিছনে কাজ করছিল ভূ-সম্পত্তি ও রাজ্য লাভের তীব্র কামনা, কারণ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ও স্থায়ীত্ব জমি বা জায়গীর ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে লাভ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই শাসক শ্রেণীর (মনসবদার, জায়গীরদার) দাবীর নিকট রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। এ সকল ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভাঙ্গন ও তারই ফলে অনুষঙ্গ হিসাবে জায়গীরদার শ্রেণীর সবর্নাশ হয়েছিল।[৯৪]

সুতরাং, 'পায়বাকি' ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপও জায়গীরদারী সংস্থায় সংকটের সৃষ্টি করেছিল। অধিকন্ত এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাভাবিক জায়গীর হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে তাঁর যুক্তির দ্বারা জায়গীর হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাঝেই এর সংকটের ও পতনের চূড়ান্ত কারণ আবিস্কার করেছেন। তাঁর প্রধান যুক্তি এই যে,"জায়গীর হস্তান্তর ব্যবস্থায়ই অত্যাচার ও দেশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল"[৯৫] ইতিমধ্যেই জায়গীর হস্তান্তর জনিত কারণে মনসবদারদের মানষিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আত্হার আলী মনে করেন যে, বার্নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাবে অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি জায়গীর হস্তান্তর ব্যবস্থাকে নিয়মের বিরুদ্ধাচারন বলে ধরে নিয়ে ছিলেন।[৯৬] তাই বার্নিয়ের বক্তব্য অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। তা সত্ত্বেও জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটে যে কৃষক উৎপীড়নের ঘটনা ঘটেছিল তাতে জায়গীর হস্তান্তরের অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিণতিকে অস্বীকার করা যায় না।

১৬৯১ খ্রীঃ পূর্বেই বিলিযোগ্য জায়গীরের স্বল্পতা সত্ত্বেও ক্রমবধর্মান মনসবদার শ্রেণীর জন্য জায়গীর সংগ্রহের প্রচেষ্টা এই প্রথায় যে সংকট সৃষ্টি করেছিল তা আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ কয়টি বছর এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যা তার মৃত্যুর পর আরও ঘনীভূত হয়ে পড়েছিল। ফলশ্রুতিতে দেখা গিয়েছে যে, সিংহাসন লাভের পর বাহাদুর শাহ্ বহু সংখ্যক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও আমীরকে জায়গীর প্রদান করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। রাজপুতগণ,খানে খানান এবং কিছু সংখ্যক আমীরকে জায়গীর দেয়া হয়েছিল সত্যি, তবে অধিকাংশ মনসবদারের ভাগ্যে কিছুই জুটেনি। এমনি পরিস্থিতিতে খান-ই-খানান রাজপুতদের 'ওয়াতন' জায়গীর সাম্রাজ্যের শাসনভুক্ত করে সেগুলো বিলি বন্টন করার যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন সম্রাট তা অনুমোদনও করেছিলেন এবং সেরূপ চেষ্টাও করা হয়েছিল। এর ফলে এবং আরও কতগুলো ঘটনার জন্য জায়গিরদারী প্রথার সংকট এমন অবস্থায় পৌছেছিল যে,সমগ্র মনসবদারী ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই রক্ষনশীলতা ও পুনরুজ্জীবন বাদ সঞ্চারিত হচ্ছিল। এর ফলে যৌথ শাসক শ্রেণী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাঁধার সন্মুখীন হয়েছিল এবং বিভেদ পন্থি শক্তিগুলো প্রবল হয়ে উঠেছিল।[৯৭]

আধুনিক গবেষক সতীশ চন্দ্র সম্প্রতি তাঁর এক গবেষনা কর্মে জায়গিরদারী ব্যবস্থার সংকটের এক ভিন্ন চিত্র আবিস্কার করেছেন।[৯৮] তিনি মনে করেন যে, জায়গিরদারী ব্যবস্থার সংকটে 'বে- জায়গীরির' সাথে তালগোল পাকানো ঠিক হবে না, কারণ 'বে-জায়গীর' প্রতিষ্ঠিত জায়গীরদারদের চেয়ে নতুন জায়গীরদারদের বেশী ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। এ কথা সত্য যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের কয়েক বৎসর প্রশাসনিক ভারসাম্য দাক্ষিণাত্যে বিপন্ন হলেও অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত তা সাম্রাজ্যের সাধারণ চিত্র ছিল না। সমকালীন প্রাপ্ত নথিপত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, জাহাঙ্গীরের শাসনামল থেকে শাহ্জাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামল পর্যন্ত খালিসা ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয়

সরকারের সামরিক শক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে সহজে নিয়ন্ত্রনযোগ্য ও উর্ব্বর ভূমিকেই সাধারণত বেছে নেয়া হত। এর ফলে অনেক মনসবদার বা জায়গীরদারের বরাত স্থানান্তর করা হত 'জোরতলব' ও অনুর্বর অঞ্চলে। এই ঘটনাটি পরবর্তীকালে জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৯৯] এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বড় বড় জমিনদারদের উত্থান, এমনকি 'ইজারাদারী' ব্যবস্থা ও মনসবদারী ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এ নীতির সুযোগেই মুর্শীদ কুলী খান সুবে-বাংলায় ব্যাপক অঞ্চলের জায়গীর উড়িষ্যার 'জোরতলব' অঞ্চলে স্থানান্তর করেন। আওরঙ্গজেবও বিজাপুর, গোলাকুন্ডা রাজ্যদ্বয় বিজয়ের পর অনুরূপ পলিসি গ্রহন করেছিলেন। [১০০] অনেক ক্ষেত্রে জায়গীরের অনুর্ব্বর পতিত ভূমির উপর 'হাসিল' করার জন্য রাজস্ব মন্ত্রকের চাপ জায়গীরদারের জন্য বাঁচা মরার প্রশ্ন হয়ে দাড়াঁয়।

সুতরাং, জায়গিরদারী সংকটের মূলে ছিল এই সংস্থার স্থবির, স্থানু অবস্থা। আইন-শৃংখলা রক্ষা ও বাদশাহী প্রশাসনের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহে এই সংস্থার ব্যর্থতা। জায়গিরদারী ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাজস্ব দাবী ক্রমশই উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌছে ছিল। অনিশ্চিত জায়গীর বদলী, কৃষির বিকাশে বাদশাহী প্রশাসনের অমনোযোগিতা পতনের যুগে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলে। যেন অনেকটা অবচেতনভাবেই রাজস্ব ক্ষেত্রে জায়গীরদারের স্বার্থ ও মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের স্বার্থকে অভিন্ন করে বিবেচনা করা হতে থাকে। অথচ সমৃদ্ধির যুগে এক ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল। কারণ, বাদশাহী প্রশাসন একজন জায়গিরদারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সবর্দাই সর্তক ছিল এবং যতদিন মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসন তার স্বাভাবিক নিয়মে কার্য সম্পাদনে সক্ষম ছিল ততদিন প্রশাসনিক ভারসাম্যের সাথে সাথে জায়গীরদারী ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় ছিল।

অবশ্য সংকটের সূচনা লগ্নেই বাদশাহী প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল তা সফলতা লাভ করেনি, বরং এতে মনসবদাররা দুর্বল হয়ে পড়ে; অন্যদিকে স্থানীয় জমিনদাররা শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেননা উদ্বৃত্ত সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করার যে প্রচেষ্ট চালানো হয়েছে তা কতটুকু সফল হয়েছিল তা বলা শক্ত। কারণ, সাম্রাজ্যের বিশাল অংশের উদ্বৃত্ত সম্পদের বহুলাংশই স্থানীয় বংশানুক্রমিক ভূমি স্বাত্বাধিকারীরা (জমিনদাররা) নিজেদের প্রাপ্য অংশ ছাড়াও কৃষির বিস্তার উন্নয়নে ব্যয় করতে পারত। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব দাবীর অভ্যন্তরে জায়গিরদারের বিশেষ স্বীকৃত অংশ ছিল না, যা জমিনদারের ছিল। কাজেই স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সংকট সরাসরি জায়গীরদারের পক্ষে সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। বরং, জমিনদার ও স্থানীয় বংশানুক্রমিক ভূম্যধিকারীদের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল। কাজেই যতদিন পর্যন্ত জমিনদাররা শক্তিশালী ছিল এবং তাঁদের উপর বাদশাহী নিয়ন্ত্রন বজায় ছিল ততদিন পর্যন্ত কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আলোচ্য সময়ে দাক্ষিণাত্যসহ কোন কোন অঞ্চলে জমিনদাররা এত বেশী শক্তিশালী হয়ে পড়েছিল যে, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য দাবীর বেশী আদায় করতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে মনসবদাররাও নিজেদের শক্তির প্রকাশ ঘটায়। তাঁরাও তাঁদের বরাদ্দের ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারীর অনুরূপ আচরণ করতে থাকে। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন কোন মনসবদার তাঁদের বরাদ্দ অঞ্চলের দখলী অধিকার দশ বছর পর্যন্ত ধরে রেখেছিল।[১০১]

মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজস্ব ব্যবস্থায় গড়ে উঠা ভূমি রাজস্ব (জমা) ও প্রকৃত আদায় (হাসিল) এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সাম্রাজ্যের বহুমুখি সংকটের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, শাহ্জাহানের সংস্কার মনসবদারদের সাময়িকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল। পরিণতিতে পরবর্তীকালে জায়গীরদারদের রাজস্ব আদায়ী শক্তির অবক্ষয় ঘটে। এভাবে যে 'আর্বত চক্র' সৃষ্টি হল পরবর্তীকালে তা ভাঙ্গা ছিল দুঃসাধ্য।[১০২] বস্তুতঃ জায়গীরদারী ব্যবস্থায় প্রথম সংকট আর্থিক ও প্রশাসনিক সংকটরূপে দেখা দিলেও মূল কারণ নিহিত ছিল প্রচলিত সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক, বিশেষ করে ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তনে মুঘল সম্রাটদের অনীহা ও অক্ষমতা। মুঘল গ্রামীন সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী উচ্চ বা মধ্যজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ভূম্যধিকারী "খুদ-কাস্তা'র কষর্নযোগ্য বিরান ভূমিতে কখনো নিম্ন জাতি- সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীদের দখলী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। স্থানীয় 'আমলা' (মুকাদ্দম, কুলকার্নি, প্যাটেল প্রমুখ) ও মধ্যবর্তী স্তরের জমিনদারদের অধিকা ংশই ছিল এই "খুদ -কাস্ত" বা ভূস্বামী-কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। ভূমির উৎপাদনশীলতা নির্ণয়, শস্যের শ্রেণী বিভাগ, ইত্যাদির ভিত্তিতে জমিনদারদের নিয়মিত খাজনার অতিরিক্ত প্রাপ্য নির্দিষ্ট করে তাঁদের ক্ষমতা সংকোচিত করার জন্য মুঘলরা এইসব ভূস্বামী কৃষকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি ও মর্যদা বৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রশাসনের সর্বস্তরে এমনকি সাধারণের মধ্যে ন্যায়পরায়নতার ধারণায় বাদশাহের চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে কৃষকরা যেমন তাদের নিরাপত্তার জন্য কিংবা জীবন ধারনের অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার আশায় বাদশাহী প্রশাসনের দ্বারস্থ হত, তেমনি শ্রেণীগত বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বেও দুর্বলপক্ষ ন্যায় বিচারের আশায় বাদশাহের দ্বারস্থ হত। কেন্দ্রীয় সরকার, জমিনদার ও কৃষকদের প্রভাবশালী অংশ "খুদকাস্তা' এই তিন শক্তি নিয়ে গঠিত ত্রিভুজ এক ধরনের ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিল। এটাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের কারণ। এই ত্রিভুজ সম্পর্ক ছিল মুঘল জায়গীর প্রথারও ভিত্তিস্বরূপ। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকেই মুঘল সাম্রাজ্যে বিদ্যমান এই ভারসাম্য ক্রিয়াশীল সামাজিক ও আর্থিক শক্তিগুলোর টানপোড়নে ভেঙ্গে যায়। ফলে জায়গীরদারী ব্যবস্থায় দেখা দেয় সংকট।

বস্তুতঃ জায়গীরদারী ব্যবস্থার অবনতির কারণ ঐ পদ্ধতির নিজস্ব দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত এবং এর সূচনাকাল থেকেই এই অবনতির লক্ষনগুলো অংকুরিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। মুঘল যুগে ভূমি ব্যবস্থায় 'জমা' ও 'হাল-ই-হাসিল' এর মধ্যকার ব্যবধান সর্বদাই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। সুতরাং, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ইরফান হাবিব, কৃষক শোষন ও শোষক শ্রেনীর চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে শোষনের ধরণ হিসাবে 'জমা' ও 'হাসিলের' মধ্যকার পার্থক্যের মাঝে যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন তা এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা সামাজিক শক্তিগুলোর মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাকে অস্থিতিশীল করে তুলতে থাকে। এমনি অবস্থায় জায়গীরদারী পদ্ধতিতেও বিদ্যমান ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে। সতীশ চন্দ্র একটু বিস্তৃতভাবে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেও মুল বক্তব্যে ইরফান হাবিবের চিন্তার ছোঁয়া পাওয়া যায় যে,"জায়গীরদারী প্রথার মূলে ছিল সামাজিক সমস্যা।" ব্যয় সংকোচ এবং কৃষি কার্যের সম্প্রসারনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে যা আবশ্যক ছিল তা হল শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার। আর তা সম্ভব হত নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার প্রবর্তন এবং শিল্প বাণিজ্য সম্প্রসারনের পথে সকল বাঁধা বিঘ্নের অপসারণ দ্বারা। এই সব বাঁধা বিঘ্নের মূল ছিল তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থা, যে সমাজ ব্যবস্থা শিল্প ও বাণিজ্যকে সংকীণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।

বস্তুতঃ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে জায়গীরদারী ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালের পতনের যুগে তা আপন বৈশিষ্ট্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ক্রমশঃ ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বোপরি কঠিন সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করে, যা দীর্ঘদিন ধরে বজায় থেকে মুঘল সামাজিক ও প্রশাসনিক ভারসাম্যের মূলে আঘাত হানে। প্রকৃত পক্ষে এই সংকটের মূল কারণ ছিল প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক, বিশেষ করে ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তনে মুঘল সম্রাটদের অনীহা ও অক্ষমতা।[১০৪] কারণ, কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য মুঘলরা প্রধানত জমিনদার ও প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী জাতি সম্প্রদায়ের উপরই জমিনদার ও অন্যান্য উৎপাদক শ্রেণী উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর, কিংবা কৃষি সম্পর্কে অন্তজ কোন শ্রেণীর বিকাশ হওয়ার ঘোর বিরোধী হওয়ায় কৃষি ব্যবস্থা ছিল স্থবির, স্থানু ও গতানুগতিক, আর এখানেই জায়গীরদরী সমস্যার মূল নিহিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব অনুদান ঃ

ইরফান হাবিব এই অংশে রাজস্ব অনুদানের প্রকৃতি ও স্বরূপ আবিস্কার করেছেন। তিনি মনে করেন; এক ধরনের অনুদানের মাধ্যমে রাজা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় জমি থেকে তাঁর ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর আদায়ের অধিকার হস্তান্তরিত করতেন। রাজস্ব বরাদ্দের সাথে রাজস্ব অনুদানের মৌলিক পার্থক্য তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ফরমানের ভিত্তিতে রাজস্ব অনুদান প্রাপ্তদের সব রকম আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং বাদশাহী দাবী ('হুকুক্-এ-দিওয়ানী' ও 'মুতালিবাৎ এ সুলতানী')থেকেই রেহাই দেয়া হত ।

সমকালীন নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি রাজস্ব অনুদানের চরিত্র উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেন যে, মুঘল আমলে এদের কখনো বলা হত 'মিল্ক' বা 'অমলাক', কখনো 'সুয়ূরগাল'। কিন্তু সরকারী নথিপত্রের সাধারণত 'মদদ-এ-মআশ' (আর্থিক অর্থে জীবন ধারনের জন্য) ব্যবহৃত হয়েছে।

মুঘল প্রশাসন তাঁর নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যেই স্বীকৃত অধিকার "মদদ-এ মআশ' প্রাপ্তদের প্রদান করত। ফলে অনুমোদিত ভূমি রাজস্বের চেয়ে বেশী সে দাবী করতে পারতো না। আবার চাষীদের দখলী স্বত্বের উপরও "মদদ-এ-মআশ' অনুদান কোনভাবে জমির উপর প্রতিষ্ঠিত জমিনদারী বা "মিলকিয়াৎ" স্বত্বে হাত দিতে পারত না।

রাজস্ব অনুদান হিসাবে 'মদদ-এ-মআশ' জমি কোথায় কিভাবে বরাদ্দ করা হত ইরফান হাবিব তা তুলে ধরেছেন। আকবর ১৫৭৮সালে স্থির করেন যে, বিদ্যমান সব অনুদান কয়েকটি গ্রামে কেন্দ্রীভুত হবে। পরবর্তি শতকে 'মদদ-এ-মআশ' অনুদানের জন্য কয়েকটি গ্রাম চিহ্নিত করে রাখাটা একটা প্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণত হয়েছিল, এমন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। তিনি এই বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন।

রাজস্ব অনুদান বা 'মদদ-এ-মআশ' এর স্বত্বাধিকার বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে তিনি কতিপয় বিষয় সামনে দিয়ে এসেছেন। যেমন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি ফরমানে একে ঋণ হিসাবে (আরিয়ৎ) অধিকৃত (জমি) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথ্যাৎ পুরো স্বত্বাধিকারের পরিবর্তে এর প্রাপককে বাদশাহের খুশি মত স্বত্বাধিকার প্রদান করা হত। অনেক সময়েই জায়গীরদাররা অনুদান ফিরিয়ে নিত, বা কোন না কোনভাবে রাজস্ব ধার্য করত। অনুদান প্রাপক কখনো 'মদদ-এ-মআশ' অধিকার বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারত না। কাজেই, এই ক্ষেত্রে প্রাপকের নিরংকুশ স্বত্বাধিকার অনুপস্থিত বলে ইরফান হাবিব মত প্রকাশ করেছেন।

আওরঙ্গজেবের পূর্ব পর্যন্ত 'মদদ-এ-মআশ' কোন মতই বংশানুক্রমিক ছিল না এবং এই অনুদান প্রদানে বহুলাংশে উদারতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁর শাসন আমলের ৩৪তম বছরে এক ফরমানের মাধ্যমে তিনি "মদদ-এ-মআশ'কে পুরোপুরি বংশগত করে দেন বলে ইরফান হাবিব মত প্রকাশ করেছেন।

ইরফান হাবিব রাজস্ব অনুদান বা 'মদদ-এ-মআশ' প্রাপ্তদের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' তে প্রদত্ত মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে,"চার শ্রেণীর লোকের জন্য এটি বরাদ্দ করা হত। তাঁরা হল; জ্ঞানী; ধার্মিক; জীবিকার উপায়হীন অসহায় লোক; এবং যে, অভিজাত বংশীয়রা 'অজ্ঞতার দরুন' কোন চাকুরী নেব না।"এই চারটি শ্রেণী ছাড়াও আরো কিছু প্রাপক ছিলেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে তিনি অনুমান করেছেন। তাঁরা হলো বার্ধক্য বা অন্য কোন কারণে অসমর্থ চাকুরীজীবি, কখনো কখনো অনুগ্রহের চিহ্ন বা কাজের পুরষ্কার স্বরূপ ছোট খাট কর্মচারীরাও অনুদান পেয়ে থাকতো।

Dhaka University Institutional Repository

ইরফান হাবিব মনে করেন যে, 'মদদ-এ-মআশ' অনুদানের বেশীর ভাগটা পেত, 'জ্ঞানী',ও 'ধার্মিক' রা আর, জ্ঞান ও ধর্মচর্চা ছিল তৎকালীন মুসলিমদের একটি মাত্র বিশেষ শ্রেণীর অধিকারে। তিনি মনে করেন ঐ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা যখন ভাবতেন যে, 'মদদ-এ-মআশ' অনুদান শুধু তাঁদের উপকারে লাগবে, তখন তা তৎকালীন পরিবেশে বাস্তব সম্মত ছিল। আবার পীর মুর্শিদ ও ফকিরের বংশধরকে এই অনুদান পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হত। কাজেই, লেখক মনে করেন যে, এদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক পরগাছা শ্রেণী। এরা ধর্ম, সর্বক্ষণ ধর্ম নিয়েও ব্যস্ত থাকার অবস্থায় ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই জমিকে এরা উচ্চাশার সেরা লক্ষ বলে ধরে নিয়েছিল।

ইরফান হাবিব মনে করেন এই শ্রেণীকে রক্ষা করায় রাষ্ট্রের নিজেরও স্বার্থ ছিল। জাহাঙ্গীর এদের প্রার্থনার শ্রেণী বা সেনাবাহিনী বলেছেন[১০৫] জাহাঙ্গীরের বক্তব্য ছিল এই বাহিনী সাম্রাজ্যের পক্ষে আসল বাহিনী মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ হিসাবে ইরফান হাবিব মনে করেন যে, প্রাপকরা ছিল সাম্রাজ্যেরই সৃষ্টি, তাই এরা ছিল সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক সমর্থক ও প্রচারকর্তা। পরক্ষণেই ইরফান হাবিব এই পর্যন্ত আলোচনায় কৃষি ভিত্তিক ভূমি রাজস্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এই শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্যটি করেছেন এভাবে যে,"এরাই ছিল রক্ষনশীলতার দূর্গ, কেননা, রাষ্ট্রের খয়রাতিতে তাঁদের পাওনার সমন্বয়ে গোড়ামি ছাড়া আর কিছুই তাঁদের (দাবীর) স্বপক্ষে ছিলনা।" ফলে সম্রাট আকবরের সংস্কার নীতি এদের প্রচন্ড বিরোধীতার মুখে পড়ল।

তবে কিছু কিছু 'মদদ-এ-মআশ' অনুদানের যৌক্তিকতা ইরফান হাবিব স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন, কাজির পদের বিপরীতে শর্ত সাপেক্ষ 'মদদ-এ-মআশ' মজুর করা হত, এবং চাকুরীর মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হয়ে যেত।এই ছাড়া 'আল- তমঘা' ইনাম,লাখেরাজ" অনুদান ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হত।

অতপর ইরফান হাবিব বাদশাহী প্রশাসনের অনুদানকৃত ভূমির পরিমাণ ও এবাবদ রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ সম্পর্কে একটি আনুমানিক নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করেছেন। শেষাংশে তিনি মুঘল প্রশাসনের প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, যেমন জায়গীরদার সামন্ত প্রধান প্রমুখরা কিরূপ ক্ষমতা ভোগ করতেন বা তাঁরা কিভাবে কতটুকু ক্ষমতা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন তা বলেই আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভূ-কেন্দ্রীক শক্তি কাঠামোয় অন্যতম ভিত্তি ছিল এই অনুদান প্রাপ্তরা। মুঘল প্রশাসনের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রই এই শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশে বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছে।

তবে 'মদদ-এ-মআশ' প্রদান ও নিয়ন্ত্রনে মুঘল প্রশাসনের অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক এন.এ. সিদ্দিকী বেশ স্পষ্ট হতে পেরেছেন। তিনি মনে করেন যে, "মুঘল সম্রাটগন এত বেশী বৈষয়িক ছিলেন যে, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সাধনে কিছুমাত্র সহায়ক নয় এরূপ একটি পরগাছা শ্রেণীর ভরণ-পোষণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় করার মত মনোভাব তাঁদের ছিলনা।"[১০৬] তিনি মনে করেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশাসন যন্ত্রকে সচল রাখার জন্য এবং বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে স্থানীয় জমিনদারদের নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য জ্ঞানী, যোগ্য ও দক্ষ,-বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন ছিল, যারা মুঘল প্রশাসনের অনুকূলে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় ঐতিহ্য ও চেতনার বাইরে মুঘল সম্রাট ও সরকারের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টিতে ও এই শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা, নৈতিকতার আর্দশ, বিশুদ্ধ জীবন যাপন- পদ্ধতি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ইত্যাদি বিষয়ে 'মদদ-এ-মআশ' প্রাপ্তদের কার্যকলাপ স্থানীয় হিন্দুদের মনে সাধারণ শ্রদ্ধা জাগাত, যা মুঘল প্রশাসনের প্রতিনিধির মাধ্যমে মুঘল সরকারের প্রাপ্য ছিল। এভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এই সকল 'মদদ-এ-মআশ' প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সহিষ্ণুতার যে বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন তা বরং মুঘল স্বৈরাচারকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।। এই বিষয়টি ইরফান হাবিবের আলোচনার ইঙ্গিত থাকলেও তিনি স্পষ্ট করেননি।

পরবর্তি অধ্যায়ে মুঘল জায়গীরদারী সংকট ও কৃষি সংকটের সঙ্গে সঙ্গে 'মদদ-এ-মআশ' এর বিবর্তন ও বাস্তবতা একাকার হয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ এই ক্ষেত্রে তিনি জায়গীরদারী সংকটকে কৃষি সংকটের মূল কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনা করে তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে উঠা কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষি সংকটকে বুঝার চেষ্টা করেছেন। ইরফান হাবিব চূড়ান্তভাবে মনে করেন যে, ক্রমবর্ধনমান রাজস্ব দাবী বর্ধিত রাজস্ব আদায়ে শক্তি প্রয়োগ, পরিণতিতে কৃষক-নিপীড়ন, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ। তিনি এই ছকেই গোটা সংকটের চিত্রটিকে পূর্বাপর সম্পর্ক সূত্রে বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও অন্যান্য অনেক কারণ তিনি প্রসঙ্গক্রমে টেনে এনেছেন। (কারণগুলো পরবর্তি পর্যায়ে তুলনামূলক আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষন করার সময় উল্লেখ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে) যা জায়গীরদারী সংকট তুলে ধরতে গিয়ে আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু মুঘল ভারতে কৃষি-সংকট বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধাপে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিস্ফোরিত হয়েছে। সুতরাং, গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই কৃষক বিদ্রোহের একটি বাস্তব পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করার লক্ষ্যে পরবর্তি অধ্যায়ে কৃষি-সংকট উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও কারণ বিশ্লেষণ করে কৃষক বিদ্রোহের সত্যিকার অবস্থানটি ইরফান হাবিবের মতামতের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক গবেষকদের চিন্তার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হল। আলোচনার শুরুতেই ইরফান হাবিবের মতামত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। তিনি বলেছেন "খাজনার বিকল্প হিসাবে ভূমি রাজস্ব, ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে (গড়ে উঠা) শাসকশ্রেণী, ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যবহারের শক্তিকে বলীয়ান পরগাছা শহরে অর্থ ব্যবস্থা, কৃষকদের অতিমাত্রায় শোষন, যা নিয়ে গেল কৃষি সংকটের দিকে। জমিদারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মিশে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহ, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"

লেখকের উল্লিখিত মতবাদের ভিত্তিতে কি মুঘল সমাজ বিবর্তণের মূল সুরটিকে আবিস্কার করা যায়? মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবহার মুঘল অর্থনীতির প্রকৃতি নির্ণয়ে পর্যাপ্ত ছিল? শুধু মাত্র কৃষক শোষণই কি মুঘল ভারতে কৃষি সংকটের কারণ? কৃষি সংকট ও জমিনদারের অভ্যুত্থানে মিশে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহ কি মুঘল সামাজ্যের পতনের জন্য দায়ী? ইত্যাদি বিষয়গুলো যর্থাথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে আলোচনার দাবী রাখে।

তথ্য নির্দেশ

১ ভূমিকায় বলা হয়েছে.

২ Irfan Habib, *The Agrarian system of Mughal India*, (1956-1707) Firsted Bombay, 1963, p.257.

৩ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Moreland.W.H. *The Agrarian system of Moslem India*, Delhi, 1968, pp. 122,191,279

Dhaka University Institutional Repository

৪ Moreland, W.H, *Ibid*, pp.641-65
৫ A. Aziz, *The Mansabdari system and the Mughal Army*, Lahore, 1926, p.13
৬ বিস্তারিত জনা দেখুন A Aziz, *Ibid*, pp.31-45
৭ *Ibid*, p. 31
৮ *Ibid*, pp.16.25
৯ M. Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, Firsted. Bombay, 1970,p.৭৫
১০ *Ibid*, p.৭৮
১১ Irfan Habib, *op.Cit.* p 257
১২ A. Aziz. *op. Cit.* pp. 16-25
১৩ Moreland - W.H, *The Rank (Mansab) in the Mughal state service*, J R AS, 1936, pp.641-65
১৪ M. Athar Ali, *op. Cit.*p.46
১৫ Bharani, M.A. Rasid ed.Vol. 1 p.48
১৬ W.H. Morela nd, *The Rank (Mabsab) in the Mughal srate service*, JRAS, 1936
১৭ Irfan Habib, *op. Cit.* p. 258
১৮ গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি -অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ*, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৪
১৯ A. Rezakhan, *Chieftaim in the Mughal Empire duing the Reign of Akbar*, PIHC, 1977.
২০ Athar Ali, *op, cit.*p. 109
২১ Irfan Habib, *op, cit.* p.260
২২ N.A. Siddiqi, *Land Revenue Administration Under the Mughals (1700-1750)*, Bombay, 1970, p.110
২৩ W.H. Moreland, *op.cit.* pp.91-92
২৪ Satish chendra, *Parties and politics at the Mughal court (1707-1740)*, Delhi, Introduction
২৫ *Selected Documenrs of shah jahans reign.* Yusuf Hussain khan, Hudrabad, 1950 pp.76-81
২৬ Irfan Habib, *op.cit.* p.261
২৭ *Ibid*, p. 269
২৮ Athar Ali, *op.cit*, 78
২৯ Irfan Habib, *op.cit*, p. 274
৩০ Athar Ali, *op.cit.* 78
৩১ Irfan Habib,*op.cit.*p.274
৩২ *Ibib*,p.264
৩৩ N.A.Siddiqi,*op.cit*, p.111
৩৪ N.A.siddiqi, *Ibid*, p.111 ,Athar Ali,*op.cit*, p.42
৩৫ M. Athar Ali,*op.cit*, p.42
৩৬ N.A.Siddiqi,*op.cit*, p.113

Dhaka University Institutional Repository

৩৭ Irfan Habib, *op.cit.*p.264
৩৮ M.Athar Ali, *op.cit* p.78, satish chanda, *Ibid,*introduction.
৩৯ Satish Chanda, *op.cit,*p.32
৪০ Irfan Habib, *op.cit.*p.264
৪১ *Ibid,* p.264
৪২ Irfan Habib, *op.cit.* p.264
৪৩ *Ibid,* p.XIV
৪৪ Satish Chanda, *op.cit.*p. 26
৪৫ *Ibid,* p.27
৪৬ N.A. Siddiqi, *op.cit* p.137
৪৭ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ ১৫
৪৮ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ ১৫
৪৯ N.A.Siddiqi, *op.cit* p.137
৫০ *Ibib,* p.138
৫১ *Ibid,* p.13
৫২ Satish Chandra, *op.cit.*p 11
৫৩ *Ibid,* p.13
৫৪ *Ibid,* p.13
৫৫ *Ibid,* p. 13
৫৬ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৬
৫৭ *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬
৫৮ *প্রাগুক্ত* পৃঃ ১৭
৫৯ *প্রাগুক্ত* পৃঃ ১৭
৬০ Satish choidra, *op.cit.* Introduction,p.xv
৬১ M.Athar Ali, *op.cit,* p. 53
৬২ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৭, ১৮
৬৩ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৮
৬৪ Irfan Hbib, *op.cit.* pp. 257-273
৬৫ N. A. Siddiqi, *Land Revenue Administration under the Mughals (1700-1750),* Bumbay, 1970, p. 93
৬৬ *Ibid,* p. 94
৬৭ *Ibid,* p. 128
৬৮ *Ibid,* p. 92
৬৯ *Ibid,* p. 93
৭০ *Ibid,* p p. 93,94
৭১ Athar Ali *op. cit.* p. 83
৭২ Irfan Habib, *op. cit.* p. 286
৭৩ M. Athar Ali, *op. cit.* p. 83
৭৪ *Ibid,* p. 83
৭৫ N. A. Siddiqi, *op. cit.* p. 91

Dhaka University Institutional Repository

৭৬ *Ibid*, p. 95
৭৭ Irfan Habib, *op. cit.* p. 325
৭৮ N. A. Siddiqi, *op.cit*, p. 99
৭৯ *Ibid*, p. 99
৮০ *Ibid*, p. 99
৮১ *Ibid*, p. 99
৮২ *Ibid*, p. 100
৮৩ M. Athar Ali, *op. cit.* p. 92
৮৪ *Ibid*, p. 92
৮৫ *Ibid*, p. 92
৮৬ কাফি খানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আতহার আলী *Ibid*, p. 92
৮৭ *Ibid*, p. 92
৮৮ J.N. Sarkar tr. JAB (N.S.) 1906, pp. 223-255
৮৯ M. Athar Ali, *op. cit.* p. 91
৯০ J.E. Rochad, *Golconda*, Bombay, 1966, pp. 158-159
৯১ M. Athar Ali, *op. cit.* p. 93
৯২ *Ibid*, p. 94
৯৩ N.A. Sddiqi, *op.cit.* p. 122
৯৪ *Ibid*, p. 139
৯৫ Bernier, *Early Travels*, London, 1921, p. 227
৯৬ M. Athar Ali, *op. cit.* p. 124
৯৭ Satish chandra, *op. cit.* p. 29
৯৮ বিস্তারিত দেখুন, Satish chandra, *Medieval India*, Bombay 1972,pp. 61-75
৯৯ *Ibid*, p. 65
১০০ *Ibid*, p. 70
১০১ *Ibid*, p. 71
১০২ Elliott.H.edi, *Histoy of India as told by its own Histarian*, London, 1867-77
১০৩ Satish chandra, *op. cit.* p. 70
১০৪ Satish chandra, *Parties and politics at Mughal court* (1707-1740), Bombay, 1972, p. 32
১০৫ *Ibid*, see In troduction.
১০৬ N.A. Siddiqui, *op. cit*, p. 131

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের কৃষি সংকট ও কৃষক বিদ্রোহ

ইরফান হাবিব তাঁর গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে "মুঘল সাম্রাজ্যের কৃষি সংকট" এই শিরোনামে যে, আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাতে প্রথমেই স্থান পেয়েছে জায়গীরদারী বা রাজস্ব বরাত ব্যবস্থাপনা। স্বাভাবিক কারণেই তিনি 'সামাজ্য ও বরাত ব্যবস্থা' এই উপ-শিরোনামে সামরিক শক্তিকেন্দ্রীক মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের বিষয়টি যে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ইরফান হাবিব রাজস্ব বরাত ও রাজস্ব অনুদান ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের গভীর সম্পর্কের দিকটি উন্মোচন করতে গিয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রথমতঃ মুঘল সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী যা 'মনসব' ব্যবস্থায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। তৃতীয়তঃ মনসবদারী ব্যবস্থা বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশক্রমে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছিল। চতুর্থতঃ সুষ্ঠু রাজস্ব-বরাত ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠা মনসবদারী বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রিত বিকাশের সাথে 'আধা- দৈব' রাজতান্ত্রিক ধারণার ব্যবহারিক রূপ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির নিকট বিচ্ছিন্নতাবাদ বিলীন হয়ে যায়। ইরফান হাবিব মনে করেন এই সকল কারণেই মুঘলদের উত্তরাধিকার লড়াইগুলো সাম্রাজ্যের সংহতির প্রশ্নে কোন বড় রকমের বিপর্যয় ডেকে আনেনি। উল্লিখিত আলোচনার আলোকে ইরফান হাবিব মুঘল সাম্রাজ্যের কৃষি- সংকটের সঙ্গে প্রশাসনিক সংকট ও সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রশ্নটি জুড়ে দিয়েছেন।

অতপর তিনি মুঘল ভারতের কৃষি- সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অন্বেষণ করেছেন। এ পর্যায়ে প্রথমেই নিয়ে এসেছেন কৃষক- পীড়নের বিষয়টি। "কৃষক- নিপীড়ন" এই শিরো নামে উপ-অধ্যায়ে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাতে পরবর্তী মুঘল শাসনামলে 'মনসব' ও জায়গীর ব্যবস্থার শৃংখলা ভেঙ্গে গিয়ে কিভাবে অনিয়ন্ত্রিত জায়গীর ব্যবস্থার সাথে কৃষি - সংকট ও কৃষক পীড়ন চলছিল তা তুলে ধরেছেন।

মনসব বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রিত বিকাশের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবী, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থানে কিভাবে কৃষক বিদ্রোহ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল তা তুলে ধরেছেন।

বস্তুতঃ ইরফান হাবিব প্রশাসনিক সংকটের প্রেক্ষিতে পরবর্তিকালের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবী এবং মনসব বা জায়গীরদার কর্তৃক সর্বোচ্চ হারে 'হাসিল' করার কারণেই কৃষি-সংকটের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করেন। আর নিপীড়িত কৃষকের আত্ম রক্ষার তাগিদ থেকেই কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ইরফান হাবিব অনিয়ন্ত্রিত জায়গীর হস্তান্তর ও বদলী ব্যবস্থাকে কৃষি- সংকটের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মনসব ও জায়গীর ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও জায়গীরদারের অভিন্ন স্বার্থ চিন্তার ভিত্তিতে জায়গীরদার কর্তৃক কৃষক শোষন কৃষি-সংকটের কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন।

বস্তুতঃ ইরফান হাবিবের মূল বক্তব্য হলঃ প্রথমতঃ বাদশাহী প্রশাসনের স্বার্থ ও জায়গীরদারের বিরোধের মূল ভিত্তি ছিল জায়গীর হস্তান্তর বা স্থানান্তর ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থার কারণেই জায়গীরদারের পক্ষে কৃষির উন্নয়নে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নীতি গ্রহন করা সম্ভব হতো না। ফলে তাৎক্ষণিক লাভের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ও কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

পীড়ন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ জায়গীরদার যখন কর্মচারীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় না করে জায়গীর ইজারা দিত তখন কৃষকের অবস্থা আরো মারাত্মক হত। চতুর্থতঃ এরূপ পরিস্থিতিতে চাষীদের উপর রাজস্ব চাপ এত গুরুভার হয়ে উঠত যে, তাদের কোন রকমে বেঁচে থাকায় উপায়টুকু থাকত না।

"মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলোর কৃষি -সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক" এই শিরোনামে উপ-অধ্যায়ে তিনি আলোচনার সূচনাতেই মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর আলোচনায় বা সমীক্ষায় সব কটি বিদ্রোহ উঠে আসেনি। এ পর্যায়ে কৃষি-সংকট ও কৃষক বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, ১৭ শতক ও ১৮ শতকের গোড়ার দিকের প্রামান্য লেখকেরা কৃষক অভ্যুত্থানের পিছনে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণগুলোর উপরেই অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মনে করেন ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বা জাতীয় সচেনতার ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। বস্তুতঃ কৃষি-সংকটের পিছণে কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। ইরফান হাবিব নিজেই সংকটের পিছনের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক দিকটির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে কৃষক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ধর্ম ও বর্ণের ভূমিকার দিকটি উন্মোচন করেছেন। তাসত্ত্বেও তিনি তাঁর আলোচনায় এ বিষয়ে যর্থাথ স্পষ্ট হতে পারেননি।

কিন্তু ইরফান হাবিবের এই আলোচনা অসম্পূর্ণ। জায়গীরদারী ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে মুঘল ভারতের কৃষি সংকটের বহু মাত্রিকতার কতিপয় দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইরফান হাবিবের আলোচনায় এ সমস্ত দিক যে উঠে আসেনি তা নয়, বরং তিনি কৃষিসংকট ও কৃষক বিদ্রোহের পশ্চাতে যে কারণটি আবিস্কার করেছেন তা হল ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবী, শোষণ, অত্যাচার ও কৃষক পীড়ন, আর অন্যান্য কারণগুলো উল্লিখিত প্রধান কার্য-কারণ ধারাকে অনুসরণ করেছে মাত্র। এই বিষয়ে জায়গীরদারী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর তাই সঙ্গত কারণেই ইরফান হাবিবের রচনায় দুটি পক্ষের উপস্থিতি চূড়ান্ত-এক, রাষ্ট্র বা বাদশাহী প্রশাসন, ও দুই, শোষিত শ্রেণী বা কৃষক। জায়গীরদার, জমিনদার, খুদ-কাস্তা, ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী 'সুবিধাভোগী' প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শক্তিগুলোর অবস্থা, অবস্থান ও পারস্পরিক সর্ম্পকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়নি। ইতিমধ্যেই 'জায়গীরদার' 'মনসবদার' এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক শক্তি যেমন জায়গীরদার, জমিনদার, ইজারাদার, সম্পন্ন কৃষকসমেত প্যাটেল, কুলকার্নি প্রভৃতি শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিরাজমান অর্ন্তদ্বন্দ্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে ইরফান হাবিবের প্রদত্ত মতামত থাকবে।

এ পর্যায়ে মুঘল কৃষি সংকটের পশ্চাতে বিদ্যমান আধিপত্য ও আনুগত্যের টানাপোড়নে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শগত দিক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। বস্তুতঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজনৈতিক সমস্যার সাথে সাথে জায়গীরদারী ব্যবস্থা এক গভীর সংকটে পড়েছিল। অপরদিকে রাজনৈতিক সংকটও এই সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল।[১] মুঘল প্রশাসনের প্রাণশক্তি ছিল 'মনসবদারী ব্যবস্থা', এই ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখার জন্য-মুঘলরা বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো সাময়িকভাবে সমস্যাকে প্রশমিত করলেও পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। যে পরিমাণ সামাজিক উদ্বৃত্ত পাওয়া যেত, তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রশাসনিক কলেবরের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে ব্যর্থ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে প্রশাসনিক ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল এবং একই সঙ্গে শাসক শ্রেণীর প্রত্যাশা ও জীবন যাত্রার ব্যয়ও বাড়তে শুরু করেছিল। পরিণতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় শাসকশ্রেণীর চাহিদা উর্ধ্বগামী হওয়ায় উৎপাদক শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অর্থনৈতিক চাপ বেড়ে গিয়েছিল।[২] উল্লেখ্য মুঘল সম্রাটরা কৃষির উন্নয়ন ও কৃষক প্রতিপালনে অত্যন্ত যত্নবান হলেও এই বিষয়টি ন্যস্ত ছিল জমিনদার ও স্থানীয় প্রশাসনের হাতে। কাজেই সংকটের যুগে জমিনদার, জায়গীরদার,'মনসবদার' ইত্যাদি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382732

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীগুলোর পারস্পরিক স্বার্থ দ্বন্দ্ব মুঘল ভারসাম্যের নীতিতে প্রচন্ড আঘাত হেনেছিল-যা কৃষি সংকটের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অর্থনৈতিক সংকট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জটিল করে তুলেছিল। রাজত্বের এয়োদশ বর্ষের শেষে আওরঙ্গজেব যখন রাজস্ব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে গেলেন তখনই আর্থিক ঘাটতি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যয় সংকোচন, অনাড়ম্বরতার উপর গুরুত্বারোপ, নতুন করের প্রর্বতন, এবং কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজাতদের উপর অবিরত নির্দেশ দান সত্ত্বেও সম্রাট অর্থ সংকটের সমাধান করতে পারলেন না।[৩] জায়গীর ও দরবারে নিয়োগ নিয়ে প্রতিযোগিতা সুপ্ত জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়িক মনোভাব পুণর্জাগ্রত করেছিল।[৪] এমনিভাবে জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের পিছনে বহুমাত্রিক কারণ সংযুক্ত হয়েছিল, যা ক্রমে কৃষি সংকটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সতীশ চন্দ্র এ প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় বলে ফেলেছেন যে, "এই ক্রমবর্ধমান সংকটের প্রথম লক্ষন কৃষক সম্প্রদায়ের পূবর্তন বাসভূমি হতে পলায়ন, পরে তা হিংসাত্মক কার্যাবলী ও বেপরোয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে।"[৫] জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত ইজারাদারী ব্যবস্থা, জমিনদার ও কৃষক উভয়ের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইজারাদারী ব্যবস্থার ফলে একশ্রেণীর 'মহাজন' ও 'ফটকাবাজ' ভূ-কেন্দ্রীক নতুন মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের জন্ম দিল, যারা পূবর্তন বংশানুক্রমিক বিভিন্ন স্তরের জমিনদারদের স্থান দখল করল। অধিকন্তু এই সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক বৃহৎ সংখ্যক প্রাচীন বংশানুক্রমিক জমিনদারদের উচ্ছেদ করে তাঁদের শূন্য স্থানে নতুন দুটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, পার্শ্ববতী শক্তিশালী জমিনদারগণ এবং শহরের ধনী মহাজনশ্রেণী যারা ভূ-সম্পত্তির প্রবাসী মালিক হিসাবে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকা মুঘল সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্যের অবসান ঘটে। এই নতুন ভূমিজ প্রবাসী অভিজাতদের সাথে কৃষকদের 'কওম' চেতনার সংঘাত, 'লোকাচার' ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও সুপ্ত 'কওম' চেতনা ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল বিদ্যমান অবস্থানচ্যুত "মালগুজারী" জমিনদারদের স্বার্থ চিন্তা। দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের ক্রমাগত সামরিক তৎপরতা, যা দাক্ষিণাত্যে চরম রাজনৈতিক সংকটের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে, যা প্রশাসনিক সংকট রূপে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। মারাঠাদের আওরঙ্গজের প্রশাসনের অর্ন্তভুক্ত করে ছিলেন সত্যি, কিন্তু তিনি তাঁদের আকাংখার তৃপ্তি ঘটিয়ে শান্ত করতে পারেননি। ফলে অভিজাত শ্রেণীর পারস্পারিক দ্বন্দ্ব সংঘাত যা দরবারে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পথ উমুক্ত করে। আর এরই সূত্র ধরে রাজস্ব প্রশাসনে যে বিশৃংখলার উদ্ভব হয়েছিল তা সাম্রাজ্যকে কৃষি সংকটের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু কৃষিজ সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজমান সুপ্ত অর্ন্তদ্বন্দ্ব যা কখনো কখনো বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে, তার স্বরূপও উন্মোচন করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে মুঘল যুগের কৃষি সংকটের ব্যাখ্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে।[৬] এই বিশ্লেষন মূলতঃ কৃষি-অর্থনীতিতে সামাজিক শ্রেণী সংঘাতের কাহিনী। আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র এই সংকটকে লেনিন-নিদির্ষ্ট লক্ষনগুলোর আলোকে বিচার করতে চেয়েছেন।[৭] লেনিন তাঁর মতামতে শোষক শ্রেণীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন, যাতে করে শোষক শ্রেণী পুরানো কায়দায় শোষণ প্রক্রিয়া চালাতে ব্যর্থ হবে। শোষিত শ্রেণী সচেতন হবে এবং এ পর্যায়ে একটি নেতৃত্ব শোষিত শ্রেণীর পুঞ্জিভূত ক্রোধকে বাস্তবায়িত করবে। মুঘল কৃষি সংকটে এই ছক হুব-হু- প্রয়োজ্য না হলেও একবারে অনুপস্থিত ছিলনা।

মুঘল ভারতের জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকট যা 'বে-জায়গীরী' নামে পরিচিত ছিল তা শোষক শ্রেণীর মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে। এই সংকট ক্রমশ ঘনিভূত হল মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে। কারণ শোষণের যাতাকলকে সচল রাখতে গিয়ে স্থানীয় বহু শক্তিকে শোষক শ্রেণীর মধ্যে আনতে হল। আর মুঘলদের এ পদ্ধতির নাম ছিল

Dhaka University Institutional Repository

'মনসবদারী ব্যবস্থা'। এভাবেই দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতি মনসব লাভ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছিল। শোষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। 'মনসবদার'গন জায়গীর লাভের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, পরিণতিতে আভিজাতদের মধ্যে যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল ইতিমধ্যেই তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মুঘল শোষণের মূল চালকাশক্তি ছিল তাঁদের ন্যায়পরায়তার নীতি এবং জনমনে এর প্রতিষ্ঠা। ফলে কৃষক জমিনদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরবারে নালিশ জানাচ্ছে, ছোট জমিনদার বড় জমিনদারের বিরুদ্ধে দরবারে নালিশ জানাচ্ছে, আবার কখনো কখনো জায়গীরদার, প্যাটেল, এমন কি ফৌজদারের অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে সম্রাটের আশ্রয় প্রার্থনা করছে। আর মুঘল সম্রাটগন অত্যন্ত সর্তকতার সাথে এই সকল অভিযোগের দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়েছেন। যেমন জনগনের অভিযোগের পেক্ষিতে থানেশ্বরের অত্যচারী ক্রোরীকে আকবর ফাঁসী দেন। উড়িষ্যার সুবেদার হাসম খানকে অত্যাচারের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়।[৮] গুজরাটের জায়গীরদারের বেশী হারে রাজস্ব ধার্যকে আওরঙ্গবের অত্যাচার বলে ঘোষনা করেন। কৃষক পালালেই সম্রাট 'কানুনগো' ও 'চৌধুরী'কে ডেকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে দিতেন। আওরঙ্গজেবের আমলে 'জয়পুর আখবারাতে' অজস্র দৃষ্টান্ত আছে যে, আমলা ও জমিনদারদের 'আবওয়াব গ্রহন ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজা সরাসরি অভিযোগ করছে, এবং সম্রাট-তৎক্ষনাৎ তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সুতরাং, আমরা লক্ষ্য করছি আওরঙ্গজেবের শাসনামল পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির উদ্দেশ্য।[৯] কিন্তু মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আর্থিক ও প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস সমাজ অভ্যন্তরে নানা অর্ন্তদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। ফলে এই ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট হয়েছিল এবং ক্রমশ: কৃষকের অবস্থা অসহণীয় হয়ে উঠেছিল।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে জারি করা এক ফরমানে কনৌজের দেওয়ানকে জমিনদার, আমিল, ক্রোরি, ফোতাদার প্রভৃতি কর্মচারীদের উপর ব্যাপক খবরদারী করার ক্ষমতা অপর্ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে এই সব কর্মচারীরা জোর জুলুম করে কৃষকদের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায্য রাজস্বের অতিরিক্ত আদায় না করে। আরেকটি দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, ফররুখশিয়ারের আমলে বিহারের সাসারাম এলাকার বংশানুক্রমিক কানুনগো শোভাচাঁদের সঙ্গে তাঁর 'রায়ত' তিন তাঁতী-মুসা, সেরো, ও জাহুরীর রাজস্ব নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। ফলে, এরা নিজেদের এলাকার অভিজাত বলে জাহির করে এবং প্রশাসনের সৈয়দদের সাথে যোগাযোগ করে শোভা চাঁদের বিরুদ্ধে দরবারে ধর্মীয় বিদ্বেষের অভিযোগ আনে। পরবর্তী সময়ে দরবারের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়। [১০] এই সকল ঘটনা মুঘল গ্রামীন সমাজের অভ্যন্তরের অর্ন্তদ্বন্দ্বের দুলর্ভ ছবি উপহার দেয়, যেখানে পুরানো কানুনগো ও অভিজাতের সঙ্গে গ্রামের তাঁতী ও বাইরের সৈয়দ ও কানুনগোর বিরোধের প্রমাণ সুস্পষ্ট।

আবার আঞ্চলিক রাজস্ব চাপের প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ফসল উৎপাদন করেছিল। রাজস্থানে ১৭৪০ সাল পযর্ন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও পরবর্তিকালে এর অবক্ষয় ঘটে। গ্রামীন শিল্পীরা যারা পূর্বে আবওয়াব থেকে মুক্ত ছিল পরবর্তী সময় প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় তাদের উপর শুল্ক চাপ দ্রুত বাড়তে থাকে, কারণ কৃষি সংকটে উৎপাদন হ্রাস পেলে রাজস্ব লোকসান পূরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ধার্য আদায়ে চাপ বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে বাংলাদেশে একই সময় যে সংকট দেখা দেয় তা ছিল প্রশাসনিক সংকট। কারণ বাংলায় লাঙ্গল পিছু মাপ পদ্ধতি বিদ্যমান রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা গ্রামীন সমাজের উপরিতলার রূপান্তরের ফলে পরিবর্তণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ 'গয়ের আসলি' বা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারী জমিনদারদের ধীরে ধীরে 'আসলি' জমিনদার বা মধ্যবর্তী জমিনদারে রূপান্তরিত করা হচ্ছিল। ফলে মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রভাবে উৎপন্ন শস্যের ভিত্তিতে মাপ-জোক ও

Dhaka University Institutional Repository

জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা এবং এ জন্য কর্মচারী নিয়োগ করার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল । এই রূপান্তরের ফলে ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে কৃষি সমাজে অসন্তোষ দেখা দেয়।[১১] সুতরাং, রাজস্থানের সংকট উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকলেও বাংলাদেশে হয়ত রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তন ও নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রন ঐ ধরনের চাপ বাড়িয়ে ছিল। যেমন মহারাষ্ট্রে বা রাজস্থানে বেগারের জন্য চাপ দিত রাষ্ট্র, সেখানে বাংলাতে জমিনদারের চাপই তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল। এই ক্রমবর্ধমান চাপের সৃষ্টি হওয়া এবং ভারসাম্য বজায় না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে, মুঘল কৃষি -অর্থনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেসব অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তা ক্রমশ বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বে রূপ নিল। এই সময়কে তাই বলা হয় মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট।

মুঘল কৃষি বিদ্রোহের ইতিহাস মুঘল প্রশাসনের মতই প্রাচীন। আকবরের শাসনামলে কৃষি বিদ্রোহের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আকবরের শাসনামলে ২৯ বার সামন্ত বিদ্রোহ হয়েছে। মধ্য বিজিত অঞ্চলে বিজিত বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের মোট সংখ্যা ৭৯টি।[১৩] আকবরের আমলেই নিরেট কৃষক বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ১৫৭৭ সালে আগ্রায় কৃষকরা বিদ্রোহী হয়। ১৫৬২ সালে আগ্রার নিকট 'সাফেৎ' নামক স্থানের ৮টি গ্রামের কৃষকরা বিদ্রোহী হয়। কারণ, একজন রাজকীয় অপরাধীকে রাজ সরকারের কাছে সমর্পনে অসম্মতির কারণে সৃষ্ট জটিলতা। আমরা সুলতানী আমলেই আলাউদ্দীন খলজী ও তুগলকের রাজত্বকালে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী ও দোয়াব অঞ্চলের কৃষি বিদ্রোহের প্রমাণ পাই। আবুল ফজল এই অঞ্চলের কৃষকদের টেটিয়া চোর, জুলুমকারী, নির্ভীক, চরমভাবাপন্ন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিদ্রোহী চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন।[১৪]

তিনি বলেন ভারতীয় কৃষদদের বিদ্রোহী চরিত্র কৃষি সংকট ও কৃষি বিদ্রোহের কারণ। তিনি মানুচ্চির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "রাজস্ব না দেয়া ভারতীয় কৃষকদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং রাজস্ব না দিয়ে অত্যাচার সহ্য করা তার কাছে অনেক কাম্য ছিল" তিনি লিখেছেন,"তাড়াতাড়ি রাজস্ব না দেয়ার অভ্যাস কৃষকদের বিশেষ প্রশংসিত হয়।যে সবচেয়ে বেশী মার খায় এবং সহ্য করে তাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান করা হয়। এধরনের অপমান সহ্য করা তাদের মধ্যে সম্মান বিশেষ ছিল। এত অপমান সত্ত্বেও বাংলার কৃষক অর্থ দিতে এতটা অনিচ্ছুক যে, সমাজের কিছু লোক মনে করে যতক্ষন পযর্ন্ত তারা তীব্রভাবে প্রহৃত না হচ্ছে ততক্ষন পযর্ন্ত রাজস্ব দেয়া একাটা মস্ত অপমান।"[১৫]

কিন্তু তা সত্ত্বেও গৌমত ভদ্র ইরফান হাবিবের সাথে একমত পোষন করেছেন যে, রাজস্বের হার এত উচুঁতে বাঁধা ছিল যে, কৃষকের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের প্রায় সবটাই নিয়ে নেয়া হত। ফলে কৃষকদের বিদ্রোহী হওয়ার একটি সাধারণ কারণ ঐতিহাসিক চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ কথা সত্য যে, কৃষক বিদ্রোহের পিছনে কৃষি সংকট প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। রাম প্রসাদের রচনায় কৃষি সমাজের সংকটের পাশাপাশি ধনিদের প্রতি বঞ্চিতদের চাপা ক্ষোভের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়াঁচ্ছে যে, কৃষকদের মনে শ্রেণী চেতনা কতটুকু কাজ করেছিল, না তা অচেতন ছিল? কেননা একই সময় মুকুন্দরামের কাব্যে ও গংগারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বলা হয়েছে, "সব কিছু প্রজাদের পাপের ফলে হয়।"[১৬] তবে রাম প্রসাদের রচনায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে উষ্মা প্রকাশ, বাংলাদেশে কৃষি সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে কিছুটা ইঙ্গিত বহন করছে। এছাড়া শোষনের প্রতিক্রিয়ার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কারণ বিদ্রোহ কেবল নিঃস্ব কৃষকরাই করেনা, বরং অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সম্পন্ন কৃষক ও গ্রামের উপর তলার ব্যক্তিরাও বিদ্রোহ করেছে। বস্তুতঃ সমাজের অভ্যন্তরীন শ্রেণী দ্বন্দ্ব এই সময় বেশ স্পষ্ট হতে থাকে। আবার এ প্রশ্ন ও উপস্থিত করা যায় যে, ক্ষেত্র বিশেষে দারিদ্র চরম হতাশা ও ভবিষ্যতের কাছে আত্ম সমর্পনেরই জন্ম দিয়ে থাকে।[১৭] কাজেই সংকটকে শুধুমাত্র ভূমির উর্ব্বরতা ও উৎপাদনের হ্রাস বা রাজস্ব দাবী তথা 'জমা' হাসিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যান্ত্রিক চিন্তামাত্র। আধিপত্য অনুগত্য ও

Dhaka University Institutional Repository

'জমা' হাসিলের বাইরে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের নানা স্তরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাঝে যেমন মুঘল ভারতের কৃষি-সংকটের বাস্তব চিত্র নিহিত, তেমনি ধর্মভাব, আর্দশ, শ্রেণী চেতনা ইত্যাদি বিশেষগুলোকেও অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের ভূমিকা নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিদ্যমান সামাজিক অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও আর্থিকস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় যেখানে কৃষি সংকটের পিছনে কার্যকর অন্যান্য দিকগুলো উন্মোচিত হবে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পূর্বাঞ্চলের দুটি বিদ্রোহের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে সেখানে এক ভিন্ন প্রেক্ষিত ও আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। মুঘল সম্প্রসারণবাদ পূবার্ঞ্চলের আসাম ও কুচ-বিহার রাজ্যে পৌছালে গোটা কুচ-বিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে অহরহ কৃষক বিদ্রোহ চলতে থাকে। [১৮] এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল "খুন্তঘাট" এবং বিদ্রোহ কামরূপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন পাইক সর্দার সনাতন। নব্য বিজিত এ অঞ্চলে 'ক্রোরি' মুস্তাজিরদের রাজস্ব দাবীতে প্রচন্ড অত্যাচার এমনকি 'ক্রোরি কর্তৃক কৃষকদের সুন্দরী স্ত্রীদের সম্ভ্রমহানী, ইত্যাদি ঘটনা কৃষকদের বিদ্রোহী হতে উত্তেজিত করে তুলে। পরবর্তী সময়ে সুবেদার মীর সফি ও শেখ ইব্রাহীমের অর্থ লোলুপতা পাইক ও রায়তদের মধ্যে সঞ্চিত ক্ষেভের বিস্ফোরণ ঘটায়। আর কুচ-বিহার রাজবংশের প্রতি মীর সফির দুর্বব্যহার আগুনে ঘৃতাহুতি দিল এবং খুন্ডাঘাটে বিদ্রোহ শুরু হল। দ্বিতীয় বিদ্রোহের ঘটনাটি ঘটে ১৬২১ সালে 'হাতিখেদা' অধিকার নিয়ে। বাকির খান নামক একজন মুঘল কর্মচারী কিছু হাতি 'খেদা' থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে কয়েকজন খেদা সর্দারকে মৃত্যুদন্ড দেন। এই ঘটনায় পাঠানরা গোটা অঞ্চলের লোকদের খেপিয়ে তুলে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয়। এই বিদ্রোহের সাথে রাজা পরিক্ষিতের ভাই ভাবাসিংহ এই বিদ্রোহে যুক্ত ছিলেন। আবার মীর্জা নাথনের হিন্দু অনুচর বলভদ্রের নিপীড়িত রায়তরাও এতে যোগ দিয়েছিল। মীর্জা নাথনের ভাষায় "এই বিদ্রোহ নিম্ন বর্ণের সাধারণ লোকদের দ্বারা হয়েছিল।"[১৯] এই বিদ্রোহ দুটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ বিদ্রোহের এলাকা এক হলেও বিদ্রোহের কারণ ছিল ভিন্ন। প্রথম বিদ্রোহের রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের সাথে রায়তদের স্ত্রী সম্ভ্রমের প্রশ্নটি জড়িত ছিল। আর দ্বিতীয় ঘটনায় 'পাইকান' বা 'চাকরান'দের শ্রেণী স্বার্থে আঘাতের সাথে সাথে পাইকানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল।[২০] আবার এই পাইকানরা ছিল 'রায়ত'। কাজেই বিদ্রোহে পাইকান ও 'রায়তী' উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলন ঘটেছিল। সুতরাং, এই দুটি বিদ্রোহ তিনটি ধারা মিলিত হয়েছিল। যথা (ক) সাধারণ রায়তদের বিক্ষোভ (খ) পাইকান বা এক বিশেষ শ্রেণীর রায়ত ও যোদ্ধাদের বিক্ষোভ ও (গ) কুচ সামন্তদের বিক্ষোভ।

মুঘল আমলে উপজাতি ও ধর্মীয় আন্দোলন মুলত কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিয়েই ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এ পর্যায়ে 'রোষনিয়া" আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই আন্দোলনের প্রভাববলয়, সোয়াৎ ও বাজৌর ভৌগোলিক এলাকায় বিস্তৃত হয়। এই আন্দোলনের উৎস মূল ছিল ঔরমার উপজাতিরা। এরা ছিল সামাজিক মর্যাদায় খুব নীচু ও কারিগর শ্রেণীর লোক। এই আন্দোলন পরে আফ্রিদি উপজাতি ও প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতির লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হয়। আন্দোলনের শক্তিমান নেতৃত্বে ছিলেন বায়াজিদ আনসারী। ইউসুফজাই উপজাতির হাতে এই বিদ্রোহ প্রচন্ড আকার ধারণ করেছিল। [২১] এই আন্দোলন বা বিদ্রোহের চরিত্র অনুসন্ধান করলে কয়েকটি- দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ বায়জিদের রোশনিয়া ধর্মমত এমন সব উপজতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল যারা সমাজ বিকাশের স্তরে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী; যারা একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরে উত্তরণের পর্যায়ে ছিল। কাজেই সেই সব উপজাতি তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাদের সামাজিক অবস্থান, নৈতিক ও মতাদর্শগত

রূপটি ধরা পরে রোশনিয়া আন্দোলনে। দ্বিতীয়তঃ মুঘল শাসন তথা রাজস্ব ব্যবস্থার সাথে এদের উপজাতিগত সমাজ ও অর্থনৈতিক সংঘাত অনির্বায হয়ে দেখা দেয়; এবং মুঘল শাসনের বিরূদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তৃতীয়তঃ এই বিদ্রোহের পিছনে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার বিরূদ্ধে একটা সাধারণ বিক্ষোভও কাজ করেছিল। এ পর্যায়ে মুঘল ভারতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ন কৃষক বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতার নিরিখে পর্যবেক্ষন করা যেতে পারে।

(ক) গুজরাটের মাতিয়া আন্দোলনঃ

মাতিয়ারা ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এদের এক অংশ ছিল কৃষক, অন্যরা কৃষি ভিত্তিক ব্যবসা ও কারিগরের উপজীবিকাও গ্রহন করেছিল। এ বিদ্রোহের আপাতঃ কারণ হল আওরঙ্গজেব তাদের নেতাকে ডেকে পাঠান এবং দরবারে গমনকালে তার মৃত্যুর ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ বিদ্রোহের মুলে ছিল অর্থনৈতিক কারণ, যদিও এতে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব কাজ করেছিল। এ বিদ্রোহে কারিগর, ছোট বণিক ও কৃষকদের একটি সমন্নয় ঘটেছে বলে আমরা মনে করতে পারি।[২২] স্থানীয় শাসনকর্তাদের অত্যাচার তাদেরকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিলেও বর্ণ বিন্যাস এদের সংগ্রামী স্পৃহাকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে সংহতি এনে দিয়েছিল।[২৩] ১৬৮১ সাল থেকে ১৬৮৬ সাল পযর্ন্ত গুজরাটে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল, ফলে সুরাটের শাসন কর্তা সালামত খানের অন্যায় রাজস্ব দাবী যা বণিকদের উপর বতির্য়ে ছিল। একারণে স্থানীয় বিদ্রোহে আগুন জ্বলে উঠে; কারণ, স্পষ্ট ভবিষ্যতের ধারণা এদের মধ্যে না থাকলেও এরা একজন সৎ শাসকের প্রত্যাশী ছিল। সুতরাং, গোটা মুঘল প্রশাসনের বিরুদ্ধে এদের বিদ্রোহ ছিলনা।[২৪]

(খ) কোলি- কৃষক সম্প্রদায়ে বিদ্রোহঃ

'কোলিরা' গুজরাটের জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। কোলিরা পূর্বে আদিবাসী থাকলেও পঞ্চদশ শতক থেকে এরা বর্ণ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে জাতে উঠার চেষ্টা করছিল।[২৫] গুজরাটের অন্য কৃষক সম্প্রদায় কুনবিদের মত এরা বাণিজ্যিক উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল না। উক্ত অঞ্চলের আদি বাসিন্দা বলে ভূমিতে কোলি সর্দারদের বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠিত বিশেষ স্বত্বাধিকার ছিল । মুঘল শাসনে সে অধিকার তারা হারিয়ে ফেলে। তা সত্ত্বেও তারা তাদের পুরানো অধিকারের কথা ভুলতে পারেনি। তাই নানাভাবে ভূমির উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর তাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। 'মিরাত-ই-আহ্‌মদী" গ্রন্থে উল্লেখিত বিবরণ থেকে জানা যায় এরা তাদের 'পাহারাদারী' অধিকারের স্বত্বকে (বন্থ) প্রসারিত করে রাজস্ব আদায়ের স্বত্বে (তলপদ) রূপান্তরিত করা এবং রাজস্বকে অন্যান্য ধার্যের মধ্যে আত্মসাৎ করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। ফলে সংঘাত ছিল অনিবার্য । কৃষকরা আমলা ও স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রাহকদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল এবং এর সথে যুক্ত হয়েছিল সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণ ব্যবস্থায় সম্মানজনক স্থান পাওয়ার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টা কোলিদের মধ্যে একটা সংহতি ও মারমুখী ভাব এনে দিয়েছিল। কারণ সামজিক প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা বহু সময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে চরিতার্থ হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল।[২৬] তবে এই সংহতি খুব একটা দানা বেঁধে উঠেনি।

(গ) কুর্মি কৃষক বিদ্রোহ (১৬৭০-৮০ খ্রীঃ)

এই বিদ্রোহী মুলতঃ বর্তমান 'আমেথি' অঞ্চলে 'জগদীশপুরের' 'বায়েশ' রাজপুত জমিনদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'কুর্মিরা' তাদের নেতা 'দাসীরামের নেতৃত্বে ৪২টি গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে।

Dhaka University Institutional Repository

'দাসীরাম' নিজেকে 'পীর' বলে প্রকাশ করে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়েছিল। সুতরাং, এ বিদ্রোহে ধর্মের বিরাট ভূমিকা ছিল।

(ঘ) সৎনামী কৃষক বিদ্রোহঃ

'সৎনামীরা' একটি প্রতিবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তবে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তাদের সংঘাতে কোন রূপ ধর্মীয় বিদ্বেষের উপাদান ছিল না। সংঘাতের কারণটি ছিল সম্পূর্ন পার্থিব।[২৭] কাফিখানের ভাষ্য অনুসারে 'নারনুলের' নিকটে একজন সৎনামী চাষীর ক্ষেত রক্ষনাবেক্ষনকারী এক পেয়াদার বিরোধের প্রেক্ষিতে ক্রমে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ বেঁধে উঠে। তবে সৎনামীদের সাংগঠনিক ভীত ছিল ধমীর্য়, কারণ 'বীরভান' নামক একজন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক সৎনামী ধমীর্য় আদর্শের প্রচারক ছিলেন। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন 'গরীবদাস' হাদা। এদের সম্পর্কে কানুনগো মন্তব্য করেছেন এভাবে যে, "'মেওয়াট'-পরগনার একদল গোলামাল পাকানো লোক হঠাৎ পাখাওয়ালা পিপঁড়ার মত মাটি ফুড়ে বেরলো এবং পঙ্গপালের মত আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ল। এরা বিশ্বাস করত, যদি একজন মারা যায় তবে তার জায়গায় অন্য একজন উঠবে।"[২৮] অল্প পুজিসম্বল ব্যবসায়ী ও গ্রামীন কারিগরদের বিশুদ্ধরূপ সৎনামী আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে। মুঘল অর্থনীতির সংকটে কৃষকদের সঙ্গে শিকদারের পেয়াদার সংঘর্ষই এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। এখানেও একটি ধর্মীয় সম্প্রদয়ের সংহতি ও চেতনা কৃষকদের মধ্যে এক লড়াকু মনোভাব এনে দিয়েছিল।[২৯]

(ঙ) জাঠ বিদ্রোহঃ

'জাঠ' বিদ্রোহ ছিল জমিনদার ও কৃষকদের সম্মিলিত বিদ্রোহের ভালো দৃষ্টান্ত। 'দিল্লী'ও'মথুরী' অঞ্চলের এই কৃষকরা ছিল চির-বিদ্রাহী। 'মাসির-উল উমরা'র বিবরণ অনুযায়ী এই অঞ্চলের লোকেরা সমৃদ্ধ কৃষক, গ্রামগুলোতে দুর্গ ছিল এবং আগ্রা ও দিল্লীর সীমান্ত অঞ্চলে এদের নায়করা আঞ্চলিক জমিনদার ছিল। 'তিলপথের' জমিনদার 'লোকরা জাঠ-গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের জমায়েৎ করে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল-মথুরার ফৌজদার আবদুল নবীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। 'চুড়ামন' দাসের নেতৃত্ব জাঠ বিদ্রোহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। চুামন এতটা শক্তি অর্জন করেছিল যে, ফররুখশিয়ারের আমলে চুড়ামনকেই ঐ অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পন করা হয় এবং এভাবে জাঠ শক্তিকে ধীরে ধীরে মুঘল রাষ্ট্র-ক্ষমতা স্বীকার করে নিল। জাঠ সংগঠনের ভিত্তি ছিল 'স্থানিক কৌম চেতনা'। লুঠতরাজের মধ্যে দিয়ে জাঠ বিদ্রোহের বহিঃ প্রকাশ হলেও রাজস্ব প্রদানে গ্রামবাসীদের অনিচ্ছাই এই বিদ্রোহের তীব্রতার পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করেছে। বস্তুতঃ জাঠ বিদ্রোহে আমরা পতণের যুগে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষিজ-সমাজ থেকে আঞ্চলিক ক্ষমতার উদ্ভবের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। মুঘল শোষনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে কৃষিজ-সমাজ থেকে জাঠরা লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। অতপর ব্যর্থ হয়ে তাদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে ও মুঘল রাষ্ট্রকাঠামো জাঠদের স্থান করে দেয়। আঞ্চলিক ক্ষমতার সাথে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার টানাপোড়ন এদিক থেকে উল্লেখ্যযোগ্য।[৩০]

(চ) আফনান উপজাতি আন্দোলন

আওরঙ্গজেবের আমলের প্রধান উপজাতি আন্দোলন হচ্ছে, 'খটক' উপজাতি বিদ্রোহ (১৬৭০-৮০ খ্রীঃ)। আকবরের সময় থেকে এরা মুঘলদের মিত্র থাকলেও আওারঙ্গজেবের রাজত্বকালে এদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী আর্থিক স্বার্থে আঘাত

আসলে এরা রাজ-রকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে 'রোশনিয়া' বিদ্রোহের পেক্ষিতে এই 'খটক'রা সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকে বিভিন্ন রকম আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল। এমনকি অন্যান্য উপজাতিদের শায়েস্তা করা এবং বাণিজ্য পথ রক্ষা করার দায়িত্বও বাদশাহী প্রশাসন এদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে এই নিয়ে উত্তর পশ্চিমে সীমান্ত অঞ্চলে অন্তঃ উপজাতি বিরোধের পটভূমি রচিত হয়েছিল। আর অনুর্বর অঞ্চলে শুল্ক আদায় উপজাতিদের জীবিকার পক্ষে বড় সহায় ছিল। [৩১] কিন্তু আওরঙ্গজে উপজাতীয় অর্ন্তদ্বন্দ্বের সৎ ব্যবহার করে 'ইউসুফজাই'দের সম্পর্কের উন্নতি করেন এবং 'খটক'দের এই জাতীয় কর সংগ্রহের অধিকার ও সুয়োগ বাতিল করে দেন। ফলশ্রুতিতে 'খঠকরা' 'আফ্রিদি'দের সহায়তায় 'লান্তিকোটাল', 'খাপাক', 'খাইবার' ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়। মুঘলরা কূটনীতির মাধ্যমে 'খটকদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায় এবং ইউসুফজাইদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়।

(ছ) মারাঠা আন্দোলনঃ

আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র মারাঠা আন্দোলনে দুটি স্তর লক্ষ্য করেছেন। একটা হচ্ছে জমিনদারী নেতৃত্ব, আর একটা হচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ।[৩২] কারণ শিবাজীর অভ্যুত্থান স্থানীয় শক্তিশালী জমিনদারদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে এবং তিনি তাঁদের এলাকার বিনিময়ে নিজের ক্ষমতার এলাকা বাড়িয়েছেন। আগ্রা থেকে পলায়নের পর শিবাজী তাঁর জাতির কাছ থেকে পৈতৃক জমিনদারী উদ্ধার ও 'ভোসলে'র সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং, শিবাজীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে জাতে উঠা এবং স্থানীয় নতুন জমিনদার শক্তির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত ছিল। অথাৎ, পুরাতন ক্ষমতাশালী ভূমিজ-শ্রেণীর শক্তিকে কিছুটা খর্ব করে নিজের লোকদের প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষমতার ভিত্তি তৈরী করা শিবাজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[৩৩] তবে এ কথাও সত্য যে, মারাঠা আন্দোলনের এই ধারা একই বৈশিষ্ট্য ও চেতনা নিয়ে এগিয়ে যায়নি। কারণ জমিনদারদের মধ্যে নানা স্তর ছিল এবং মারাঠা আন্দোলণে তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে এবং তার ফলে মারাঠাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও চরিত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সময়ানুযায়ী বদলেছে।[৩৪] মারাঠা আন্দোলনে কৃষক শ্রেণীর অংশগ্রহন এক ভিন্ন প্রেক্ষিত। দাক্ষিণাত্য স্বাভাবিক কারণেই উত্তর ভারত অপেক্ষা অনুর্বর এলাকা ছিল। ফলে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে রাজস্ব আদায় সন্তোষজনক ছিল না। শাহ্জাহানের আমল থেকে কৃষিজ-শ্রেণী চাপের মধ্যে ছিল। 'জমার' পরিমাণ 'হাসিলে'র চেয়ে প্রায় চারগুন বেড়ে গিয়েছিল। মনসবদাররা রাজস্ব প্রদানকারী শ্রেণীর উপর ক্রমশ চাপ এমনিভাবে বাড়াচ্ছিল যে, উদ্ভুত বিদ্রোহের পিছনে সাধারণের সমর্থন ছিল। পরবর্তিকালের পরিস্থিতি সম্পর্কে 'ভীমসেন' 'বুরহান' পুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইরফান হাবিব বলেন " আরজি পৌঁছলো যে সাম্রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে মারাঠাদের মৈত্রী সম্পর্ক আছে। আদেশ হলো প্রত্যেক 'মৌজাতে' ঘোড়া বা অশ্ব যা পাওয়া যাবে তা বাজেয়াপ্ত করা হউক। তখন অনেক মৌজাতে এরকম হলো যে, কৃষকেরা সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে একত্র হল।"[৩৫] গৌতম ভদ্র মনে করেন যে, সমসাময়িক নথিপত্রে দৃষ্ট এ সিদ্ধান্তে আসা খুব একাটা অযৌক্তিক হবে না যে, "মারাঠারা মুঘলদের চেয়ে অধিক জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।"[৩৬] আর এভাবেই মারাঠাদের ঘিরে 'পিন্ডারী' দস্যুদের উদ্ভব হয়েছিল। এই অরাজক ও লুঠতরাজের ডামাডোলে বহু এলাকা জনশুন্য হয়েছিল, কৃষকরা লুঠতরাজে পুরোপুরি নিয়োজিত হয়েছিল, না হয় কোন কোন অঞ্চলে কৃষরা মারাঠাদের সাথে বুঝাপড়ায় এসেছিল।[৩৭] এ ব্যাপারে ইরফান হাবিব মনে হয় সঠিক সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে, "শিবাজীর নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ার আগে দখিনের রাজ্যগুলোর মুঘলদের স্থায়ী চাপের দরুন যুদ্ধের ফলে ঐ অঞ্চলের চাষীরা বহু দশক জুড়ে কষ্ট সহ্য করছিল।" বিশেষতঃ তাড়াতাড়ি দখল করার সম্ভাবনা না থাকলে আক্রমনকারী সৈন্যরা বিরাট এলাকা জুড়ে তান্ডব চালাতো, শস্য কেড়ে নেয়া হতো, মানুষ খুন করা হতো, বা দাসে পরিণত করা হতো। ফলে শান্তির সময়েও চাষীদের পঙ্গু করার মত বোঝা চাপানো থাকত।[৩৮] আর এ কারণেই কৃষকরা শিবাজীকে মদদ দিতে শুরু করেছিল। একটি বিষয়ে ইরফান হাবিবসহ প্রায় সকল পন্ডিতই একমত যে, চাষীরা মারাঠাদের মুঘলদের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করে তাদের সাথে যোগ দেয়নি, বা শিবাজী এবং মারাঠা সর্দারদের কৃষক অভ্যুত্থানের সচেতন নেতা বলে বিবেচনা করা হয়না। তবে মারাঠা আন্দোলনের পিছনেও ইরফান হাবিব 'মনসবদারী' বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকট খুজেঁ পেয়েছেন যেখানে জায়গীর হস্তান্তর ব্যবস্থা এক মাত্র সমস্যার উদ্ভাবনী শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।[৩৯] এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তে ঐতিহাসিক সরলীকরণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বস্তুতঃ মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অসংগতি -যা পতনের যুগে ক্রমে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল, মারাঠা আন্দোলন তারই একটি ঐতিহাসিক পর্যায় মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) শিখ বিদ্রোহঃ

মুঘলদের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলোতে 'শিখ-বিদ্রোহ' একটি বহুমুখী তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। গৌমত ভদ্র এই আন্দোলনের চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "শিখ বিদ্রোহ এমন একটি আন্দোলন যাতে কৃষক বিদ্রোহের নানা স্তর বর্তমান।"[৪০] কারণ বিভিন্ন পর্যায়ে শিখ বিদ্রোহ বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এলাকা অনুযায়ী এর চরিত্রও বদলেছে। আবার শিখ ধর্মের মধ্যেও নানা গোষ্ঠী ছিল। ফলে শিখদের মধ্যে দল বিশেষে ধর্মের ব্যখ্যা নিয়েও বিরোধ হয়েছে। এই শিখরা নিজেদের ধর্মমতের শান্তরূপ থেকে যেভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হল তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র শিখ বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন যা বহুলাংশে-যুক্তি সঙ্গত। ইরফান হাবিব তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, "ইসলামকে যেমন শহুরে লোকদের ধর্ম বলা যায়, তেমনি শিখ ধর্মকে চাষীদের ধর্ম বললে ভুল হবেনা।"[৪১] অধিকন্তু গুরুর বড় বড় 'মসন্ত' (প্রতিনিধি) জাঠ (বৈষ্য) যারা প্রাথমিক পর্যায়ের সমর্থক, ক্ষত্রিয়দের আত্মীকরণ করে নিয়েছিল, এ ক্ষেত্রে গৌতম ভদ্রের ব্যখ্যা বেশ উন্নত। তিনি শিখ ধর্মের রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরে শিখ আন্দোলনের বহু মাত্রিক চিত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন।[৪২] এই পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই শিখ ধর্মমত ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। শিখদের সাংগঠনিক ও ধর্মীয় বিকাশের একটা পর্যায়ে ধর্মীয় চেতনার অন্তরালে তারা ভূমিজ সম্পর্কে নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে হাজির করে। ফলে তাদের ধর্মীয় প্রধান গুরুর ক্ষমতা গোটা শিখ-খালসা সম্প্রদায়ে অর্পিত হল এবং কতগুলো সামাজিক আচরণ ও চিহ্ন ধারনের মাধ্যমে শিখরা সশস্ত্র প্রতিরোধকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করল। অবশ্য আর্থিকভাবে প্রতিটি গুরুদ্বারে 'মগন্দ' বা ধর্মগুরুর প্রতিনিধি থাকত এবং তাঁরা ভক্তদের আয়ের এক দশমাংশ বা 'দশওয়ান্দ' নিত। বস্তুতঃ শিখধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা একটি কর্তৃত্বের সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। ভূমি-কেন্দ্রীক এই ধর্মীয় সম্প্রাদায়ের রাজনৈতিক ভূমিকার কারণেই ক্রমে নির্যাতিত কৃষকরা শিখ ধর্মের আড়ালে আশ্রয় খুজঁল। বস্তুতঃ শিখদের বিভিন্ন ধর্মগুরুর আমলে আন্দোলন ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে সাম্প্রদায়িক অর্ন্তদ্বন্দ্ব ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজমান শ্রেণী ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর জমিনদাররা বান্দার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল, এরকম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজেই শিখ বিদ্রোহ একটি বিচিত্র বহু মাত্রিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত আন্দোলন যা-সমকালীন সমাজ নিরীক্ষনে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্বঃ

আধুনিক গবেষকদের কাছে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য নেতৃত্বের প্রশ্নটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এব্যাপারে ইরফান হাবিব মনে করেন যে, "চাষীদের সব অভ্যুত্থানেই জমিনদারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি; জমিনদারদের সব বিদ্রোহী কাজকর্মই যে চাষীদের সমর্থন পেয়েছিল এমন ভাবারও কোন কারণ নেই। তবে যেসকল বিদ্রোহগুলোতে (যেমন মারাঠা, জাঠ, শিখ) যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তাঁরা জমিনদার নয়, জমিনদার হওয়ার জন্য লালায়িত।"[৪৩] ইরফান হাবিব বিদ্রোহের চরিত্র খুঁজে দেখেছেন সত্যি, কিন্ত বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের প্রশ্নে কৃষকদের ব্যর্থতা অথবা জমিনদারদের পরিণতিমূলক কোন সফলতা না আসার কারণ তেমন গভীরভাবে উপস্থিত করেননি। এ প্রেক্ষিতে কিছু বলা যেতে পারে, শোষিত শ্রেণীর চূড়ান্ত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও মুঘল উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত বিচ্ছিন্নতা (আমরা গ্রাম সমাজ প্রশ্নে আলোচনা করেছি।) কৃষকদের একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত করেনি। ফলশ্রুতিতে চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনী। কৃষকদের এই দুর্বলতার কারণেই এই শ্রেণী আন্দোলনে

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব প্রায়ই উঠে এসেছে প্রাথমিক স্তরের জমিনদার বা 'মালগুজারী' জমিনদারদের মাঝ থেকে। কারণ উদ্বৃত্ত সম্পদের ভাগীদার প্রধানত দুজন, জমিনদার ও জায়গীরদার। সম্পদের সিংহভাগ জায়গীরদারের করায়ত্ব হওয়ার ফলে জমিনদারের সঙ্গে জায়গীরদারের দ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য। ফলে প্রায়ই কৃষক ও জমিনদার তাঁদের সাধারণ শত্রু বা প্রতিপক্ষ জায়গীরদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াত। সংকটকে ঘনীভূত করেছিল আরও দুটি কারণ, প্রথমতঃ জায়গীরদাররা নিজেদের স্বার্থের জন্য এই সময় কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইজারাদারী ব্যবস্থা জমিনদারী স্বার্থে প্রচন্ড আঘাত হানে। নিষ্ঠুর নির্বিচার কৃষক শোষনের ফলে উৎপাদন ব্যহত হয়, ফলে জমিনদাররা আরও ক্ষতির সম্মুখীন হল, কেননা, ইজারাদারী ব্যবস্থায় জমিনদারের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব ইজারাদাররা আত্মসাৎ করে নেয়। ভীমসেনের মতে "জমিনদাররা ঘরমূলুককে ছারখার করল"।[৪৪] 'তিলপথের' 'মালগুজারী' জমিনদার গোকুল ও সানসনি 'ওয়াঙ্গের' 'মালগুজারী' জমিনদার রাজা রাম ও রামচেরার প্রথম পর্যায়ে জাঠ বিদ্রোহের পিছনে প্রধান কারণ ছিল জায়গীরদার অনিরুদ্ধ সিংহদার অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে 'ইন্দ্ররাখির' 'মালগুজারী' জমিনদার পাহাড় সিং নাউরের ক্ষোভ।[৪৫] প্রাথমিক স্তরের জমিনদারদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়ার কতগুলো সুবিধাও ছিল। জমিনদারী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এখানে আলোচনা দীর্ঘায়ু করা ঠিক হবে না। তাসত্ত্বেও অতি সংক্ষেপে দু একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আর্কষন করা যেতে পারে। ইরফান হাবিবের গবেষনায় সমকালীন ঐতিহাসিক যেমন, আবুল ফজল ও বিদেশী পর্যটকদের লিখায় বাদশাহী প্রশাসনের সঙ্গে জমিনদারদের বৈরীতার চিত্র ফুটে উঠেছে। মুলতঃ বিরোধ ছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বাটোয়ারা নিয়ে। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, "বাদশাহী প্রশাসনের সঙ্গে অসম প্রতিযোগীতায় জমিনদারদের যে দুরাবস্থা হতো, সে কারণেই চাষীদের প্রতি তাঁরা একটি আপোষমূলক মনোভাব নিতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ প্রতিরক্ষা বা ফেরারী হওয়া যেকোন ক্ষেত্রেই চাষীদের সমর্থন অপরিহার্য ছিল।" সুতরাং, "সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের অধীন অঞ্চলগুলো থেকে যেসব চাষী পালাত জমিনদাররা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের জমিতে টেনে নিত। এভাবে বিদ্রোহী জমিনদারদের এলাকায় ভালো রকম জন-বসতি হয়ে যায়, আর বিদ্রোহীরা দিন দিন বাড়তে থাকে।"[৪৬] তবে নেতৃত্বের প্রশ্নের বাইরেও গোটা পরিস্থিতিতে কৃষকদের মত জমিনদারদের মধ্যেও নানা স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস ছিল, যেখানে স্বার্থ চিন্তার ভেদবুদ্ধির তারতম্যের ভিত্তিতে অর্ন্তদ্বন্দ্বের চিত্র ছিল নিত্যকার বিষয়। ফলে আন্দোলন যে স্বার্থ বুদ্ধিতেই উদ্ভুত হউক না কেন, আপন স্বার্থ বুদ্ধিতেই উদ্ভুদ্ধ হয়ে কৃষক ও জমিনদারদের কোন কোন অংশ তাতে অংশ গ্রহন করেছে। যেমন, 'জাঠ' ও 'মারাঠা' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল উচ্চাভিলাসী জমিনদাররা । স্বার্থ চিন্তার এক পর্যায়ে প্রাথমিক জমিনদার ও গ্রামীন 'মোকাদ্দম'রা আন্দোলনে পক্ষে এগিয়ে আসে।[৪৭] 'রাজপুত' ও 'বুন্দেলা' আন্দোলনে পুরানো জমিনদাররা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অধিকার বজায় রাখার জন্য সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ থেকে তাঁরা ভারতীয় রাজনীতিতে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল। অন্য দিকে জাঠ ও মারাঠা বিদ্রোহে উঠতি জমিনদার শ্রেণীর একাংশ অংশ গ্রহন করে। তাঁদের লড়াই ছিল নতুন অধিকার পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের ক্ষমতাকে বিস্তার করার জন্য। কাজেই অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁদের ভূমিকাই প্রধান। নিচুতলা থেকে সদ্য উঠে আসা ঐ শ্রেণীর পক্ষে জনতাকে সংগঠিত করা সহজতর ছিল। জমিনদার ও কৃষকদের বিদ্রোহের তুলনামূলক ব্যাপকতা এর দ্বিতীয় শ্রেণীর উঠতি জমিনদারদের নেতৃত্বেই সম্ভবপর হয়েছিল।

আবার কোন কোন আন্দোলনে উপজাতীয় নেতৃত্ব থেকে ব্যাপকভাবে কৃষক ও কারিগরদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 'আফগান' উপজাতি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল পেশকাশী উপজাতি নেতারা। জাঠ ও মারাঠী আন্দোলনের এক পর্যায়ে আমরা প্রাথমিক জমিনদার ও গ্রামীন 'মোকাদ্দাম'দের এগিয়ে আসতে দেখি, যারা একদিকে আবার 'খুদ-কাস্ত' রায়তের পর্যায়ভুক্ত ছিল। "হাতিখেদা" 'সৎনামী' বা 'রোশনীয়া' আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সরাসরিভাবে নিম্ন ও খেটে খাওয়া কৃষকের দলই এসেছে। 'বান্দার' নেতৃত্বে শিখ বিদ্রোহেও আমরা কৃষি সমাজের একেবারে নিম্ন বর্ণের

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের অংশ গ্রহন দেখতে পাই। বস্তুতঃ 'দাসী', 'কুর্মি' ও বান্দার নেতৃত্বের আন্দোলনের মধ্যে সুস্পষ্ট রাষ্ট্র-বিরোধীতা,সঙ্গে অস্পষ্টভাবে মধ্যবর্তী জমিনদারের বিরোধীতার আভাসও পাওয়া যায়।[৪৮] কারণ, গ্রামীন সমাজের উচুঁ মহলের নেতৃত্বের অংশ গ্রহণ এই বিশেষ পর্যায়ে প্রকট নয়। সাম্প্রতিক ইরফান হাবিবের প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, "মুঘল যুগে ভারতীয় কৃষি বিদ্রোহে কৃষকদের শ্রেণী চেতনা প্রকাশ পায়নি, বেশীর ভাগ বিদ্রোহ জমিনদারদের স্বার্থ চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেছে।" কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "বর্ণবৈষম্য ও সামাজিক বিন্যাস এত ব্যাপাক ছিল যে, আত্ম চেতনার কোন বাস্তব ভিত্তিই ছিল না।"[৪৯] কিন্তু ইরফান হাবিবের রচনাতেই শিখ বা সৎনামী বিদ্রোহে শ্রেণী চেতনার প্রাথমিক উন্মেষের কথা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ বিভিন্ন আন্দোলনে ধর্মীয় উন্মাদনা কোন বাস্তব ভিত্তি ছাড়া তার শেকড় খুজে পাবেনা। অথাৎ ধর্মীয় উন্মদনার রসদ সংগ্রহে একটি বাস্তব ভিত্তির প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। উপরন্ত গৌতম ভদ্র মনে করেন যে, "যেখানেই সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছে সেখানেই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে শ্রেণী দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। সেখানকার কৃষক চৈতন্য বার বার পুরনো উপজাতি সমাজের নানা স্মৃতি, স্বর্গ রাজ্যের কল্পনা ইত্যাদি নানা ধর্মীয় চেতনা ঐক্যের সন্ধান দিয়েছে। ঐ সব স্বপ্নের অস্তিত্ব ছিল কৃষকের স্মৃতি, চেতনায় ও সংগ্রামের ঐতিহ্যে।"[৫০] আবার ইরফান হাবিরের রচনাতেই গ্রামীন সামাজের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন ইতিমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, জমিনদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সাধারণ কৃষকরা সরাসরি বাদশাহী প্রশাসনের কাছে আবেদন পাঠাচ্ছে। আবার বেগার খাটতে অস্বীকার করে বহু কৃষকের নির্যাতন সহ্য করার দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। তবে ইরফান হাবিবের এই মতকে অস্বীকার করা যায় না যে,"বেশীর ভাগ ভক্ত সম্প্রাদায় কোন দিনই হয়তো কোন সামাজিক আন্দোলনের রূপও নেয়নি।"এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে সৎনামী ও শিখ আন্দোলনের কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলেন "জাত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বন্ধন যেমন একদিকে কৃষক অভ্যুত্থান ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, তেমনী এই সব অভ্যুত্থানের শ্রেণীগত প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট করে তোলার দিকেও নিয়ে যায়"[৫১] তা হলেও তিনি জমিনদার শ্রেণীর নেতৃত্বে কিছুটা শ্রেণী চেতনার ধারণা আন্দোলনে কাজ করেছিল বলে মনে করেন, যেখানে জমিনদারদের নিজস্ব স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছিল। কারণ, শোষক ও শোষিতের অবস্থান প্রশ্নে হলেও বাদশাহী প্রশাসন ও অত্যাচারিতদের মধ্যে এক প্রকার ঐক্য কখনো কখনো ব্যাপক বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে। এ পর্যায়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়াঁচ্ছে যে, কেন মুঘলদের প্রতিপক্ষ হিসাবে কৃষক ও শোষিতের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদবুদ্ধি পরিস্ফুট হয়নি? এর উত্তর সম্ভবতঃ সামাজিক অবস্থার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের সর্ম্পক প্রসঙ্গে কৃষকদের ধারণায় [৫২] অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কৃষকদের কাছে সামন্ততান্ত্রিক আমলা ভিত্তিক মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব বা হুকুম একক ও বাইরের বস্তু। সেই কর্তত্বের দাবী এত বেশী ছিল যে, কৃষকের ঘৃনা মূলতঃ রাষ্টীয় ক্ষমতার প্রতিভূদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। কৃষকদের সকল ক্ষোভ ছিল স্থানীয় রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি, আর বাদশাহী প্রশাসন ছিল কৃষকদের ধারণার বাইরের শক্তি। আবার 'কওম' চেতনা ও জাতপাতের ঐক্যের সাথে সাথে নানা ধরনের সামাজিক আদান প্রদানের সর্ম্পক গ্রামীন কর্তৃত্বকে কৃষকের কাছের মানুষে পরিণত করেছিল।ফলে কৃষক তাদের স্বার্থের সত্যিকার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কখনোই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, মুঘল ভারতের কৃষক চৈতন্য মোটা দাগে প্রকাশ না পেলেও স্থান, কাল পাত্র ভেদে নানাভাবে. কখনো কখনো এর প্রকাশ ঘটেছে। কৃষক সমাজে নানা স্তর সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পারস্পরিক টানাপোড়নে এই বহিঃপ্রকাশ গুলোর রূপ নির্ণয় করে মাত্র।

এই পর্যায়ে বর্ণ ও ধর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। কৃষক আন্দোলনে বর্ণের ও ধর্মের ভূমিকার কথা ইরফান হাবিব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, "সমকালীন নথিপত্রে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণগুলোর উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হলেও সচেতনার অভাবে লেখকরা ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বা

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সচেতনার ব্যাপারে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না।"[৫৩] ইরফান হাবিব বিদ্রোহগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, 'কওম' চেতনা বা উপজাতীয় ঐক্য যেমন আন্দোলনে ঐক্য ও চেতনার ভিত তৈরী করেছে, তেমনি ধর্মীয়ভাব ও উম্মাদনাও কৃষক-বিদ্রোহে ঐক্যের ভীত রচনা করেছিল। তিনি বলেছেন যে,"সৎনামী ও শিখ বিদ্রোহে যোদ্ধাদের ঐক্য গড়ে তোলায় জাতের জায়গা প্রায় পুরোপুরি নিয়েছিল ধর্ম"। অন্য দিকে জাঠ বিদ্রোহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছে যে, "একটি কৃষক বিদ্রোহ কিভাবে জাতের পথ ধরে এগোতে পারে তার সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বোধ হয় জাঠ বিদ্রোহ"। সুতরাং, এ কথা বলা যায় যে, ইরফান হাবিব জাতপাতের বাইরেও ধর্মীয় চেতনায় কৃষক ঐক্যের ভীত্তিকে অস্বীকার করেননি। তবে বিষয়টিকে যথার্থ স্পষ্ট করে তোলার জন্য যতটুকু ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের প্রায়োজন ছিল, তিনি তা করেননি। এ পর্যায়ে এর উপর সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। এ কথা বোধ হয় বলা যায় যে জমিনদাররা অনেক সময় বর্ণ ব্যবস্থার সংযোগে একই বর্ণভুক্ত রায়তদের সমর্থন প্রত্যাশা করতে পারতেন। মুঘল সামাজিক চেতনা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, বরং বর্ণ ও ধর্মীয় উম্মাদনার ভিত্তিতে শ্রেণী চরিত্র পরিবর্তনে সচেষ্ট ছিল। এ প্রশ্নে জাতিগত ঐক্যও এক ধরনের সংহতি এনে দিত। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রামের বসতি স্থাপন ও বিভিন্ন অধিকারের প্রশ্নে বর্ণ সর্ম্পক ভীষনভাবে জড়িত ছিল। মুঘল ভারতের কৃষি সংকটের পিছনেও এই ব্যবস্থার একটি বড় ভূমিকা ছিল। কেননা, গ্রামীন কৃষি ব্যবস্থায় 'খুদ কাস্তা' কৃষকরা নিম্নবর্ণের লোকদের কখনো ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত সুযোগ দেয়নি, বরং এক্ষেত্রে সম্পন্ন রায়তরা প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা সাফল্যের সাথেই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষি সেহেতু "কওম" বা গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার বা বিস্তৃতির লড়াইয়ের নামান্তর।

মধ্যযুগের বাতাবরণে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।চিন্তা ও চেতনার জগতে সাধারন মানুষ ধর্মের নামেই ভাবত।[৫৪] কৃষক আন্দোলনে আমরা ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত কর্ম কান্ড লক্ষ্য করি। এই ধর্মীয় উন্মাদনা কখানো কখনো বিদ্রোহের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই একথা বলা যায় যে, ধর্মীয় চেতনা, প্রয়োগ ও ব্যবহারেও রকমফের ছিল। যেমন,শিখ নেতা বান্দার আন্দোলনের উন্মদনা মুসলিম নিম্ন বর্ণের লোকদের কয়েকটি জায়গায় শিখদের পক্ষে এনেছে। কিন্ত প্রতিপক্ষও কয়েকটি জায়গায় বান্দার আন্দোলনের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে ধর্মের জগির তুলে নিম্নবর্ণের মুসলমানদের ইসলামের নামে সমবেত করতে পেরেছিল। এভাবেই সুলতান পুরের সামস্ খান 'রাফিদা' বা নিম্নবণের মোল্লাদের এ কাট্টা করে শিখ সৈন্যদের প্রতিরোধ করেছিলেন।[৫৫] এখানে ধর্মের প্রভাব শিখ বিদ্রোহের শ্রেণী চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

তথ্য নির্দেশ

১ Satish Chandra, *The parties and the polities of the Mughal Court*, Dehli, 1972, See Introduction

২ *Ibid*, See Introducation.

৩ J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, Dehli,1967 PP 198 - 214.

৪ Satish Chandra, *op.cite.* P. 25.

৫ সতীশ চন্দ্র,মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি, কলিকাতা,১৯৭৮, পৃ.২৮

৬ Iktidar Alam, *A Note on the Social Contradictions of Indian Feudalism*, Indian, Review, 1972,AP.- June

৭ বিস্তারিত দেখুন, Lenin , *Sclieted Works*, vol. 2, Moscow, 1950,P. 412

৮ S.P. Sangar, *Crim and punishment in Mughal India*, Delhi, 1967, Chap.6

Dhaka University Institutional Repository

৯ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬২

১০ Mirza Nathan, *Baharistan-Ghayebi,* tr.by M.I.Borah, Gauhati, 1936, Vol. 1. PP. 276 - 96

১১ *Ibid,* P.61

১২ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬৫

১৩ H. K. Nakvi, *Incident of Rebellion during The Reign of Emperen Akbar* Medieval India Vol. 11, p. 167

১৪ H Beveriedge, *Three episodes in the life of Akbar,* indian Review , Vol Vll Madras, 1906

১৫ *Travls* , Tr, C. E luard, Landon, 1927, Vol. 1 p.45

১৬ মুকুন্দ রাম, *চন্ডিমঙ্গল, কলকাতা, ১৯২৪, প্রথম খন্ড*, পৃঃ ৭৬

১৭ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪

১৮ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১২৯

১৯ Mirsa Nathan *op, cite.* Vol. 2. p. 130

২০ পূর্বাঞ্চলের প্রথা অনুসারে যুদ্ধের সময় শ্রমের বিনীময়ে চাষাবাদ

২১ Olah Carac, *The Pathan,* London, 1954,p.36, olat carac, *The Rashinia movements and the Mughals,* lslamie culture, 1925 April

২২ J. N Sarkar , *history of Aurangzeb,* calcutta 1952,Vol .v. p. 169

২৩ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪৫-১৪৭

২৪ A. M.Shah, *political system in 18th Century Gujarat* , Enquiry ,1964, Spring

২৫ H.H. Wilson ,*Religious sects of Hindus,* Calcutta, 1958, pp 199.200

২৬ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪৯

২৭ K . K Qunungo, *History of the Jats*, Calcutta, 1925, Appendex -C

২৮ *Ibid,* Appendex -C

২৯ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৫২

৩০ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৫৭

৩১ H. J. Reverty, *Notes on Afghanistan and parts of Baluchistan,* London, 1862, p. ৭৮

৩২ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৬৬

৩৩ MuZaffar Alam, *The Zamindar and Mughal power in Deccan, (1685-1712)* IESHR, 1974, March

৩৪ I. B. Banerjee, *Evolution of khalsa,* Vol .I, 11 Calcutta , 1972

৩৫ Irfan Habib, *The Agrarian system of Mughal India (1556-1707),* Bombay, 1963 p. 330

৩৬ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭ Ganda Singh, *Nanak Pahthis* , JIH, Vol, Xix, part. 2, August

৩৮ Irfan Habib ,*op, cit* . p . 348

৩৯ ইরফান হাবিব জাগীরদারী সংকটকে প্রধান প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে দেখেছেন। আবার মারাঠা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, পৃ. ৩৪৬-৩৫১

৪০ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭২

৪১ Irfan Habib ,*op, cit* . p . 344

৪২ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭০-১৭৭

৪৩ Irfan Habib ,*op, cit* . p .338

৪৪ *Dustur -i - umal- Bakus*, Tr. N.A Siddiqui, PIHC, Aligur ,1960 p , 160

৪৫ J . N Sarkar; *The Breakdown of The Mughl Empire*, Indian Review 1926, oct. pp . 450 -455

৪৬ Irfan Habib ,*op, cit* . p .336

৪৭ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৮

৪৮ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৮

৪৯ Irfan Habib , *Forms of class Struggle*, PIHC, Bombay, 1980, pp, 54-55, *The Agrarian, op, cit* . p .333

৫০ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৯

৫১ Irfan Habib ,*op, cit* . p . 333

৫২ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৯

৫৩ Irfan Habib ,*op, cit* . p . 338

৫৪ গৌতম ভদ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৮৯

৫৫ M .A.. Maclaiffe, *The sikh Religion*, Vol. VII, Oxford, 1909 pp. 163-64

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র আলোচনার পদ্ধতি বা শাখা হিসাবে মুরল্যান্ড ও কে.এম. আশরাফ সর্ব প্রথম আবিস্কার করেন। মুরল্যান্ড তাঁর 'India at the Death of Akbar' গ্রন্থের মাধ্যমে উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের পদ্ধতিগত আলোচনার ও গবেষণার দুয়ার উন্মোচন করেন। তবে কে.এম.আশরাফ তাঁর 'The life and Condition of the people of Hindustan' গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গ্রামীন জীবন, জীবন যাত্রার মান, গার্হস্থলী জীবন, চিত্ত বিনোদন, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় কদাচিৎ সমাজবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণী বিশ্লেষণ, সামাজিক অবকাঠামো, সমাজবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, দল ও উপদল, শ্রেণীবদ্ধ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর গুরুত্ব এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব, বিশেষ করে সামাজিক পরিবর্তন ও উৎপাদন সম্পর্কের নিরীখে আলোচনা করেননি।

কিন্তু ইরফান হাবিব তাঁর 'The Agrarian system of Mughal India' গ্রন্থে সর্ব প্রথম আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনায় একটি পরিপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তাঁর এই গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ দলিল। এই ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাস পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক নয়া রচনাশৈলী বা পদ্ধতি ঐতিহাসিকদের সন্মুখে উপস্থিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং তাঁর বাংলা সংস্করণের ভূমিকায় বলেন যে, "এর বিষয় হলো: কৃষকদের কাজ ও কৃষি-জীবনের চারধারের বস্তুগত ও সামাজিক অবস্থা, আর এই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো।" পুস্তকখানির বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি প্রশাসন। এ কারণে পুস্তকটিকে তৎকালীন ভারতের কৃষি ইতিহাস বা কৃষি অর্থনীতির ইতিহাস বললে এর সঠিক মূল্যায়ন হয়না। কেননা, ভূমি রাজস্ব ও রাজস্ব প্রশাসনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসনযন্ত্র জড়িত। উপরন্ত সামরিক শক্তি নির্ভর মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক আয়ের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। স্বাভাবিক কারণে রাষ্ট্রীয় আয়ের সিংহভাগ আসতো কৃষি থেকে। কাজেই, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। সঙ্গত কারণেই গ্রন্থটিতে আলোচ্য বিষয় হিসাবে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, এমনকি সাধারণের জীবন পদ্ধতি উঠে এসেছে। তাই গ্রন্থটি মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

মুরল্যান্ড সর্ব প্রথম কৃষি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার যে পদ্ধতি উন্মোচন করেন তা ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। আর ইরফান হাবিবের এই গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাস রচনার নয়াপদ্ধতিগত রূপ দিয়েছে, যা পরর্বতিকালের ইতিহাস পাঠকদের ইতিহাস চর্চায় নতুন পথ পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুতঃ তিনি ইতিহাস চর্চার জগতে ইতিহাস চিন্তন ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে অভিনব অবদান রাখলেন সত্যি, তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক মহলে তাঁর রচনাশৈলী ও চিন্তন নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে। আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র তাঁর "মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ" গ্রন্থের ভূমিকায় ইরফান হাবিবের রচনায় যথার্থতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন "ইরফান হাবিব বা আতহার আলির জবাবের যুক্তি বিন্যাস পুরনো ধাঁচের, নতুন তথ্য পুঞ্জের বিশেষ কোন ইঙ্গিত নেই। প্রথমতঃ বহু জায়গায় পূর্বপক্ষের দলিল ব্যবহার প্রসঙ্গে তারা খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন তুলেছেন।" অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "বেইলি; উইংক, মুজাফফর আলম, হরব্নস মুখিয়া প্রমুখ ঐতিহাসিকের তথ্য উপস্থাপনা ও যুক্তি বিন্যাসে আকাশ-পাতাল ফারাক থাকলেও তাঁদের ইতিহাস চেতনার মৌলিক পার্থক্য নেই।" তিনি ইরফান হাবিবের ইতিহাস চেতনা ও আলোচনা পদ্ধতিকে উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের একই কাতারে দাঁড় করিয়েছেন।

গৌতম ভদ্র মনে করেন, "নিষ্কর্ষনবাদের ছোঁয়া ইরফান হাবিবের রচনাতেও আছে, তালিকা ভিত্তিক লক্ষন তিনিও বিচার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি বর্ণণাত্মক নাম ছাড়া তিনি কোন তত্ত্ব বা বর্গের ধারণায় উপস্থিত হতে পারেননি।"

উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইরফান হাবিবের মতামতের সমালোচনা করে গৌতম ভদ্র বলেন "ইরফান হাবিব সামন্তবাদের প্রধান নির্ধারকগুলোকে ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন; মুলধন সঞ্চয়ের প্রবনতাকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নজির হিসাবে মেনে নিয়েছেন এবং ঐ লক্ষনটি তাঁর কাছে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। মুঘল অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভবনা খুজাঁই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।"

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিজ সমাজের আবর্তন, মুঘল আমলে কৃষিজ সমাজের সংকটের ছবি স্পষ্ট হলেও তাঁর পরম্পরার যুক্তিকে ইরফান হাবিব যেভাবে সাজিয়েছেন তা নিয়েও গৌতম ভদ্র প্রশ্ন তুলেছেন, এমন কি তথ্যের দিক দিয়েও ইরফান হাবিবের যুক্তির মধ্যে ফাঁক রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি মনে করেন, "জমিনদার কৃষক ও রাষ্ট্রের ত্রিমুখী সম্পর্ককে শুধু উর্বরতা ও উৎপাদনের হ্রাস,রাজস্বের চাহিদা বৃদ্ধি বা কৃষকের কর দেয়ার সামর্থ্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যান্ত্রিক চিন্তা।" কেননা, আধিপত্য ও আনুগত্যের টানাপোড়নে রাজনৈতিক, সামাজিক, ও আদর্শগত ক্ষমতার নানাস্তরে কৃষক, জমিনদার ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিন্যস্ত থাকে। এই সম্পর্কের সংকট শুধু "জমা' 'হাসিলের' আনুপাতিক যোগ বিয়োগে ধরা যায়না।

পরিশেষে ইরফান হাবিবের পান্ডিত্য বা আকর গ্রন্থের উপর তাঁর দক্ষতা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, "ইরফান হাবিবের ইতিহাস রচনার ছক মাঝে মাঝে অপরিসর বলে মনে হয়। অন্যন্য ঐতিহাসিকদের সাথে তাঁর ইতিহাস চেতনা ও রচনাশৈলী ঝোঁকে, সিদ্ধান্ত বা মেজাজে পার্থক্য প্রচুর। কিন্তু জ্ঞানাঙ্গনের ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষের শরীক।"

গৌতম ভদ্র ও অন্যান্য গবেষকদের সমালোচনা ইরফান হাবিবের ক্ষেত্রে নির্বিচারে গ্রহন করা যায় না। গৌতম ভদ্র ইরফান হাবিবের রচনাশৈলী, জবাবের যুক্তি বিন্যাস, পূর্বপক্ষের দলিল ব্যবহার প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন তুলে যে ত্রুটি আবিস্কার করেছেন তা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ইরফান হাবিব ভারতের সমাজ ইতিহাসের প্রাথমিক বা মূল উৎসাদি নিয়ে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ, তথ্যের সত্যতা এবং পূর্ববতীদের তথ্য ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা আবিস্কার করে এক দিকে যেমন তথ্য সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছেন, অন্য দিকে তথ্যের বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ ইতিহাস রচনার পথকে ব্যাপক ও সহজতর করেছেন।

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের মূলগ্রন্থিগুলো নিয়ে তিনি যে ব্যাপক তথ্যনিষ্ঠ ও তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন তার মূল্যও অনেক।

উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ সমাজে বিভিন্ন স্তর কাঠামোর রূপান্তরে বাণিজ্য ও পুঁজি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা, উৎপাদন রূপান্তরে তাদের ভূমিকার দিকটি তাঁর গবেষণায় বহুলাংশে উন্মোচিত হয়নি। মুঘল যুগের বণিকদের উৎপাদন ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে কি ভূমিকা ছিল; সে প্রশ্ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক মূলধনের বিপুল পরিমাণ মুঘল অর্থনীতির রূপান্তরে ঘটাতে পারত কি না? এ প্রসঙ্গে জবাব আবশ্যক কিন্তু ইরফান হাবিবের গবেষণায় তা উঠে আসেনি। পরবর্তি কালে অষ্টাদশ শতকে গঁজিয়ে উঠা বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ক্ষমতা ও মুঘল-ই-আজমের বণিকদের কি সম্পর্ক ছিল? তা জানা দরকার। কারণ, অষ্টাদশ শতকের সংকটের বণিকরা কি ভূমিকা নিয়েছিল, তা নিয়ে বর্তমানে গবেষক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইরফান হাবিবের আলোচনার এই ঘাটতির পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ মুদ্রা, অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডকে একটি পৃথক প্রতিপাদ্য হিসাবে বিবেচনা করার কারণেও হয়ত বা তিনি এসকল বিষয়ে গভীর আলোচনায় প্রবেশ করেননি। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁর বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিষয়গুলোর গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি মনে করেননি। তবে ইরফান হাবিব তাঁর আলোচনার পরিধি বাড়িয়ে অথবা উপস্থাপন কৌশল কিছুটা রদবদল করে উল্লিখিত বিষয়গুলোর গভীরে প্রবেশ করলে তাঁর এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মূল্য বহু গুন বেড়ে যেত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জী

⌘ **Allami Abul Fazal** : (i) The Ain-i Akbari, tr. by. b Blockman & Revised by D.C. Philips, Manoharlal, 1977 (3rd ed.), 2 vols., (ii) Akbar Nama tr. by H. Beveridge, Calcutta, 1928.

⌘ **Ashraf,K.M** : Life and Conditions of the People of Hindustan (1200-1500),Calcutta, 1935; Delhi. 1959.

⌘ **Agarwal, C.M** : Wazirs of Auragzed, Bodh Gaya, 1928.

⌘ **Ahmad, Nazamuddin** : The Tabaqat Akbair, tr. by B.De, Calcutta 1936.

⌘ **Ahmad,M.B.** : The Administration of Justice in Medieval India, Calcutta, 1966.

⌘ **Ali, M. Athar** : Mughal Nobility under Augrangzeb. Bombay, 1966

⌘ **Ansari, M.A.** : European Travelers under the Mughals 1580-1627, Delhi, 1975.

⌘ **Aziz, Abdul** : (i) The Mansabdari System and the Mughal Army, Delhi, 1972 (ii) Arms and Jewellary of the Indian Mughal Lahore, 1947.

⌘ **Bhargava, V.S,** : Marwar and the Mughal emperors, (1526-1748), Delhi, 1966

⌘ **Burn, sir Richard** : ed. The Cambridge History of India, Vo. IV, Cambridge, 1957.

⌘ **Babar, Zahiruddin Muhammed** : Babur-Nama, tr by A.S Beveridge, London, 1921, 2 vols.

⌘ **Badauni, (Abdul Qadir Inn-I Muluk Shah)** : Muntakhabu-i Tawarikh, tr. & ed. by **W.H.** lowe, rev. **B.P** Ambasthya, Patna, 1973, 3 vols

⌘ **Baden-Powell, B.H,** : The Land System of British India, Oxford,1892.,

⌘ **Chandra, Satish** : The Parties and Politics at the Mughal Court, (1707-1740), Delhi, 1971; 2nd edn, Aligarh, 1959; 3rd edn; Delhi, 1979

⌘ **Bernier, Francois** : Travels in the Mughal Empire, ed. Archilbald Constable, Delhi, 1972 (reprint).

⌘ **Bhim sen** : Nushka-i Dilkhusha, tr. by J.N. Sarkar, Bombay, 1972.

⌘ **Bilimoria I.H. (ed)** : Letters of Aurangzeb, Bombay, 1908.

⌘ **Chadra, Satish** : (i) Parties and Politics at the Mughal Court. (1707-1740), (1st ed. 1959). 1972 (2nd ed.).

(ii) Medieval India:Society, Jagirdai crisis and the Village, Macmillan, 1982.

⌘ **Correia, Alfonso John** : (i) Jesit Letters and Indian History, O.U.P. 1969.

(ii) (ed.) Letters from the Mughal Court, Ananda, 1980.

⌘ **Chicherov, A,I** : Indian Economic Development in the Sixteenth-Eighteenth Centuries: Outline History of Crafts and Trade, Moscow, 1971.

⌘ **Das Gupta, Ashin** : Indian Merchants and the Decline of Surat, (1700-1750), Weisbaden, 1979.

⌘ **Day, U.N.** : The Mughal Government, Manoharlal, Bombay, 1969.

⌘ **De Laet** : Empire of the Great Mogul, tr. by Banerjee & Hoyland, Bombay, 1969.

⌘ **Duff, Grant,** : History of Martha's, Calcutta, 1918

⌘ **Elliott, H** : The History of India as told by its own Historians, London, 1867-77, 8 vols.

⌘ **Encyclopedia of Islam** : Luzac, 1913

⌘ **Gopal, Surendra** : Commerce and Craf in Gujarat, N. Delhi, 1975.

⌘ **Goswami, B.K & Grewal, J.S** : Mughals and the Jogis of Jakhbar, Simla, 1967.

⌘ **Grewal, J.S. : Gupta, Pratul Chandra & Dimmock, E.** : (I) Muslim Rule in India : The Assessment of British Historians, O.U.P., 1970.

Maharashtra - Purina, Honolulum, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

⌘ **Habib, Muhammed & Nizami, K.A** : A Comprehensive History of India, Bombay, 1970, vol. V

⌘ **Hardy, peter** : Historians of Medieval India, London, 1960 .

⌘ **Hasan, Ibn.** : The Central Structure of the Mughal Empire, O.U.P. 1967(reprint)

⌘ **Huq, M.** : The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1784 ,Dacca, 1964.

⌘ **Hodivala R.H** : Historical Studies in Mughal Numismatics, Calcutta, 1923.

⌘ **Hussaini, S . A .Q .** : Administration under the Mughals, Dacca, 1952 .

⌘ **Hunter ,W.W.** : Bengal Records, London, 1872

⌘ **Hussaini, Yusuf (ed)** : Selected Documents of Aurangzeb's Reign, Hydrabad, 1968 .

⌘ **Hussaini, W.** : Administration of Justice during the Muslim Rule in India, Calcutta , 1934.

⌘ **Irvine, W.** : The Army of the Indian Mughals, New Delhi (reprint),1962 .

⌘ **Khan, Ali Muhammed** : Mirat-i-Ahmadi tr. by Lokhandwala, Baroda, 1965

⌘ **Khan, Kunwar Refakat Ali** : The Kachawas Under Akbar and Jahangir, New Delhi 1976 .

⌘ **Khan, Muhammed Hasim khafi (in short khafi khan)** : Muntakhabul-Lubab, tr. by H. M. Elliot & ed. by j . dawson, Calcutta, 1752 (2nd ed.), 1st ed., 1877.

⌘ **Khan, Iqtidar Alam** : Political Biography of a Mughal Noble, Orient Longman, 1973.

⌘ **Khan, Safat Ahmed** : Sources for History of British India in the 17th century, O.U.P. 1926 .

⌘ **Khan, Saqi Mustad** : Maasir-i Alamgiri, tr. by J.N. Sarkar, Calcutta, 1949.

⌘ **Kremar, Von.** : Orient Under the caliphs, tr. by khuda Buksh, Lahor, 1926.

Dhaka University Institutional Repository

⌘ **Kumar, Ravinder** : Western India in the Nineteenth Century, London, 1968.

⌘ **Khwandmir** : Qanun-i Humayune, tr. by Baini Prasad, Calcutta, 1940.

⌘ **Jahangir** : tuzuk-i Jahangiri, tr. by A . Roberts & ed. .by H. Beveridge, Delhi, 1968(reprint).

⌘ **Manucci, Niccolai** : Storia de Mogor, tr. by W. Irvine, (Indian ed.) 4 vo l s

⌘ **Martin, francois** : Memoires, Paris, 1931-34, 3 vols.

⌘ **Moreland, W.H.** : (i) Agrarian System of Muslim India, Delhi, 1968, (2nd ed.).

(ii) India at the death of Akbar, London, 1927.

(iii) From Akbar to Aurangzeb, Bombay, 1949.

⌘ **Foster, William** : (i) ed. Early Trabels in India (1583-1630), London, 1927,

(ii) The English Factories in India (1618-11669), 13 Vols. Oxford, 1906-1927.

(iii) ed. Letters recived by the East India Company, London, 1897.

⌘ **Father Monserrate** : Commentary ed. by Bannerjee & Holland, London. 1936.

⌘ **Mukhia, Harbans** : Historians and Historiography during the reign of Akbar, Vikas, 1976.

⌘ **Marain, Brij &'Sharma, shri Ram (tr)** : A contemporary Dutch Chronicle of Mughal India, Calcutta, 1957.

⌘ **Nathan, Mirza** : Baharistan-i Ghayebi, tr. by M. I. Borah, Gauhati, 1936, 2 vols.

⌘ **Naqvi, H.K** : Urban Centers and Industries in Upper India 1506-1803, Bombay, 1968.

⌘ **Naive , Hammed Khan** : Urbanization and urban centers under the great mughals, simla, 1972,

⌘ **Nizami, M.N.** : Marchants and rulers of gujarat, California, 1976.

⌘ **Nural Hasan, S.** : Thoughts on Agrarin Relations, Delhi 1973.

⌘ **Pelsaert, francisco** : remononstrantic (jahangir's India), tr. ed. by W.H. Moreland & P. Geyl, Delhi, 1972.

⌘ **Polier, A.L.H.** : Shah Alam 11 and his court ed. by P.C. Gupta, Calcutta, 1947.

⌘ **Prasad, Beni** : History of Jahangir, Allahabad, 1940.

⌘ **Saran. P** : " Two Formans of Aurangzeb" Culten, 1945, PP. 261-69.

⌘ **Prasad, R.N.** : Raja Man singh of Ambar, Calcutta, 1966.

⌘ **Qamasuddin, Muhammed** : Life and times of Murad Baksh, Calcutta, ,1974

⌘ **Q. Ahmad** : " Public opinion as a faction in the government appointment in the Mughal State, " PIERCE, 1955

⌘ **Qureshi, I.H.** : I) The Administration of the mughl Empire, Karachi, 1966

ii) The Administration of the Sultanate of Delhi, 1958 (4th ed.)

⌘ **Ray, AC** : A history of Mughal navy and naval warfares, Calcutta, 1972.

⌘ **Ray Nihar Ranjan** : Mughal Court Paintings, Delhi, 1975

⌘ **Raychaudhari,T.** : Bengal Under Akbar and Jehangir, 2nd rev. edn., Calcutta, 1953.

⌘ **Richards, J.F.,** : The Mughal Administration of Golconda,Oxford, 1975.

⌘ **Raychoudhury, Makhsn Lal** : Din-Ilahi, Calcutta , 1952(2nd ed. .)

⌘ **Rennefort, Souchon de** : Histories Des Indies Orientals , Leiden , 1688.

⌘ **Rizvi. S.A.A** : Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign , Bombay, 1975.

⌘ **Roe, Thomas** : The Embassy of Sir Thomas Roe , ed. .by W. Foster.

⌘ **Saràn, P.** : Provincial Government of the Mughals, Allahabad, 1941.

⌘ **Sarkar, Jadunath** : (i) Mughal Administration,Orinrt Longman, 1972, (3rd ed).

(ii) History of Aurangzeb, 5th ed, Calcutta , 1952,

(iii) Bangal Nawabs, Calcutta, 1952 .

(iv) India of Aurangzeb, Calcutta, 1901.

(v) Military History of India, Calcutta, 1960.

(vi) Shivaji and His Times, Calcutta, 1948.

(vii) Life of Mir Jumla, Calcutta, 1920.

(viii) Administrative System of the Marathas, Calcutta, 1925.

Sen, S.N. : Military System of the Marathas, Bombay, 1981.

⌘ **Sharma G.N.** : Mewar and the Mughal emperors (1526-1707), Bombay,1951.

⌘ **Sharma , Shri Ram.** : (i) A Contemporary Dutch Chronicle, Bombay, 1966.

(ii) Mughal Governenment and Aministration ,

Bombay , 1951, (1st ed .), 1965(2nd ed.).

⌘ **Sherwani, Haroon Khan** : Studies in the History of Early Muslim Political Thought and Aministration ,Delhi, 1976,(reprint).

⌘ **Siddique, I.H.** : History of Sher Shah Suri, Aligarh , 1971.

⌘ **Siddiqi, Noman Ahmed** : Land Revenue Aministration Under the Mughals, Bombay, 1970.

⌘ **Smith Vincent** : Akbar the Great Mughal , Oxford , 1926.

⌘ **Thomas Roe & John Fryer** : Travels in India in the seventeenth century, London, 1873.

Dhaka University Institutional Repository

⌘ **Thomas , Edward** : The Revenue Resources of the Mughal Empire, in India, Dellhi, 1967, (reprint).

⌘ **Tripathi R.P.** : Some aspects of Muslim Administration, Allahabad, 1936.

⌘ **Trimizi, S. A. I** : Some Aspects of Medieval Gujarat , Bombay, 1968.

⌘ **Trimizi R. P.** : (i) Rise and Fall of the Mughal Empire , Allahabad, 1960 (2nd Ed).

⌘ **Wjeeler, J. T.** : Early Travels in India, Gurgaon, 1975 (reprint).

⌘ **Wilson H.H.** : A Glossary of Judicial and Revenue Terms, (reprint), Delhi, 1968.

⌘ ভদ্র গৌতম ঃ : মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ; কলিকাতা, ১৯৯১

⌘ সতীশ চন্দ্র: : মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি ১৭০৭-১৭৪০
চন্দ্রিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুদিত, কলিকাতা, ১৯৮৮

⌘ ইরফান হাবিব : মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫২৬-১৭০৭)
স্নেহোৎপল দত্ত, তরুন পাইন সৌমিত্র
পালিত অনুদিত ; কলিকাতা, ১৯৮৫

ARTICLES

⌘ **Ahmed Keymuddin** : Meanig & Usages of some terms of Land Revenue Administration, Medieval India, A Miscellany, ed. K.A. Nisami, Vol. 2, P 287.

⌘ **Chandra, Jnan** : " Alamigir's Grant to a Brahmin " in the journal of Pakistan Historycal Society, 1959, No.7.

⌘ **Chandra, Satish** : " Some Aspects of Indian Village Society in Northern India during the 18th Century the position and Roleof the Khud Kast and Pahi Kast " in The Indian Historical Review, March 1974, Vol. V, No 1.

⌘ **Chatterjee, Ratnabali** : " Allegorical Portaits of Asaf Khan " in Calcutta Historical Journal, 1981, Jan-June Vol. V, No 2.

⌘ **Choudhury, K.N.** : " The Structure of indian Textilt Industry in the 17th and 18th Centuries" in Indian Economic and Social History **Review**, 1974, June, Vol.V, No 2

⌘ **Chadra, Satish** : Some Aspects of Indian Village society, IHR, Vol.1, no.1

⌘ **Grover B.R.** : **Nature** of Dehat-i Tahiqa and the Evlution of the Taluqdari System during the Mughal Age, in the Economic and Social History Review, 1965, II No. 3 & No 4.
(i) The concept of Village Community in North India During the Mughal Age and the Pre-British Era',Seminar paper, Indian Institute of Advanced Studies, Simla, 1965.
(ii) ' Nature of Land Rights in Mughal India ', IESHR, Vol.1, No.1,1963.
(iii) Nature of Dehat-i-Taaluqa and Evolution of the Ta luqdary System. During Mughal India . IESHR, Vol.2, No.3,1965.

⌘ **Habib, Irfan** : (i) " Banking in Mughal India " in Contributions to Econominc Histroy, 1960.
(ii) " The Family of Nur Jahan in Jahangir's Reign A Political Study " in Medieval India – A Miseellany, I, 1969,
(iii) " The Mansab System, 1595-1637 " in The Proceeding of the Indian History Congress, 1967.
(iv) Distribution of Landed Property in Pre-British India
"Distribution of Lan ded property in pre- British India, Enquiry, 1965, Winter. " Agrarian Relation & Economy in the Region of U.P. IESHR, Vol, U no.3, 1967 july - Sept. p.238.Banking in Mughal India, " Contri bution to Economic History, Vol.1 Calcutta, 1960. " Potentialities of capitalist Development in the Economy of Mughal India, " Socialist Digest, No.6, 1972. P. 89

Dhaka University Institutional Repository

⌘ **Hasan, Aziz** : (i) "The Silver Currency output of the Mughal Empire and Price Changes in India during the 16 th and 17 th centuries " in the Indian Ecnomic and Social History Review, March 1969, VI No. 1.

(ii) " A Reply " in I bid, 1970, VII.

(i) " The Theory of Nur Jahan Junta " in the Proceedings of the Indian History Congress, Trivandrum Session, 1958.

(ii) Zamindars in Mughal Empire" in Indian Economic and Social History Review, 1964.

(iii) " Three Studies of Zamindari System " in Medieval India - A Miscellany, 1968, Vol. I.

⌘ **Hasan S. Nural** : (i) " Aspects of Zamindary System in Deecan," PIHE, Benares, 1969,

(ii) ' Three Studies of the Zamindari System, ' Medieval India, Miscellany, Vol.1, Bombay, 1961.

(iii) ' The Position of the Zamindar in the Mughal Empire', IESHR, Vol.1, No.1, 1964.

(iv) The Pattern of Agricultural Production in the Territories of Amber (1650-1750), IHC,1966.

⌘ **Iqbal Hussain,** : " The Madad-i Mash Regulations in the Mughal Empire" in the Proceedings of the Indian History Congress, Bhubaneswar Session. 1977.

⌘ **Jauhari, R.C.** : " Royal Karkhanas of the Tughluq Sultans " in the Proceedings of the Indian History Congress, Allahabad Session, 1965.

⌘ **Khan, A.R.** : "Babar's Settlements of his Conquests in Hindustan" in the Proceedings of the Indian History Congress, Patiala Session, 1967.

⌘ **Khan, Iqtidar Alam** : (i) "The Turkey-Mongol Theory of King ship" in Medieval India- A Miscellany, Vol. II Aligarh 1972.

(iii) "The Middle Classes in the Mughal Empire" Presidential Address, The Proceedings of the Indian History Congress, 36 th Session, Aligarh, 1975.

(iv) "Wazrat Under Humayn" in Medieval India Quarterly, Vol. V, No. 1.

Dhaka University Institutional Repository

⌘ **Moosvi, Shireen** : (i) "Producation, Consumption and Population in Akbar's Time" in the Indian Economic and Social History Review, June 1973, Vol. X, No.2.

(ii) "Sayrghul Statistics in the Ain-i Akbari An Analyisis" in The Indian Historical Revew, January 1976, Vol.11, No.2.

⌘ **Moreland , W.H.** : "Rank (Mansab) in the Mogul State Service" in Journal of the Royal Assiatic Society, 1936

⌘ **M. Tandon,** : **Differentiation** of the **Peasarty**, PHI, Hyderabad, 1978

⌘ **Muzaffar Alam** : Some Aspets of the changes in the position of the Maclad-I-Mash holder in oudh 1676-1722, PHI. Jadavpur, 1974.

⌘ **Qaiser, A.H** : The Role of Bankers in Medi eval India," IHR, Vol.-1, no.2.

⌘ **Qaiser, A.H.** : (i) "The Role of Bankers in Medieval India" in the Indian Historical Review, 1974.

(ii) "A note on the date of the Institution of Mansab Under Akbar" in the Proceeding of the Indain History Congress, 1961.

(iii) "Distribution of the Revenue Resources of the Mughal Empire, Proceedings of the Indian History Congress, 1965 Session.

(vi) "Shipbuilding the Mughal Empire in the 17 th century" in the Indian Economic and Social History Review, June 1968, V, No.2.

⌘ **Ray, Aniruddha** : (i) "A French Decument on Textile Produc tion and Market in Bengal. 1790" in Calcutta Historical Journal, 1976.

(iii) "The Growth of the City of Surat, 1610-1671" in Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, 1979-81, XXIV-VI

⌘ **Ray, Indrani** : (ii) "The Trade and Traders in Ahmedabad in 17th Century" in Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, 1982, XXVIII.

⌘ **Siddiqi, Noman** : (i) Nature of Sair-Jihat Taxes " in the Proceedings of

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed the Indian History Congress, Allahabad Session, 1965.

(ii) "Pulls and Pressure on the Faujdars Under the Mughals " in the Proceedings of the Indian Congress, Patiala Session, 1967.

⌘ **Siddiq, Z.** "The Instisution of Qazi under the Mughals" in Medieval India - Miscellany, 1969, I.

⌘ **Singh, Dilbagh** "Nature and Incidence of Taxes levied on Inland Trade in Eastern Rajasthan during the 17 th and 18th Centuries" in the Proceeding of the Indian History Congress, 1977, Bhubaneswar Session.

(ii) "Caste an d Structure of Villge Society in Eastern Rajasthan during the 18th century" in the Indian Histrical Review, 1976, Vol, III No.2

"The Mughal Mansabdari System" in Elites in South East Asil, ed. By F Leach and S.N. Mukherjee, Cambridge, 1970.

i) Ijaradari system in Eastern Rayasthan, 1700-1800. IESMR 1964 Ape-June.

ii) "Cast and the Structure of village society in Eastern Rayasthan IHR, Vol. 11 no-2

⌘ **Sakar J.N.** : " The Brekdown of mughal Empire the Jats and Garers " Modern Review, 1926, Oct PP 450-55